সমকামিতা

একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ- মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান

অভিজিৎ রায়

"এখানে ছাড়তে হবে সকল অবিশ্বাস
এখানে ধ্বংস হবে সকল ভীরু হতাশ্বাস। "

- - দান্তের ডিভাইন কমেডিতে বর্ণিত নরকের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ পদাবলী, যা পরবর্তীতে মনীষী কার্ল মার্কস বিজ্ঞানের প্রবেশদ্বারে খোদিত করে রাখতে চেয়েছিলেন আজীবন

উৎসর্গ

সারা বিশ্বের অগনিত সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষদের মুক্তিসংগ্রামে যারা নির্ভয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তাদের পুরোধা আমেরিকার গ্রীনউইচ গ্রামের স্টোনওয়াল ইন- এর সংগ্রামী মজদুরদের

এবং

বাংলাদেশে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসারে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং মননের বিকাশে আত্মনিবেদিত সকল লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এবং সমাজকর্মীদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

সময় পাল্টাচ্ছে। নতুন যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পাল্টাচ্ছে আমাদের সনাতন মন মানসিকতা। খসে পড়ছে দীর্ঘদিনের নীতি নৈতিকতার কালো চাদরে ঢাকা মলিন আবরণগুলো। ভেঙ্গে পড়ছে শতাব্দীর ঘুনে ধরা সমাজের প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের অচলায়তন। শুরুটা হয়েছিলো পশ্চিমে অনেক আগেই, এর ঢেউ এখন আছড়ে পড়তে শুরু করেছে পূবের উপকূলেও। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সম্প্রতি নয়াদিল্লির হাইকোর্ট সমকামিতা অপরাধ নয় বলে রায় দিয়েছে (জুলাই, ২০০৯)[1]। ১৪৮ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো - এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটল। সমকামিতা নামক যৌনপ্রবৃত্তিটি ভারতের মত দেশে প্রথম বারের মত পেল কোন ধরণের আইনী স্বীকৃতি। দিল্লি হাইকোর্ট সমকামিতা নিষিদ্ধ আইনকে বৈষম্যমূলক আখ্যা দিয়েছে, সুস্পষ্টভাবে একে মানুষের 'মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন' বলে রায় দিয়েছে।

চিত্রঃ দিল্লী হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর সমকামী অধিকার কর্মীদের উল্লাস (সৌজন্য - নিউইয়র্ক টাইমস)

[1] Indian Court Overturns Gay Sex Ban, The New York Times, July 2, 2009

নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক যাত্রা, শুধু সমকামীদের জন্য নয়, সার্বিকভাবে মানবাধিকারের জন্যও। কৃষি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় যৌনতার বিপ্লব সূচিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে - সেই নবজাগরণের যে ঢেউ আজ ভারতে এসে পড়েছে, কিন্তু তার ছোয়া বাংলাদেশে এখনো তেমনভাবে দৃশ্যমান নয়। বাংলাদেশের সমকামী যৌনতা আজ এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দেশের প্রধান প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা সচেতন বুদ্ধিজীবী সমাজ নারী অধিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কিংবা বড়জোর পাহাড়ি কিংবা আদিবাসীদের অধিকারের বিষয়ে আজ কিছুটা সচেতনতা দেখালেও তারা এখনো যৌনতার স্বাধীনতা কিংবা সমকামীদের অধিকার নিয়ে একদমই ভাবিত নয়। প্রকাশ্যে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও দেখা যায় না ইস্যুটি নিয়ে কাজ করতে। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাদের জন্য এ ধরণের আন্দোলন বা সচেতনতা তৈরীর প্রয়াস নেয়া যে কষ্ঠসাধ্য, তা সহজেই অনুমেয়। সমকামিতা অস্বীকৃত শুধু নয়, অনেক জায়গায় আবার এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এখানে সমকামীদের হয় লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অভ্যস্ত হতে হয় 'ক্লোসেটেড গে' হয়ে 'বিবাহিত' জীবন যাপনে। তাদের অধিকার হয় পদে পদে লঙ্ঘিত। এর সুযোগ নিয়ে অনেক সময় খুব কাছের বন্ধু- বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ঘটে আক্রমণ আর নানা পদের হেনস্থা। 'সনাতন বাঙ্গালী কিংবা ধর্মীয় সংস্কৃতি'র ধারক এবং বাহকের দল আর অন্যদিকে 'অপসংস্কৃতি'র বিরুদ্ধে সদা- সোচ্চার স্বঘোষিত অভিভাবকবৃন্দ; কারো কাছ থেকেই সমকামীরা বিন্দুমাত্র সহানুভূতি প্রত্যাশা করতে পারে না। আসলে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় কারণ আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব। আর এ কথা বলে দেয়া নিষ্প্রয়োজন যে - সব পুরোন সংস্কৃতির মতই আমাদের সংস্কৃতিরও অনেকটা জুড়েই বিছানো আছে অজ্ঞতার পুরু চাদর। আমাদের সংস্কৃতিতে গুরুভক্তি যেমন প্রবল তেমনি লক্ষ্যনীয় 'মান্য করে ধন্য হয়ে যাবার' অন্তহীন প্রবণতা। আমরা গুরুজনদের বহু ব্যবহারে জীর্ণ আদর্শের বাণী আর অভিভাবকদের শেখানো বুলি তোতাপাখির মত আজীবন আউরে যেতে ভালবাসি। আমাদের ভয় অনেক। সীমাহীন স্ববিরোধ আর বংশপরম্পরায় চলে আসা প্রথা মান্য করে যাওয়াকেই আমাদের সমাজে 'আদর্শ' বলে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে পা ফেললেই বিপদ। কিন্তু তারপরও কাউকে না কাউকে তো 'বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধার' দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেই হবে। এই বইয়ের মাধ্যমে প্রথম বারের মত বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অজ্ঞতার চাদর সরানোর প্রয়াস নেয়া হয়েছে, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য- প্রমাণ হাজির করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, সমকামিতা কোন বিকৃতি বা মনোরোগ নয়, এটি যৌনতারই আরেকটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রাণীজগতে এখন পর্যন্ত পনেরশ'র বেশী প্রজাতিতে বিজ্ঞানীরা সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন। তার আংশিক তালিকা এ বইয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাস খুঁজে দেখানো হয়েছে সমকামিতাকে যতই

'অপসংস্কৃতি' কিংবা 'পশ্চিমা বিকৃতি' বলে চিহ্নিত করা হোক না কেন, এর প্রকাশ প্রাচীনকাল থেকেই আছে আমাদের সংস্কৃতিতেও - অত্যন্ত প্রবলভাবেই।

এ দিকে, বহুদিন হতে চললো, জেন্ডার সচেতন প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থায় সমকামিতাকে মনোরোগ কিংবা বিকৃতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। পশ্চিমের আধুনিক চিকিৎসকেরা এবং মনোবিজ্ঞানীরা এখন সমকামিতাকে একটি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তিই মনে করেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর American Psychiatric Association বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন নোংরা ব্যাপার নয়, নয় কোন মানসিক ব্যধি। এ হল যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ১৯৭৫ সালে American Psychological Association- ও একইরকম অধ্যাদেশ দিয়েছিলো। তারপরেও যে সমকামীদের জীবন কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বলা যাবে না। আমেরিকার স্কুলগুলোতে একটু মেয়েলী গোছের ছেলেদের 'গে' প্রতিপন্ন করে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে - এ ধরনের বেশ কয়েকটি ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে পত্র- পত্রিকা এবং মিডিয়ার আলোয় উঠে এসেছে। শুধু সমকামী হবার কারণেই হত্যা করা হয়েছে ওয়াইয়োমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথু শেফার্ডের মত মেধাবী ছাত্রকে। আমেরিকায় এখনো গে এবং লেসবিয়ানরা সামাজিক স্বীকৃতি ও আইনগত বৈধতার জন্য আন্দোলন করছেন, অংশ নিচ্ছেন 'গে-প্রাইড' মার্চে। তাদের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আমেরিকার বেশ কয়েকটি রাজ্যে সমকামী বিয়ে আজ স্বীকৃত। ব্রিটেনেও বিগত টনি ব্লেয়ারের সরকার কয়েক বছর আগে প্রথম সমকামী যুগলদের স্বীকৃতি দিয়েছে। কানাডায় আজ সমকামী, রূপান্তরকামী, উভকামী এবং উভলিঙ্গ মানবেরা সেখানকার অন্যান্য নাগরিকদের মতই সমান সুবিধা ভোগ করে থাকে, এমনকি তাদের মধ্যকার বিয়েও 'সিভিল ম্যারেজ' হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। পশ্চিমে সমকামী- অধিকার আন্দোলনের সাফল্য এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকার কয়েকটি প্রধান দেশও তাদের আইন সংস্কারে এগিয়ে এসেছে। চীনে আগে মাও সে তুংয়ের আমলে মনে করা হতো, সমকামিতা হচ্ছে 'পুঁজিবাদের বিকৃতি'। কিন্তু আশির দশক থেকে তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। নেলসন ম্যানডেলার নেতৃত্বে সাউথ আফ্রিকায় বর্ণবাদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর যে নতুন সংবিধান হয় তাতে শুধু ধর্মই নয়, যৌনতা বিষয়ে কোনো বৈষম্য করা হবে না এমন ধারা সংযোজিত হয়। পাকিস্তানের মত রক্ষণশীল রাষ্ট্রেও উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করা হয়েছে[2]। আমরা আশা করব, যুগের দাবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও একটা সময় সমকামিতা এবং অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে উঠবে, একটা সময় পরে সংখ্যাগরিষ্ঠ ষাঁড়দের

[2] Historic Decision: Pakistan's Supreme Court Orders Equal Rights for Transgender Pakistanis, Dawn, Wednesday, 15 Jul, 2009

যাতাকলে নিয়ত পিষ্ট সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির মানুষগুলোর আইনী অধিকার স্বীকৃত হবে। আর সেজন্য দরকার আমাদের সবার বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এ বইটির প্রথম দিককার কিছু অংশ সিরিজ আকারে[3] মুক্তমনা (www.mukto-mona.com) এবং সচলায়তন ব্লগে (www.sachalayatan.com) প্রকাশের সময় পাঠকদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সাড়া পেয়েছি। সে সময় বহু পাঠক তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে ধারাবাহিক সিরিজটির মানোন্নয়নে সহায়তা করেছেন। কিছু ক্ষেত্রে আমাকে বিতর্কেও জড়াতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, সে সমস্ত বিতর্কের ফলশ্রুতিতে যে সমস্ত নতুন নতুন তথ্যের সমন্বয় আমার বইয়ে ঘটেছে তার জন্যও সংশ্লিষ্ট পাঠক এবং ব্লগারদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। মুক্তমনা এবং সচলায়তনে প্রবন্ধটি প্রকাশের আগে ইন্টারনেটে সমকামিতার উপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে কোন গঠনমূলক আলোচনা সমৃদ্ধ রসদ বাংলায় ছিলো না। বহু পাঠক আমাকে ইমেইল করে জানিয়েছেন যে, সিরিজটি তাদের সমকামিতা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা আমূল বদলে দিতে সাহায্য করেছে। লেখক হিসেবে নিঃসন্দেহে এটি আমার এক বিরাট প্রাপ্তি। ২০০৭ সালে সচলায়তন ব্লগে পাঠকদের ভোটে এই সিরিজটি অন্যতম বর্ষসেরা লেখা হিসেবে তালিকায় স্থান পেয়েছিলো। এ ছাড়া আমেরিকার সিলিকন ভ্যালি থেকে প্রকাশিত মাসিক পড়শী পত্রিকায় আমার সিরিজের কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো 'সমকামিতা কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?' শিরোনামে। মুক্তমনার অন্যতম সুহৃৎ কানাডার অটোয়ায় বসবাসরত কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গনিতের এমিরিটাস অধ্যাপক এবং সুলেখক ড. মীজান রহমান আমার পান্ডুলিপিটি আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন এবং সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর অত্যন্ত তথ্যবহুল মতামত 'বিকৃতি না প্রকৃতি' শিরোনামের বইয়ের শেষে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডিরত স্নিগ্ধা আলী নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে একটি ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন। স্নিগ্ধার লেখাটিও তার অনুমতি নিয়ে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফ্লোরিডা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ পান্ডুলিপিটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন, যা পান্ডুলিপিটির মানোন্নয়নে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। সুইডেন নিবাসী মুক্তমনা সদস্য এবং মানবাধিকারকর্মী মাহবুব সাঈদ সমকামিতার উপর বেশ কিছু কেস স্টাডি সংগ্রহ করে এই বইয়ের জন্য দিয়েছেন। বইটির শেষ পর্যায়ে এসে আলী ইশতিয়াকের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমাকে দারুণভাবে উপকৃত করেছে। এদের সকলের কাছে আমি ঋণী।

আমার জীবনসঙ্গিনী বন্যা (যিনি নিজেও একজন জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক) তার শত ব্যস্ততার মধ্যেও পান্ডুলিপির প্রতিটি অধ্যায় পড়ে তার সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন।

[3] সমকামিতা (সমপ্রেম) কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ? ১ম, ২য়, ৩য় এবং চতুর্থ পর্ব; অভিজিৎ রায়; মুক্তমনা এবং সচলায়তন।

যেখানে যেখানে পছন্দ হয়নি সেসমস্ত জায়গায় স্কুল শিক্ষিকাদের মতই লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে সংশোধনে বাধ্য করেছেন। তার মতামত আমার পান্ডুলিপি পরিমার্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে - তা বলাই বাহুল্য। প্রুফ রীডার হিসেবে অঞ্জন আচার্য্যের অবদান সত্যই আমাকে বিস্মিত করেছে। জেন্ডার বিষয়ক তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আমার পান্ডুলিপির শুধু শ্রীবৃদ্ধিই করেনি, আমার নিজের মানসজগৎকেও ঋদ্ধ করেছে পুরোমাত্রায়। সব্যসাচী হাজরার চমৎকার প্রচ্ছদটি বইটিকে দিয়েছে নতুন মাত্রা। সবশেষে শুদ্ধস্বরের আহমেদুর রশীদের প্রেরণা এবং তাগাদা ছাড়া এ বই আলোর মুখ দেখতো না কখনোই। কাজেই এই বই পাঠকদের ভাল লাগলে সেই কৃতিত্বের সিংহভাগই বাংলাদেশের এই তরুণ এবং উদ্যমী প্রকাশকের প্রাপ্য।

আমি মনে করি আমার এ বইটি বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্ক উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে আর এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতি ও সমকামিতা

রহস্যময় আমাদের এই প্রকৃতি আর প্রকৃতির অংশ সুবিশাল জীবজগৎ, আর আরো রহস্যময় বোধ হয় আমাদের চারপাশের মানুষগুলো। অন্য প্রানীদের মতই দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় পথ পাড়ি দিতে গিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে মানুষকে অবিরতভাবে যুদ্ধ করে যেতে হয়েছে -খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান কিংবা নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু এগুলোর পাশাপাশি মানুষ প্রকৃতিজগতের অন্যান্য প্রানীদের মতই বিবর্তিত হয়েছে আরো একটি জৈবিক তাড়নায়, সেটি হল যৌনতা। সত্যি বলতে কি বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তির কথা ভাবলে দুটো জিনিস আমাদের চোখের সামনে প্রথমেই উঠে আসে - প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার এবং টিকে থাকা। তাই, যৌনতা নিঃসন্দেহে প্রকৃতির এক বিশেষ শক্তি। শুধু প্রকৃতি কেন, আমাদের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে যৌনতা। যৌনতাকে আশ্রয় করে সারা দুনিয়ার কবি- সাহিত্যিকেরা সাহিত্য রচনা করেছেন প্রতিটি যুগেই। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, যৌনতার কারণে পৃথিবীতে যুদ্ধ- বিগ্রহ এবং রক্তপাতও কম হয়নি। তার উল্লেখ পাওয়া যায় সাহিত্যে, ইতিহাসে, আর শিল্পীর ভাস্কর্যে। পশ্চিমা বিশ্বে হোমারের সেই প্রাচীন সাহিত্য *ইলিয়াড* শুরুই হয়েছিলো একটি যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, আর সেই যুদ্ধ আবার হয়েছিলো একটি নারীকে অপহরণের কারণে - সেই হেলেন; হেলেন অব ট্রয়। আমাদের সংস্কৃতিতেও প্রাচীন রামায়নের কাহিনী আমরা জানি - রাম- রাবণের যুদ্ধ হয়েছিলো সীতাকে অপহরণের জন্য। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের ভাস্কর্যে অজস্র মিথুনরত মূর্তির আধিক্য প্রাচীন ভারতে যৌনতার প্রতীকী শক্তিকে স্পষ্ট করে তুলে। আপনি যদি কখনো ভারতের পুরী গিয়ে থাকেন, তাহলে সেখানে দেখবেন - পুরীর মন্দিরের খুব উঁচুতে - কোনার্ক, ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো প্রভৃতি মন্দিরের সর্বত্রই আছে যৌনক্রিয়ারত নর- নারী আর পশুর মুর্তি। আবার সেই সব মূর্তির পাশে লতা পাতা ফল ফুল ত্রিভুজ দিয়ে নির্মিত হয়েছে অসংখ্য যৌনতার প্রতীক। ইন্দোনেশিয়ার সেলিবিস দ্বীপের পুরনো মন্দিরের চারপাশে পাওয়া যায় স্তন, স্ত্রী- অংগ এবং নগ্ন পুরুষদেহের পুরুষাঙ্গের অসংখ্য মুর্তি। শুধু প্রাচীন মন্দির নয়, যৌনতার প্রতীক অত্যন্ত প্রকট আকারে ধরা আছে বহু আধুনিক মন্দিরেও - গৌরিপট্ট এবং শিবলিঙ্গে।

পুরীর মত ঠিক একইভাবে আপনি যদি প্যারিস রোম কিংবা ভ্যাটিকানসিটি[1] ভ্রমণ করেন, দেখবেন রাস্তায় রাস্তায় অসংখ্য যৌন আবেদনময় আবেগঘন নগ্ন নর নারীর মুর্তি। নগ্নতা আর যৌনতা গায়ে গা ঠেকিয়ে আছে মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিডে, রডিনের চুম্বনে, ভেনাসে কিংবা পিকাসোর বহু ছবিতে। যৌনতা আছে বাৎস্যায়নের কামসূত্রে, যৌনতা আছে কালীদাসের মেঘদূতে কিংবা কুমারসম্ভবম- কাব্যে। যৌনতা আছে হাল আমলের হুমায়ুন আজাদ, ইমদাদুল হক মিলন, শোভা দে কিংবা তসলিমা নাসরিনে। যৌনতা কোথায় নেই? বার্নাড শ সত্যই বলেছেন - 'যৌনতা সব জায়গাতেই কম বেশি পাওয়া যায় - কেবল টেলিফোন ডিরেক্টরি ছাড়া'। সত্যি বলতে কি, যতই আড়াল রাখার চেষ্টা করা হোক না কেন, যৌনতাও আসলে মানুষের প্রধান চাহিদাগুলোরই একটি। শুধু চাহিদা বলে থেমে গেল ভুল হবে - যৌন প্রবৃত্তি হল সৃষ্টিশীলতা, চিন্তন ও মননের এক অন্যভূবন। এখানে নানা স্রোতের খেলা প্রতিনিয়তই চলে। চলে নানা টানাপোড়েন। কিন্তু চাহিদা কিংবা সৃষ্টিশীলতা যেমন আছে, যৌনতার অবদমনও খুব উৎকটভাবেই দৃশ্যমান, অন্ততঃ আমাদের সমাজে। যৌনতার এমনি অবদমিত এবং অচ্ছুৎ এক বাসিন্দার নাম হচ্ছে সমকামিতা।

অনেকেই সমকামিতা নিয়ে বেজায় বিব্রত থাকেন। নাম শুনলেই আঁতকে উঠেন। কাঠমোল্লারা তো গালি দিয়ে খালাস- সমকামিরা হচ্ছে খচ্চর স্বভাবের, কুৎসিৎ রুচিপূর্ন, মানসিক বিকারগ্রস্ত। এমনকি প্রগতিশীলদের মধ্যেও রয়েছে নানা রকম ওজর আপত্তি। যারা শিক্ষিত, 'আধুনিক' শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, গে, লেসবিয়ন ইত্যকার তথাকথিত 'পশ্চিমা' শব্দের সাথে কমবেশি পরিচিত হয়েছেন, তারাও খুব কমই ব্যাপারটিকে মন থেকে 'স্বাভাবিক' বলে মেনে নিতে পারেন। তাদের অনেকেই এখনো ব্যাপারটিকে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' মনে করেন, আর নয়ত ভাবেন - পুরো ব্যাপারটি উৎকট ধরনের ব্যাতিক্রমধর্মী কিছু, এ নিয়ে 'ভদ্র সমাজে' যত কম আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল। উপরে উপরে না বললেও ভিতরে ভিতরে ঠিকই মনে করেন সমকামীরা তো হচ্ছে গা ঘিন ঘিনে বিষ্ঠাকৃমি জাতীয় এঁদো জীব। মরে যাওয়াই মনে হয় এদের জন্য ভাল। সমাজ সভ্যতা রক্ষা পায় তাহলে। কিন্তু সত্যই কি 'সমকামিতা' এরকম ঘৃণ্য কোন কিছু?

[1] ভ্যাটিকান সিটির মুর্তিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানকার বহু মুর্তির যৌনাঙ্গে কৃত্রিম পাতার আস্তরণ (fig leaves) পড়িয়ে রাখা আছে। মুর্তির রঙ এর সাথে পাতার রঙের বৈসাদৃশ্য উৎকটভাবে লক্ষনীয়। কথিত আছে, পোপ পায়াস ৯ মাইকেল এঞ্জেলো সহ অন্যান্য শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যকার অবারিত নগ্নতা দেখে অতিশয় ভীত হন, এবং ঈশ্বর বিশ্বাসীদের এই ভয়াবহ নগ্নতার হাত থেকে রক্ষা করতে তার অনুচরদের সাথে নিয়ে হাতুরী শাবল সহযোগে ভ্যাটিকানে অবস্থিত মূর্তিগুলোর লিঙ্গ ধংস করেন। তারপর ওগুলোতে পাতার আস্তরণ লাগিয়ে দেন যাতে শিল্পকর্মগুলোর সৌন্দর্য 'অটুট' থাকে। এই ঘটনা ইতিহাসে Great Castration নামে পরিচিত। ঔপন্যাসিক ড্যান ব্রাউন তার 'এঞ্জেলস এন্ড ডিমনস' বইয়ে এর উল্লেখ করেছেন।

সমকামিতা কি?

বাংলায় 'সমকামিতা' শব্দটি এসেছে বিশেষণ পদ -'সমকামী' থেকে। আবার সমকামী শব্দের উৎস নিহিত রয়েছে সংস্কৃত 'সমকামিন' শব্দটির মধ্যে। যে ব্যক্তি সমলৈঙ্গিক ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করে তাকে 'সমকামিন' বলা হত। সম এবং কাম শব্দের সাথে ইন প্রত্যয় যোগ করে 'সমকামিন' (সম + কাম + ইন্) শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছে। সমকামিতা নামের বাংলা শব্দটির ব্যাবহারও খুব একটা প্রাচীন নয়। প্রাচীনকালে সমকামীদের বোঝাতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হত। যেমন, বাৎস্যায়নের কামসূত্রের ষষ্ঠ অধিকরণের নবম অধ্যায়ে সমকামীকে চিহ্নিত করতে 'ঔপরিস্টক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এ শব্দের বহুল ব্যবহার আর লক্ষ্য করা যায় নি, বরং 'সমকাম' এবং 'সমকামী' শব্দগুলোই কালের পরিক্রমায় বাংলাভাষায় স্থান করে নিয়েছে। কেউ কেউ আজ সমকামিতাকে আরেকটু 'শালীন' রূপ দিতে 'সমপ্রেম' শব্দটির প্রচলন ঘটাতে চান [2]।

সমকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক 'হোমো' এবং ল্যাটিন 'সেক্সাস' শব্দের সমন্বয়ে। গ্রীক ভাষায় 'হোমো' বলতে বোঝায় 'সমধর্মী' বা 'একই ধরণের'। আর সেক্সাস শব্দটির অর্থ হচ্ছে যৌনতা। কাজেই একই ধরনের অর্থাৎ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করার (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। 'হোমোসেক্সুয়াল' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন কার্ল মারিয়া কার্টবেরি ১৮৬৯ সালে। তিনি একটি ছোট পুস্তিকায় (Pamphlet) প্রুসিয়ার সমকামীদের প্রতি নিবর্তনমুলক আইনের সমালোচনা করেন। পরবর্তীতে এই শব্দটিকে তাদের বইয়ে ব্যবহার করেন জীববিজ্ঞানী গুস্তভ জেগার এবং রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং ১৮৮০'র দশকে। ইবিং-এর *Psychopathia Sexualis* বইটি সাধারণ মানুষ এবং চিকিৎসকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে উঠে অচীরেই এবং সেই সাথে 'হোমোসেক্সুয়াল' এবং

[2] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম*, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

‘হেটারোসেক্সুয়াল’ শব্দদুটিও যৌনপ্রবৃত্তি বোঝাতে ইংরেজী পরিভাষায় স্থান করে নেয়।

আমি এই বইয়ে বৈজ্ঞানিক (মুলত জীববিজ্ঞান ও জেনেটিক্সের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে) এবং আধুনিক সামাজিক ও মনস্তাত্বিক ধ্যান- ধারণা থেকে আলোচনা করে একটি উপসংহারে পৌছুতে চেষ্টা করব। বাংলা সহ পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যগুলোতে সমকামিতার উল্লেখ এবং পরিশেষে বিভিন্ন খ্যাতনামা সমকামীদের জীবন নিয়েও খানিকটা গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। তবে সেগুলো আসবে ধীরে ধীরে। প্রথম দিকের পর্বগুলো মুলত বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আমি এই পর্বগুলোতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকেই দেখার চেষ্টা করব সমকামিতা ব্যাপারটি সত্যই ‘অস্বাভাবিক’ বা ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ’ কোন কিছু কিনা। আমার বিশ্লেষণের ভিত্তি হবে এ মুহূর্তে বিজ্ঞানী এবং গবেষকদের কাছ থেকে পাওয়া সর্বাধুনিক তথ্য।

আমি শুরু করছি ভুল ভাবে ব্যবহৃত কিছু মন্তব্য দিয়ে, যা সমকামিতার বিরুদ্ধে প্রায়শই ব্যবহার করা হয় :

> “সমকামিতা প্রাকৃতিক কোনোভাবেই হতে পারে না মূলত (নারী- পুরুষে) কামটাই প্রাকৃতিক”

কিংবা অনেকে এভাবেও বলেন -

> “নারী আর পুরুষের কামই একমাত্র প্রাকৃতিক যা পৃথিবীর সকল পশু করে। যার মূল লক্ষ্য হলো বংশ বৃদ্ধি”

আমি ইন্টারনেটের বিভিন্ন ফোরাম এবং ব্লগসাইটগুলোতে স্পর্শকাতর এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এ ধরণের অসংখ্য মন্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি। উক্তিগুলো স্রেফ উদাহরণ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। অনেকেই সমকামিতাকে ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ’ বা

'অস্বাভাবিক' হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য উপরোক্ত ধরণের যুক্তির আশ্রয় নেন। আমি এই উক্তির পেছনের যুক্তিগুলো নিয়েই মূলতঃ এখানে আলোচনা করব।

আসলে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' , 'অস্বাভাবিক', 'প্রাকৃতিক নয়' -এই ধরণের শব্দচয়ন করার আগে এবং তা ঢালাওভাবে তা প্রয়োগ করার আগে কিন্তু খোলা মনে পুরো বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। এই বাংলাতেই এমন একটা সময় ছিল যখন বাল্যবিবাহ করা ছিল 'স্বাভাবিক' (রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম সহ অনেকেই বাল্যবিবাহ করেছিলেন) আর মেয়েদের বাইরে কাজ করা ছিল 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মেয়েদের বাইরে কাজ করার বিপক্ষে একটা সময় যুক্তি দিয়ে বলেছিলেন এই বলে [3] -

> 'যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোন কাজেরই কথা নয়।'

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের যুক্তি এখন মানতে গেলে কপালে টিপ দিয়ে, হাতে দু- গাছি সোনার বালা পরে গৃহকোণ উজ্জ্বল করে রাখা রাবীন্দ্রিক নারীরাই সত্যিকারের 'প্রাকৃতিক'। আর শত সহস্র আমিনা, রহিমারা যারা প্রখর রোদ্দুরে কিংবা বৃষ্টিতে ভিজে ইট ভেঙ্গে, ধান ভেনে সংসার চালাচ্ছে, কিংবা পোষাক শিল্পে নিয়োজিত করে পুরুষদের পাশাপাশি ঘামে শ্রমে নিজেদের উজার করে চলেছে - তারা সবাই আসলে 'প্রকৃতি বিরুদ্ধ' কুকর্মে নিয়োজিত - কারণ, 'প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না'। বাংলাদেশের অখ্যাত আমিনা, রহিমাদের কথা বাদ দেই, নাসার মহাজাগতিক রকেট উৎক্ষেপন থেকে শুরু করে মাইনিং ফিল্ড পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মেয়েরা পুরুষদের পাশাপাশি আজ কাজ করছেন না। তাহলে? তাহলে আর কিছুই নয়। নিজের যুক্তিকে তালগাছে তোলার ক্ষেত্রে 'প্রকৃতি' খুব সহজ একটি মাধ্যম, অনেকের কাছেই। তাই প্রকৃতির দোহাই পাড়তে আমরা 'শিক্ষিত জনেরা' বড্ড ভালবাসি। প্রকৃতির দোহাই পেড়ে আমরা মেয়েদের গৃহবন্দি রাখি, জাতিভেদ বা বর্ণবাদের পক্ষে সাফাই গাই, অর্থনৈতিক সাম্যের বিরোধিতা করি, তেমনি সময় সময় সমকামি, উভকামিদের বানাই অচ্ছুৎ। কিন্তু যারা যুক্তি নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনা করেছেন তারা জানেন যে, প্রকৃতির দোহাই পাড়লেই

[3] রমাবাই এর বক্তৃতা উপলক্ষে, জৈষ্ঠ, ১২৯৬, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ। এছাড়া মুক্তমনায় রাখা 'Tagore without Illusion' পাতাটিও দেখা যেতে পারে।

তা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। বরং প্রকৃতির কাঁধে বন্ধুক রেখে মাছি মারার অপচেষ্টা জন্ম দেয় এক ধরণের কুযুক্তি বা হেত্বাভাসের (logical fallacy)। ইংরেজীতে এই হেত্বাভাসের পুথিগত নাম হল - 'ফ্যালাসি অব ন্যাচারাল ল' বা 'অ্যপিল টু নেচার' [4] । এমনি কিছু 'অ্যপিল টু নেচার' হেত্বাভাসের উদাহরণ দেখা যাক -

১। মিস্টার কলিন্সের কথাকে এত পাত্তা দেওয়ার কিছু নেই। কলিন্স ব্যাটা তো কালো। কালোদের বুদ্ধি সুদ্ধি একটু কমই হয়। কয়টা কালোকে দেখেছ বুদ্ধি সুদ্ধি নিয়ে কথা বলতে? প্রকৃতি তাদের পাঁঠার মত গায়ে গতরে যেটুকু বাড়িয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে সেই অনুপাতে কম। কাজেই তাদের জন্মই হয়েছে শুধু কায়িক শ্রমের জন্য, বূদ্ধিবৃত্তির চর্চার জন্য নয়।

২। মারামারি, কাটাকাটি হানাহানি, অসাম্য প্রকৃতিতেই আছে ঢের। এগুলো জীবজগতের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কাজেই আমাদের সমাজে যে অসাম্য আছে, মানুষের উপর মানুষের যে শোষণ চলে তা খারাপ কিছু নয়, বরং 'কম্পলিটলি ন্যাচারাল'।

৩। প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাইরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সেরকম অভিপ্রায় না হত, তা হলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাতো।

৪। সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। প্রকৃতিতে তুমি কয়টা হোমোসেক্সুয়ালিটির উদাহরণ দেখেছ?

এমনি উদাহরণ দেওয়া যায় বহু।

উপরের উদাহরণগুলো দেখলে বোঝা যায়, ওতে যত না যুক্তির ছোঁয়া আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লক্ষনীয় 'প্রকৃতি' নামক মহাস্ত্রকে পুঁজি করে পাহাড় ঠেলার প্রবণতা। কাজেই বোঝা যাচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ট মানুষদের স্বভাবজাত অ্যপিল টু নেচার- এর শিকার হচ্ছে সমকামীরা। সমকামীদের প্রতি সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সাংগঠিকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঘৃণা। সমকামিতাকে একটা সময় দেখা হয়েছে মনোবিকার, মনোবৈকল্য বা বিকৃতি হিসেবে। সমকামীদের অচ্ছুৎ বানিয়ে এদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার প্রবণতা অনেক দেশেই আছে। শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার তো আছেই, কখনো এদের ঠেলে দেওয়া হয়েছে আত্মহননের পথে। কখনো বা স্রেফ সমকামী হবার কারণে করা

[4] হেত্বাভাস নিয়ে বিস্তারিত জানার জন্য http://www.infidels.org/library/modern/mathew/logic.html দ্রষ্টব্য

হয়েছে হত্যা। আর এগুলোতে পুরোমাত্রায় ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে ধর্মীয় সংগঠন এবং রক্ষণশীল সমাজ। সমকামীদের প্রতি হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে ইংরেজীতে সৃষ্টি হয়েছে নতুন একটি শব্দ - হোমোফোবিয়া (Homophobia) । মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে এটি নিতান্ত অন্যায়। তবে মানবাধিকার এবং সমানাধিকারের প্রেক্ষাপটে যাবার সমকামিতা বলতে আসলে কি বোঝায় তা আমাদের সকলের ভাল করে জানা দরকার।

আমরা জেনেছি সমকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হোমোসেক্সুয়ালিটি তৈরি হয়েছে গ্রীক ‘হোমো’ এবং ল্যাটিন ‘সেক্সাস’ শব্দের সমন্বয়ে। সমকামী মানুষেরা সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে বলে তাদের (যৌন)প্রবৃত্তিকে বলে হোমোসেক্সুয়ালিটি। আর যারা সমলিঙ্গের প্রতি এ ধরনের আকর্ষণ বোধ করেন, তাদের বলা হয় হোমোসেক্সুয়াল। বর্তমানে হোমোসেক্সুয়াল শব্দটি একাডেমিয়ায় কিংবা চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলেও সাড়া বিশ্ব জুড়ে সমকামীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ‘গে’ এবং লেসবিয়ান’ শব্দদুটি অধিক হারে মিডিয়ায় ব্যবহৃত হয়। গে এবং লেসবিয়ান শব্দদুটিরও ইতিহাস আছে। গালভরা এবং বহুল প্রচলিত ‘হোমোসেক্সুয়াল ’ শব্দের বদলে পশ্চিমে ‘গে’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯২০ সালে। তবে সে সময় এটির ব্যবহার একেবারেই সমকামীদের নিজস্ব গোত্রভুক্ত ছিলো। প্রিন্টেড মিডিয়ায় শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে। লিসা বেন নামে এক হলিউড সেক্রেটারী ‘Vice Versa: America’s Gayest Magazine’ নামের একটি পত্রিকা প্রকাশের সময় সমকামিতার প্রতিশব্দ হিসেবে ‘গে’ শব্দটি ব্যবহার করেন, যদিও সে সময় ‘গে’ শব্দটি ‘হাসি খুশি’ অর্থেই ব্যবহৃত হত। গে শব্দটি যথার্থ অর্থ নিয়ে আসলে ব্যাপকতা পায় ১৯৬০ সালের দিকে যখন সমকামীদের অধিকার রক্ষায় সচেতন লোকজন ‘Gay is good’ জাতীয় বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করতে থাকে। তার পর থেকেই ‘গে’ শব্দটি ‘হোমোসেক্সুয়াল’ শব্দের প্রতিশব্দ হিসবে দ্রুত ইংরেজী পরিভাষায় স্থান করে নেয়। তবে সমকামিতার সাথে যুক্ত সবাই যে সার্বিকভাবে ‘সমকামী’দের বোঝাতে ‘গে’ শব্দটি ব্যবহার করেন তা অবশ্য নয়। যেহেতু পরিভাষায় ‘গে’ শব্দটি অনেকক্ষেত্রেই পুরুষবাচক শব্দ হিসবে গৃহীত হয়, নারী সমকামীদের অনেকেই তাদের নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে তুলে ধরতে ‘লেসবিয়ান’ শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। এই শব্দটি এসেছে গ্রীস দেশের ‘লেসবো’ নামের দ্বীপমালা থেকে। কথিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব ছয় শতকে স্যাপো নামে সেখানকার এক শিক্ষিকা মেয়েদের মধ্যকার প্রেমময় জীবন নিয়ে কাব্য রচনা করে ‘কবিতা উৎসব’ পালন করেছিলেন। প্রথম দিকে লেসবিয়ান বলতে ‘লেসবো দ্বীপের অধিবাসী’ বোঝালেও, পরবর্তীতে নারীর সমপ্রেমের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। তবে এ ব্যাপারে একটি জিনিস পরিস্কার করে বলা প্রয়োজন। যদিও সমকামিতা নির্দেশক শব্দগুলো পরিভাষায় স্থান পেয়েছে খুব বেশী দিনে

আগে নয়, কিন্তু যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতা মানব সভ্যতায় সব সময়ই ছিলো, প্রাচীন কাল থেকেই। বার্ন ফোন তার ‘হোমোফোবিয়া’ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেন [5],

> ‘Though the term is of recent invention, the behavior it describes has always been part of sexual activity. That human beings have desired, loved, and had sex with members of their own sex over time is abundantly demonstrated in visual art and medical, philosophical and literary texts of all historical periods’.

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে যে, কেন তাহলে সমকামিতা নির্দেশক শব্দ আগে পরিভাষায় ছিলো না? এর কারণ হচ্ছে, অন্যান্য যৌনপ্রবৃত্তির মত সমকামিতাও অতি স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবেই পৃথিবীর বহু জায়গায় স্বীকৃত ছিল। কেউ আলাদাভাবে সেটাকে ‘শ্রেনীকরণ’ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। কোন কোন সংস্কৃতিতে সমকামিতা ব্যাপারটির মূল এতোটাই গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো যে, এটি নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করারও কারো অবকাশ ছিলো না[6]। ফরাসী ঐতিহাসিক ফুকোর মতে[7], ’সেক্সুয়ালিটি’ ব্যাপারটাই আসলে উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিস্কার। আধুনিক সমকামীদের প্রবৃত্তিকে আলাদাভাবে শ্রেনীকরণ করার আগে তাদের আলাদা নামে ডাকার কোন প্রয়াস কারো মধ্যে দেখা যায়নি। সে সময় প্রবৃত্তি হিসেবে সমকামিতা ছিলো, কিন্তু আলাদাভাবে ‘সমকামী’বলে কিছু ছিলো না। অনেক বিশ্লেষকই মনে করেন, সমকামীদের নিয়ে আলাদা শ্রেণীকরণ না থাকায় তাদের উপর কোন শারীরিক বা মানসিক নিবর্তন বা নিপীড়নও সেভাবে ছিলো না।

সমকামিতা কি কেবল পশ্চিমা বিশ্বের বিকৃতি?

অনেকেই সমকামিতাকে ভুলভাবে কেবল পশ্চিমা বেলাল্লাপনা বলে মনে করেন। তাদের অনেকে ভাবেন, সমকামিতা হচ্ছে আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজের বিকৃতি। এটা ঠিক নয়। সমকামিতার ইতিহাস আসলে অনেক পুরনো। প্রাচীন গ্রীসের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণে সমকামীতার স্পৃহার কথা জানা যায়। ধর্মীয়ভাবে সমপ্রেম এখানে স্বীকৃত ছিল। ‘ভেনাস’ ছিলেন তাদের

[5] Byrne Fone, Homophobia: A History, Picador , November 3, 2001
[6] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition.
[7] Michel Foucault, The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, Vintage, April 14, 1990

কামনার দেবী। এই দেবীই আবার সমকামীদের উপাস্য ছিলেন। এছাড়া 'প্রিয়াপ্রাস' নামেও আরেক দেবীকেও সমকামীরা আরাধনা করত বলে শোনা যায়। তাহিতির বিভিন্ন জায়গায় সমকামে আসক্ত ব্যক্তিদের আরাধ্য দেবতার মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। আনাতেলিয়া, গ্রীস এবং রোমার বিভিন্ন মন্দিরে 'সিবিলি' এবং 'ডাইওনীসস' এর পুজো ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল। সিবিলির পুরোহিতেরা গাল্লি নামে পরিচিত ছিলেন। এরা নারীবেশ ধারণ করতেন। মাথায় নারীর মত দীর্ঘ কেশ রাখতে পছন্দ করতেন। এরা সমকামী ছিলেন বলেও অনুমিত হয়। পরে এশিয়া মাইনর থেকে সিবিলি পুজো পারস্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। পারস্য সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এ সমস্ত প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়।

পারস্য সাহিত্যে অনেক কবি তাদের প্রেমিকাকে পুরুষ নামে ডাকতেন - তবে এটি সম্ভবতঃ অঞ্চল ভিত্তিক কোন প্রথা। আরব সমাজে বয়ষ্ক পুরুষ এবং বালকের মধ্যে যৌন সম্পর্ক গ্রহনযোগ্য তো বটেই মধ্যযুগে (ইসলামের বিস্তৃতির সময়) বহুল প্রচলিতও ছিল। সাকী বলতে এখন আমাদের চোখের সামনে সুরাপাত্র হাতে যে মোহনীয় লাস্যময়ী নারীর ছবি ভেসে উঠে, প্রাচীন আরবে সাকী বলতে তা বোঝানো হত না। গবেষকরা বলেন, সাকী বলতে আরবে নারীর পাশাপাশি সুদর্শন কিশোরও বোঝানো হত। তারা শুধু পানপাত্রে দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করতো না, পাশাপাশি অন্যান্য পার্থিব সেবাও পরিবেশন করতো। এর উল্লেখ পাওয়া যায় আরবের বহু সমকামী কবিদের রচনায়[8]। এমনকি কোরানের কিছু আয়াতে (৫২:২৪, ৫৬:১৭, ৭৬:১৯) বেহেস্তে উদ্ভিন্নযৌবনা হুরীর পাশাপাশি 'মুক্তা-সদৃশ' কিশোর বালকের সেবা পাওয়ার কথা বলা

[8] প্রসঙ্গত আরবীয় কবি আবু নুয়াসের (৭৫৬ - ৮১৪) একটি কবিতা উল্লেখ করা যেতে পারে –

O the joy of sodomy!
So now be sodomites, you Arabs.
Turn not away from it--
therein is wondrous pleasure.
Take some coy lad with kiss-curls
twisting on his temple
and ride as he stands like some gazelle
standing to her mate.
A lad whom all can see girt with sword
and belt not like your whore who has
to go veiled.
Make for smooth-faced boys and do your
very best to mount them, for women are
the mounts of the devils

হয়েছে।

আসলে সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই সমকামিতা সবসময়ই মানব সমাজে ছিল। গ্রীক, রোমান, চৈনিক, পাপুয়া নিউ গিনি অথবা উত্তর আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতায় সমকামীতার অজস্র উদাহরণ আছে। সমকামিতা ছিল অ্যাজটেক ও মায়া সভ্যতায়। হিন্দু পুরানেও উল্লেখ পাওয়া যায় পুরুষীনি অথবা তৃতীয় প্রকৃতির। বর্তমানে গুজরাটের সঙ্খলপুরে বহুচোরা মাতার যে মূর্তি আছে তা অনেকটা 'সিবিলির' আদলে রচিত। ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্মের একটি বিশেষ শাখা আছ। এরা একসাথে রাধা- কৃষ্ণ- এর ভজনা করে থাকে। এদের অনেকে স্ত্রীবেশ ধারন করে। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম সাধক গদাধর গোস্বামী নাম নিয়েছিলেন রাধিকা। আবার গোবিন্দঘোষ রঙ্গদেবী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আসলে মূল কথা হচ্ছে, সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা ,উভকামিতা - এগুলো কোনটাই আধুনিক পশ্চিমাদের আবিষ্কার কিংবা বিকৃতি নয়, বরং এটি প্রাচীন সভ্যতা থেকে আমাদের সংস্কৃতির মধ্যেই ছিলো; পত্র- পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইন্টারনেটের কারণে ব্যাপারগুলো সামনে চলে এসেছে ।

এখন কথা হচ্ছে সমকামিতা কি জন্মগত নাকি আচরণগত? এটি বুঝতে হলে আমাদের যৌনপ্রবৃত্তিকে বুঝতে হবে। আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন- প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি কোন যৌন- আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষন বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায় । ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে অনেক সময় সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়। সমান্তরাল যৌনতার ক্ষেত্র কিন্তু খুবই বিস্তৃত। এতে সমকামিতা যেমন আছে তেমনি আছে উভকামিতা, কিংবা দুটোই, এমনকি কখনো রূপান্তরকামিতাও। আমি আমার বক্তব্য মূলতঃ 'সমকামিতা' বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব, যদিও অন্যান্য যৌন- প্রবৃত্তিগুলো (যেমন রূপান্তরকামিতা)ও বিভিন্ন সময় আলোচনায় উঠে আসবে। আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা বলেন, সমকামিতা নিঃসন্দেহে যেমন আচরণগত হত পারে, তেমনি হতে পারে জন্মগত বা প্রবৃত্তিগত। এতে পরস্পরবিরোধিতা নেই। যাদের

সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি জন্মগত, তাদের যৌন-প্রবৃত্তিকে পরিবর্তন করা যায় না, তা সে থেরাপি দিয়েই হোক, আর ঔষধ দিয়েই হোক। মানুষের মস্তিস্কে হাইপোথ্যালমাস নামে একটি অংগ রয়েছে, যা মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। সিমন লিভের শরীরবৃত্তীয় গবেষণা থেকে জানা গেছে এই হাইপোথ্যালমাসের interstitial nucleus of the anterior hypothalamus, বা সংক্ষেপে INAH3 অংশটি সমাকামিদের ক্ষেত্রে আকারে অনেক ভিন্ন হয়[9]। আরেকটি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে ডিন হ্যামারের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে। ডিন হ্যামার তার গবেষণায় আমাদের ক্রোমোজমের যে অংশটি (Xq28) সমকামিতা ত্বরান্বিত করে তা শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন[10]। এছাড়াও আরো বিভিন্ন গবেষণায় মনস্তাত্বিক নানা অবস্থার সাথে পিটুইটরি, থাইরয়েড, প্যারা-থাইরয়েড, থাইমাস, এড্রিনাল সহ বিভিন্ন গ্রন্থির সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়। যদিও 'গে জিন' বলে কিছু এখনো আবিস্কৃত হয়নি, কিন্তু সহ বেশ কিছু জৈবিক ফ্যাক্টর সমকামী প্রবণতা তৈরী এবং তরান্বিত করতে পারে (আমি এদের গবেষণা নিয়ে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করব)। এই ধরণের গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হয় সমকামী মনোবৃত্তি হয়ত অনেকের মাঝেই জন্মগত না জেনেটিক, আরো পরিস্কার করে বললে, 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড'। জন্মগত সমকামিরা 'বায়োলজিকালি হার্ড-ওয়্যার্ড' হলেও আচরণগত সমকামিরা তা নয়। এরা আসলে বিষমকামী। এরা কোন ব্যক্তিকে বিষমলিঙ্গের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সাথে যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়। যেমন, জেলখানায় দীর্ঘদিন আটকে থাকা বন্দীরা যৌনসঙ্গীর অভাবে সমলিঙ্গের কয়েদীদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেত পারে। কিন্তু, জেলখানা থেকে বেরিয়ে এলেই দেখা যায়, এদের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। এই ধরণের যৌন প্রবৃত্তির বাইরেও আছে উভকামিতা, কিংবা আছে উভকামিতার সমকামিতা। আলফ্রেড কিন্সে এই ধরনের বিভিন্ন যৌনতাকে পরিমাপ করার জন্য 'যৌনতা বিষয়ক স্কেল' উদ্ভাবন করেন। এই স্কেলের এক প্রান্তে আছে পরিপূর্ণ বিষমকাম, অন্যপ্রান্তে পরিপূর্ণ সমকাম। দুই মেরুর মাঝামাঝি রয়েছে বিভিন্ন পর্যায়- প্রধাণতঃ বিষমকাম, তবে প্রায়ই সমকাম; সমান সমান বিষমকাম এবং সমকাম; প্রধানত সমকাম তবে প্রায়ই বিষম কাম; প্রধাণত সমকাম, তবে মাঝে মধ্যে বিষমকাম ইত্যাদি। কিন্সের এ স্কেল[11] নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও এটি অন্ততঃ বোঝা যায় যে, আমাদের যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে খুবই বিস্তৃত, এবং যৌন প্রবৃত্তি একইভাবে সকলের মাঝে ক্রিয়াশীল হয় না।

[9] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

[10] যদিও সাম্প্রতিক সময়ে এই পরীক্ষার ফলাফল কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

[11] কিন্সের স্কেল নিয়ে বিস্তৃতভাবে এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমকামিতা প্রবনতা আসলে সমান্তরাল যৌনতারই অংশ

আজকের দিনের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যৌন-প্রবৃত্তির ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ (বিষমকামিতা) যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনিভাবেই দেখা যায় সম লিঙ্গের মানুষের মধ্যে প্রেম এবং যৌনাকর্ষণ। এই দ্বিতীয় ধারার মানুষেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা কোন যৌন-আকর্ষণ বোধ করে না, বরং নিজ লিঙ্গের মানুষের প্রতি এরা আকর্ষন বোধ করে। এদের যৌনরুচি এবং যৌন আচরণ এগুতে থাকে ভিন্ন ধারায় । ব্যাপারটি অস্বাভাবিক নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাইরে অথচ স্বাভাবিক এবং সমান্তরাল ধারায় অবস্থানের কারণে এধরনের যৌনতাকে সমান্তরাল যৌনতা (parallel sex) নামেও অভিহিত করা হয়।

যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবেই সেক্স বা যৌনতার উদ্ভব নিয়ে কিছু না কিছু বলতে হয়। রিচার্ড ডকিন্সের ‘ বিবর্তনীয় স্বার্থপর জিন’ (selfish gene) তত্ত্ব সঠিক হয়ে থাকলে বলতেই হবে যৌনতার উদ্ভব নিঃসন্দেহে প্রকৃতির একটি মন্দ অভিলাষ[12]। কারণ দেখা গেছে অযৌন জনন (asexual) প্রক্রিয়ায় জিন সঞ্চালনের মাধ্যমে যদি বংশ বিস্তার করা হয় (প্রকৃতিতে এখনো অনেক এককোষী জীব, কিছু পতংগ, কিছু সরিসৃপ এবং কিছু উদ্ভিদ- যেমন ব্ল্যাক বেরি অযৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবৃদ্ধি করে থাকে) তবে বাহকের পুরো জিনটুকু অবিকৃত অবস্থায় ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করা যায়। কিন্তু সে বাহক যদি যৌন জননের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে থাকে, তবে তার জিনের অর্ধেকটুকুমাত্র ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করলে এটি বাহকের জিনকে ভবিষ্যত প্রজন্মে স্থানান্তরিত করবার সম্ভাবনাকে সরাসরি অর্ধেকে নামিয়ে আনে[13] । এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার আসলে কোন অর্থই হয় না। কারণ, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রক্রিয়ার মুল নির্যাসটিই হল - প্রকৃতি তাদেরই টিকে থাকার ক্ষেত্রে তাদেরকেই বাড়তি সুবিধা দেয় যারা অত্যন্ত ফলপ্রসু ভাবে নিজ জিনের বেশি সংখ্যক অনুলিপি ভবিষ্যত প্রজন্মে সঞ্চালিত করতে পারে[14] । সে

[12] Dylan Evans & Howard Selina, *Introducing Evolution*, Icon Books, UK, 2001
[13] এই বইয়ের পরিশিষ্টে ‘যৌনতার ব্যয়’ নামে একটি গানিতিক মডেল উপস্থাপনা করে যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের মধ্যকার প্রক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।
[14] Joann C. Gutin, *Why Bother? Sex seems like an unnecessary complicated means of reproducing. So how did it ever started? And why did it catch on?* Discover, June, 1992.

হিসাবে কিন্তু অযৌন জননধারীরা (আমি এখন থেকে এদের ‘অযৌনপ্রজ’ হিসেবে উল্লেখ করব) বহু ধাপ এগিয়ে আছে যৌনধারীদের (এদের উল্লেখ করা হবে ‘যৌনপ্রজ’ নামে) থেকে।

রয়, সিলো আর ট্যাংগো - তিনে মিলে ছিলো এক পেঙ্গুইন পরিবার

ম্যানহাটনের সেন্ট্রাল পার্কের চিড়িয়াখানা। সেখানে এক পেঙ্গুইন দম্পতির বাস। একেবারে প্রেমিক দম্পতি যাকে বলে। ছ বছর ধরে তারা একসাথে আছে। তাদের আলাদা করাই মুশকিল। এরা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে রাখে। এক সাথে গলা ছেড়ে ডেকে উঠে। আর শারীরিক যৌনসম্পর্ক

তো আছেই। একটি দিকেই কেবল ব্যতিক্রম- এই পেঙ্গুইন দম্পতির দুজনেই পুরুষ। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেননি। পরে যখন বুঝলেন তখন তো তাদের আক্কেল গুরুম। কার ভুলে প্রথম থেকেই এই পুরুষ পেঙ্গুইন দুটোকে এক সাথে রাখা হয়েছিল কে জানে। তবে এই 'অস্বাভাবিক' সম্পর্ক তো আর বেশী দিন চলতে দেয়া যায় না। কাজেই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, তাদের খাঁচায় কিছু নারী পেঙ্গুইন ছেড়ে দেয়া হবে। তারা ভাবলেন, নারী সংগ পেয়ে নিশ্চয় তারা এই 'বেলাল্লাপনা' ত্যাগ করবে। কিন্তু রয় আর সিলো খাচাঁর নতুন মেয়েদের দিকে ভালমত তাকিয়ে দেখলোই না, সম্পর্ক তৈরি করা তো দূর কি বাত! তারা নিজেদের প্রেমে নিজেরাই মশগুল। কর্তৃপক্ষই আর কি বা করবেন ।

এর মধ্য আরেক ঘটনা ঘটলো। রয় সিলো দম্পতি[15] তাদের বাসার পাশে পড়ে থাকা একটি বড় পাথরের টুকরো তাদের বাসায় নিয়ে এসে নিয়ম করে তা দিতে শুরু করলো। এটা দেখে বোধ হয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মনে একটু দয়া হলো। তারা আরেক 'হেটারোসেক্সুয়াল' পেঙ্গুইন দম্পতির কাছ থেকে একটি ডিম ধার করে নিয়ে এসে রয় আর সিলোর বাসায় রেখে দিলো। সেই ডিমে মাস খানেক ধরে নিয়ম করে তা দিয়ে রয় আর সিলো বাচ্চা ফুটালো। জন্ম হল এক ফুটফুটে মেয়ে পেঙ্গুইন শিশুর - ট্যাংগো। তারা সেই বাচ্চাকে নিজদের বাচ্চা হিসবেই আদর যত্ন করে বড় করে তুললো। বড় হয়ে ট্যাংগো নিজেও সমকামী পেঙ্গুইন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং 'তানুজি' নামে আরেক নারী পেঙ্গুইনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে।

রয়- সিলো- ট্যাংগোর এই ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা নিয়ে ২০০৫ সালে আমেরিকায় প্রথম বাচ্চাদের জন্য একটি বই প্রকাশিত হয় And Tango Makes Three নামে[16]। আমেরিকায় শিশু সাহিত্যের ইতিহাসে সমকামিতাকে গঠনমূলকভাবে উপস্থাপনার প্রথম দৃষ্টান্ত এটি। কিন্তু আমেরিকার রক্ষণশীল মহল এতে খুশি হননি। তারা বইটিকে 'শিশুদের জন্য ক্ষতিকর' হিসেবে আখ্যায়িত করে স্কুলের লাইব্রেরীগুলোতে এই

[15] ছয় বছর এক সাথে থাকার পরে এই সমকামী দম্পতি আলাদা হয়ে গেছে বলে সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশিত হয়েছে।
[16] And Tango Makes Three, Peter Parnell and Justin Richardson, Simon & Schuster Children's Publishing, April 26, 2005

বইয়ের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করতে চান। কিন্তু আমেরিকার আদালতের রায়ে সেটা আর সম্ভব হয়নি।

কারণ অযৌনপ্রজদের যৌনপ্রজদের মত সময় নষ্ট করে সঙ্গী খুজে জোড় বাঁধতে হয় না। সংগম করে করে শক্তি বিনষ্ট করতে হয় না। নিজের বা সঙ্গীর বন্ধ্যাত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। বুড়ো বয়সে ভায়াগ্রা সেবন করতে হয় না। কিংবা সন্তানের আশায় হুজুর সাঈদাবাদীর কাছে ধর্ণা দিতে হয় না। যথাসময়ে এমনিতেই তাদের বাচ্চা পয়দা হয়ে যায়। কিভাবে? আমরা এখন যে ক্লোনিং -এর কথা জেনেছি, এদের প্রক্রিয়াটা অনেকটা সেরকম। এক ধরনের 'প্রাকৃতিক ক্লোনিং' এর মাধ্যমে এদের দেহের অভ্যন্তরে নিষেক ঘটে চলে অবিরত। ফলে কোন রকম শুক্রানুর সংযোগ ছাড়াই দেহের ডিপ্লয়েড ডিম্বানুর নিষেক ঘটে চলে। জীববিজ্ঞানে এর একটি গালভরা নাম আছে - পার্থেনোজেনেসিস (Parthenogenesis)।

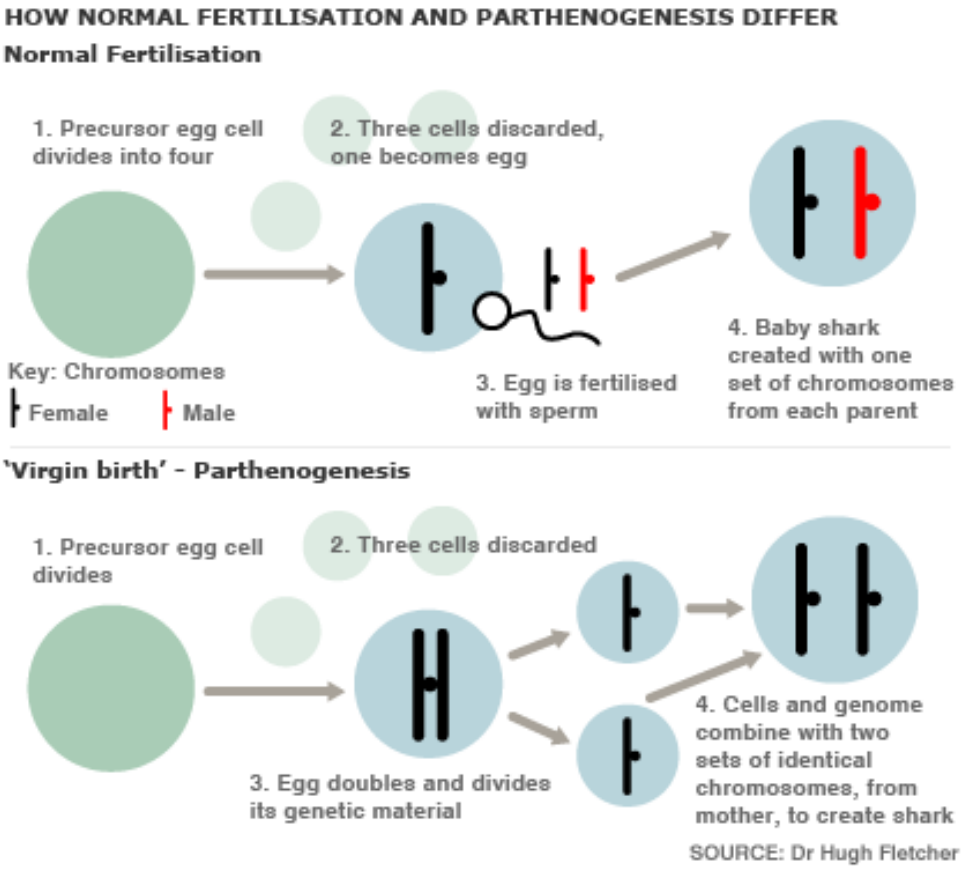

চিত্রঃ সাধারণ নিষেক প্রক্রিয়া এবং পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ার পার্থক্য দেখানো হয়েছে

কাজেই পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজরা সত্যিকার অর্থেই অপারাজেয়, অন্ততঃ যৌনপ্রজদের তুলনায়। এদের কোন পুরুষ সঙ্গীর দরকার নেই। সবাই এক এক জন মাতা মরিয়ম - সয়ম্ভু যীশু উৎপাদনে পারঙ্গম। যৌনপ্রজরা যে সময়টা ব্যয় করে সঙ্গী খুঁজে তোষামোদ, আদর সোহাগের পশরা খুলে ধুঁকতে ধুঁকতে জিন সঞ্চালন করে, সে সময়ের মধ্যে অযৌনপ্রজরা গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা পয়দা করে ফেলতে পারে - এবং বাইরের কারো সাহায্য ছাড়াই। ফলে 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' এরা বাড়তে থাকে গুনোত্তর হারে। নীচে এরকম একটি অযৌনপ্রজ প্রজাতি "হুইপটেল গিরগিটি"র ছবি দেওয়া হল।

চিত্রঃ হুইপ্টেল গিরগিটি - অযৌনপ্রজ প্রজাতির হার্টথ্রব। এদের বংশবিস্তারের জন্য কোন পুরুষ সঙ্গীর প্রয়োজন নেই।

মজার ব্যাপার হল এই হুইপটেল গিরগিটিকূলের সবাই মহিলা, আর তা হবে নাই বা কেন! তাদের ত কোন পুরুষ শয্যাসংগীর দরকার নেই। পুরুষেরা তাদের জন্য 'বাহুল্যমাত্র'। কিন্তু তারপরও তাদের মধ্যে সেক্স- সদৃশ একধরনের ব্যাপার ঘটে। দেখা গেছে এক গিরগিটি আরেক গিরগিটিকে যদি জড়িয়ে ধরে রাখে তাহলে তাদের ডিম পাড়ার হার বেড়ে যায়[17] । প্রকৃতির সমকামী প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত[18]! আমাদের কাছে যত অস্বাভাবিক বা প্রকৃতিবিরুদ্ধই মনে হোক না কেন, হুইপটেল গিরগিটি বা এ

[17] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[18] বিজ্ঞানী জোয়ান রাফগার্ডেন তার 'ইভলুশন রেইনবো' (২০০৪) বইয়ে হুইপটেল গিরগিটিদের 'লেসবিয়ান লিজার্ড' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ধরনের সরিসৃপদের কাছে কিন্তু এটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা, এবং এরা এভাবেই প্রকৃতিতে টিকে আছে, এবং টিকে আছে খুব ভালভাবেই। ২০০৬ সালে সরিসৃপকুলের আরেক প্রজাতি কমোডো ড্রাগন (Komodo Dragon) কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা পয়দা করে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দেয়[19]।

চিত্রঃ ২০০৬ সালে লন্ডনের চিড়িয়াখানায় কমোডো ড্রাগন কোন পুরুষসঙ্গী ছাড়াই লন্ডনের চিড়িয়াখানায় বাচ্চা প্রসব করে রীতিমত আলোড়ন ফেলে দেয়।

বিজ্ঞানীরা ২০০১ সালে নেব্রাস্কার ডুরলি চিরিয়াখানার হাতুরীমুখো হাঙ্গরেরও (Hammerhead shark) প্রজনন লক্ষ্য করেছেন কোন পুরুষসঙ্গীর সাহায্য ছাড়াই[20]। এগুলো সবই পার্থেনোজেনেসিস- এর খুবই স্বাভাবিক উদাহরণ। এ ছাড়াও শুধুই মেয়ে প্রজাতির মাধ্যমে পার্থেনোজেনেসিসের উদাহরণ আছে বিভিন্ন মাছে[21] এবং বহু মেরুদন্ডী

[19] এনায়েত রহিম, কমোডো ড্রাগনের বিস্ময়কর প্রজনন, নিসর্গ, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬; আরো দেখুন, Susan Milius, No-Dad Dragons: Komodos reproduce without males, http://www.sciencenews.org/articles/20061223/fob1.asp

[20] Captive shark had 'virgin birth', BBC News, May 23, 2007, http://www.nova.edu/ocean/ghri/bbc_virginshark.html

[21] Vrijenhoek RC, 1984. The evolution of clonal diversity in Poeciliopsis In: Evolutionary genetics of fishes (Turner BJ, ed). New York: Plenum Press; 399–429.

প্রানীতেও[22]। পার্থেনোজেনেসিসের আরো ভাল উদাহরণ খুঁজতে চাইলে বাংলাদেশের খোদ ঢাকা শহরের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় চলে যেতে পারেন। শুনেছি, আঁশ পোকা নামে এক বদখদ পোকায় নাকি ছেয়ে গেছে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার গাছপালা। ক্যান্টনমেন্টের বাসিন্দারা রীতিমত আস্থির। প্রথম আলোতে এ নিয়ে রিপোর্ট পর্যন্ত হয়েছিল। বংশবৃদ্ধির জন্য এ পোকার কোন পুরুষ লাগে না, মাদী পোকাটি একাই হাজারে হাজার ডিম পেড়ে পঙ্গপালের মত বংশবৃদ্ধি করে আর আশেপাশের গাছপালাগুলোকে ছিবড়া বানিয়ে ফেলে।

[22] Vrijenhoek, R. C., R. M. Dawley, C. J. Cole and J. P. Bogart, 1989 A list of known unisexual vertebrates, In Evolution and Ecology of Unisexual Vertebrates, edited by R. Dawley and J. Bogart. Bulletin 466, New York State Museum, Albany, New York, pp. 19-23.

দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপান্তরকামিতা আর উভকামিতার জগৎ

রূপান্তরকামিতার জগৎ

রূপান্তরকামিতার[1] একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। আই আইটির এক ভদ্রলোকের কথা জানতাম। খুব মেধাবী এক ছাত্র। কিন্তু পুরুষ হয়ে জন্মালে কি হবে, তিনি নিজেকে সবসময় নারী মনে করতেন। নারীদের সাথে থাকতে বা বন্ধুত্ব করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম নৃসিংহ মন্ডল। দৈনিক আজকাল ১৯৯৯ সালের ১২ই আগাস্ট তাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল এই শিরোনামে- "ছয় বছর ধরে মেয়ে হতে চাইছে আই আইটির কৃতি ছাত্র"। সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনে করা হয়, এধরনের লোকেরা নিশ্চয় মনোরোগী। ভারতের নামকরা ডাক্তারেরা তাকে পরীক্ষা করলেন, তার শরীরে হরমোনগত কোন তারতম্য চোখে পড়ল না, মানসিক বিকারের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। ডাক্তারেরা কি করবেন ভেবে পেলেন না। শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তৈরি হল একধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির এবং জটিলতার। নৃসিংহ মন্ডলও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি মানবাধিকার কমিশনের মধ্যমে নিজের "নারী হবার অধিকার" অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মেডিকেল বোর্ডের সামনে দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে বললেন - "ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হত আমি ছেলে নই, মেয়ে। বাবা রেগে যেত। মা কিছু বলতেন না। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের পোষাক পরতে পছন্দ করতাম। চিরকালই আমার ছেলেবন্ধুর চেয়ে মেয়ে বন্ধু বেশি। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি"। চিকিৎসকেরা তাকে

---

[1] রূপান্তরকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে ট্রান্সেক্সুয়ালিটি (Transexuality) । ট্রান্সেক্সুয়াল মানুষেরা ছেলে হয়ে (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে) জন্মানো সত্ত্বেও মনমানসিকতায় নিজেকে নারী ভাবেন (কিংবা কখনো আবার উল্টোটি- নারী হিসেবে জন্মানোর পরও মানসিক জগতে থাকেন পুরুষসুলভ) । এদের কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরিধান করেন, এই ব্যাপারটিকে বলা হয় (ট্রান্সভেস্টিজম / ক্রসড্রেস), আবার কেউ সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে রূপান্তরিত মানবে (Transexual) পরিণত হন। এরা সকলেই বৃহৎ রূপান্তরপ্রবণ সম্প্রদায়ের (Transgender) অংশ হিসেবে বিবেচিত। বইয়ের শেষে ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সেক্সুয়ালিটি এবং ট্রান্সভেস্টিজম সংক্রান্ত পরিভাষা দ্রষ্টব্য। বাংলাভাষায় এদেরকে পরিচিত করার সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নেই। এ বইয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে কিছু নতুন পরিভাষা তৈরীতে।

বোঝালেন, "একবার ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে গেলে ভবিষ্যতে কোন পরিস্থিতিতে চাইলেও আবার ছেলে হওয়া যাবে না"। নৃসিংহের পালটা প্রশ্ন মেডিকেল বোর্ডকে - "সে পরিস্থিতি আসবে কেন? আমার যথেষ্ট বুদ্ধি- বিবেচনা আছে। আমি ভেবেচিন্তেই মেয়ে হতে চাই"। তার প্রতি প্রশ্ন ছিল - "সামাজিক অসুবিধা হতে পারে, চাকরী- বাকরীর অসুবিধা হতে পারে"। তার জবাব ছিল - "এখন স্কলারশিপ পাই। গবেষনার পরে দেশে বিদেশে চাকরী পাবই। আর সামাজিক কোন অসুবিধা আমার হবে না। আর হলেও আমার কিছু যায় আসে না"[2]।

আরেকটা উদাহরণ দেই। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জরগেন্সেনের লেখা "Christine Jorgensen: A Personal Autobiography" বইটির কথা বলা যায়। ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের আগের নাম ছিল জর্জ জরগেন্সেন। তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। তার রূপান্তরকামী মানসিকতার জন্য চাকরী চলে যায়। পরে ১৯৫২ সালে অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। ক্রিস্টিন জরগেন্সেন ছাড়াও আরকজন বিখ্যাত রূপান্তরকামী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ডঃ রেনি রিচার্ডস। চক্ষুচিকিৎসক, এক সময় ছিলেন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়। ১৯৭২ সালে পুরুষদের গ্রান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পৌঁছেছিলেন। একসময় বিবাহিত ছিলেন, ছিলেন একটি সন্তানের পিতা। সে সময় তার নাম ছিলো রিচার্ড রাসকিন্ড। কিন্তু সব সময়ই তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। শেষপর্যন্ত নিজের অভিপ্রায়কে মূল্য দিয়ে সেক্স রিএসাইনমেন্ট অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন এবং রেনি রিচার্ডস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । তার এই রূপান্তরকরণ টেনিস জগতে জটিলতা সৃষ্টি করে। ইউনাইটেড স্টেটস টেনিস এসোসিয়েশন তাকে নারী হিসেবে ১৯৭২ সালে ইউএস ওপেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়। রেনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন এবং আইনী লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে অবশেষে ১৯৭৭ সালে মহিলা হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তার জীবনের নানা জটিলতার কাহিনী উল্লেখ করে বই লেখেন ' No Way Renee: The Second Half of My Notorious Life (২০০৭) '। এ ধরনের অজস্র ঘটনার উদাহরণ হাজির করা যায়। এগুলোর পেছনে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক কারণকে অস্বীকার না করেও বলা যায় - এ ধরনের চাহিদা বা অভিপ্রায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। আর সে জন্যই, প্রখ্যাত রূপান্তরকামী বিশেষজ্ঞ হেনরী বেঞ্জামিন বলেন, আপাত পুরুষের মধ্যে নারীর সুপ্ত সত্তা বিরাজমান থাকতে পারে। আবার আপাত নারীর মধ্যে পুরুষের অনেক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তিনি বলেন - "Every Adam contains the element of Eve and every Eve harbors traces of Adam, physically as well as psychologically." হেনরী বেঞ্জামিন ছাড়াও এ নিয়ে গবেষণা করেছেন রবার্ট

[2] আজকাল, ১২ ই আগস্ট, ১৯৯৯।

স্টোলার, এথেল পারসন, লিওনেল ওভেসে প্রমুখ। এদের গবেষণায় উঠে এসেছে দুই ধরনের রূপান্তররকামীতার কথা। শৈশবের প্রথমাবস্থা থেকে যাদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হবার সুতীব্র বাসনা থাকে তাদের মুখ্য রূপান্তরকামী বলা হয়। অন্যদিকে যারা দীর্ঘদিন সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়েও নানারকম সমস্যায় পড়ে মাঝে মধ্যে নারীসুলভ ভাব অনুকরণ করার চেষ্টা করে তাদের বলে গৌন রূপান্তরকামী। ১৯৬০ সালে মনোচিকিৎসক ওয়ালিন্দার রূপান্তরকামীদের উপরে একটি সমীক্ষা চালান। তার এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রতি ৩৭,০০০ এ একজন পুরুষ রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে অন্যদিকে প্রতি ১০৩,০০০- এ একজন স্ত্রী রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এ সমীক্ষাটি চালিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে প্রতি ৩৪,০০০ এ একজন পুরুষ রূপান্তরকামী ভূমিষ্ট হচ্ছে আর অন্যদিকে প্রতি ১০৮,০০০ এ একজন জন্ম নিচ্ছে একজন স্ত্রী রূপান্তরকামী। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে ২৪,০০০ পুরুষের মধ্যে একজন এবং ১৫০,০০০ নারীর মধ্যে একজন রূপান্তরকামীর জন্ম হয়[3]। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, জোয়ান অব আর্ক থেকে শুরু করে আজকের প্রথিতযশা জীববিজ্ঞানী জোয়ান (জনাথন) রাফগার্ডেন কিংবা বাস্কেটবল লিজেন্ড ডেনিস রডম্যান সহ অনেকের মধ্যেই যুগে যুগে রূপান্তর প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে[4]। উইকিপেডিয়াতেও খ্যাতিমান রূপান্তরকামীদের একটি আংশিক তালিকা পাওয়া যাবে[5]।

এখন কথা হচ্ছে মানবসমাজে রূপান্তরকামীতার আস্তিত্ব আছে কেন? এ বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের 'সেক্স' এবং 'জেন্ডার' শব্দদুটির অর্থ এবং ব্যাঞ্জনা আলাদা করে বুঝতে হবে। সেক্স এবং জেন্ডার কিন্তু সমার্থক নয়। বাংলা ভাষায় শব্দদুটির আলাদা কোন অর্থ নেই, এদের সঠিক প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় অনুপস্থিত। সেক্স একটি শরীরবৃত্তিয় ধারণা। আর জেন্ডার মুলতঃ সমাজ- মনস্তাত্বিক অবস্থা। এই প্রসঙ্গে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সাইকোলজিতে' বলা হয়েছে -

> Sex refers to the physiological, hormonal and genetic makeup (XX or XY chromosome) of an individual; Gender is a cultural category that contains roles, behaviors, rights, responsibilities, privileges and personality traits assigned by that specific culture to men and women.

হেনরি বেঞ্জামিন তার 'ট্রান্সেক্সুয়াল ফেনোমেনন' বইয়ে অনেকবারই বলেছেন -

---

[3] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।
[4] Leslie Feinberg, Transgender Warriors : Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman, Beacon Press, 1997.
[5] List of transgender people, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transgender_people

Gender is located above, and sex is below the belt.

অর্থাৎ সোজা কথায়, সেক্স সমগ্র বিষয়টিকে 'দেহ কাঠামো' নামক ছোট্ট চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলতে চায়, যেখানে জেন্ডার বিষয়টিকে নিয়ে যেতে চায় সাংস্কৃতিক নীলিমায়। আমরা আধুনিক চিন্তাধারার সাথে তাল মিলিয়ে এই বইয়ে 'সেক্স' বলতে শারীরিক লিঙ্গ বুঝব, আর 'জেন্ডার' বলতে বুঝব মানসিক কিংবা সাংস্কৃতিক লিঙ্গকে[6]।

মারিয়ার কথা

১৯৮৮ সালের অলিম্পকের আয়োজনে যোগদানের প্রস্তুতি চলছে। মারিয়া প্যাতিনো নামের স্পেনের শীর্ষস্থানীয় মহিলা হার্ডলার অলিম্পিকে যোগদানের শেষ প্রস্তুতিটুকু সেরে নিচ্ছেন। মেয়েদের ইভেন্টগুলোতে যোগদানের নিয়ম হিসেবে তাকে একটি ছোট্ট পরীক্ষা সেরে ফেলতে হবে। সেই পরীক্ষায় দেখা হবে মারিয়া সত্য সত্যই মেয়ে কিনা।

সেটা নিয়ে অবশ্য মারিয়ার চিন্তা নেই। তিনি যে মেয়ে তা জন্মের পর থেকেই তিনি জানেন। যে কেউ তাকে দেখলেই মেয়ে বলেই মনে করবে। দেহকাঠামো, কাঁধের আকার, কটিদেশ, নিতম্ব সব কিছুই বলে দেয় তিনি নারী। আগে নারী ক্রীড়াবিদদের গায়নোকলজিস্টদের প্যানেলের সামনে দিয়ে নগ্ন হয়ে হেটে যেতে হত। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এই অপমানজনক ব্যাপার স্যাপারের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয় না। গালের পাশ থেকে সামান্য চামড়া নিয়ে জেনেটিক টেস্ট করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলাফল জানিয়ে দেয়া যায়।

[6] বইয়ের পরিশিষ্টে সেক্স এবং জেন্ডারের পার্থক্যসুচক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মারিয়া নির্বিঘ্ন চিত্তেই স্যাম্পল দিয়ে এলেন। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরেই ডাক্তারের অফিস থেকে ফোন এল। কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। মারিয়াকে আবারো পরীক্ষা দিতে হবে। মারিয়া আবারো গেলেন। আবারো টেস্ট হল। এবারে আরেকটু বিস্তৃত পরীক্ষা। ডাক্তারদের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ঝামেলাটি কি ছিলো।

মারিয়া যখন পরদিন অলিম্পিকের ট্র্যাকে প্রথমবার দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই খবরটি ফাঁস করা হল। মারিয়া 'সেক্স টেস্ট'- এ ফেল করেছেন। তিনি মেয়ের মত দেখতে হলেও ক্রোমোজমের গঠন অনুযায়ী তিনি পুরুষ। তার দেহকোষে Y-ক্রোমজোমের অস্তিত্ব রয়েছে। তার দেহের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় পুরুষাঙ্গের উপস্থিতি আছে। উপরন্তু, তার কোন ডিম্বাশয় এবং জরায়ু নেই। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (IOC) 'সংজ্ঞা' অনুযায়ী তিনি নারী নন। কাজেই তাকে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

হতাশ মারিয়া স্পেনে ফিরে এলেন। স্পেনে আসার পর তার জীবনে আক্ষরিক অর্থেই কেয়ামত নেমে এলো। স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ মারিয়ার আগের সমস্ত টাইটেল এবং পদক কেড়ে নিলো আর পরবর্তী সকল প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। তার বয়ফ্রেন্ড তাকে ছেড়ে চলে গেলো। তার স্কলারশিপ বাতিল করা হল; হঠাৎ করেই মারিয়া নিজেকে দেখতে পেলেন অন্ধকারের এক অথৈ সমুদ্রে। পরে মারিয়া সেই সময়কার দুর্বিষহ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন এভাবে - 'আমাকে মানচিত্র থেকে স্রেফ মুছে ফেলা হল - এমন একটা ভাব যেন আমি কখনো ছিলামই না। অথচ আমি বারো বছর ধরে খেলাধূলার সাথে জড়িত ছিলাম, আর এই ছিলো তার প্রতিদান'[7]।

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। মারিয়া তার গাঁটের হাজার হাজার টাকা

[7] Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Anne Fausto-Sterling, Basic Books , November, 2000

[8] Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994.

[9] "Sex is much more a matter of hormones than of chromosomes. Indeed, the small Y chromosome, the root of all maleness, seems to do little besides turn on the "master male switch" to start the flow of hormones" see for details, Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994.

[10] বর্তমানে International Association of Athletics Federations নামে পরিচিত।

খরচ করে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলেন। বহু ডাক্তারের সাথে তার মোলাকাৎ হল। ডাক্তারেরা অবশেষে তার এই অদ্ভুতুরে 'রোগের' কারণ খুঁজে পেলেন। তাকে জানানো হল, মেডিকেলের পরিভাষায় এই অবস্থাটিকে বলা হয় - Androgen Insensitivity । যদিও মারিয়া অন্য সব স্বাভাবিক ছেলেদের মত Y-ক্রোমজোম নিয়েই জন্মেছিলেন, এবং অন্য সব পুরুষের মত তার অন্ডকোষ থেকেও প্রচুর পরিমান পুরুষ হরমোন টেস্টোসটেরোন (এন্ড্রোজেন হরমোনের একটি স্টেরয়েড শ্রেনী) নিঃসৃত হয়েছিল, কিন্তু তার কোষগুলো শিশু বয়সে সেই নিঃসৃত হরমোনকে সনাক্ত করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীতে বিশ হাজার পুরুষ শিশুর মধ্যে অন্ততঃ একজন এরকম 'এন্ড্রোজেন গ্রাহক' (androgen receptors)- জনিত সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়[8], যাদের কোষ এই নিঃসৃত এন্ড্রোজেন সনাক্ত করতে পারে না। মারিয়ারও তাই হয়েছিলো। এর ফলে মারিয়ার দেহে 'পুরুষসুলভ' বৈশিষ্টগুলো অনুপস্থিত ছিলো প্রথম থেকেই, যদিও তার ক্রোমোজমের গঠন ছিলো পুরুষেরই। তারপর বয়ঃসন্ধিকালে এন্ড্রোজেন নিঃসৃত হলেও তার দেহে এন্ড্রোজেনের প্রতি কোন সংবেদনশীলতা না থাকায় তার স্তন বৃদ্ধি পেল, কটিদেশ কমে আসলো, আর নিতম্ব ভারী হয়ে উঠলো, চারপাশের অন্যান্য নারীদের মতই। কাজেই মারিয়া দেখতে শুনতে এবং মন মানসিকতায়ও নারীই হয়ে উঠেছিলেন, তার ক্রোমজমে যাই থাকুক না কেন। নারীত্বের দাবী নিয়ে তার নিজের মনেও কখনোই সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি।

মারিয়া আইওসি'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, তিনি জানেন তিনি নারী, তিনি বড়ও হয়েছেন নিজেকে নারী হিসবেই দেখে। হঠাৎ করে কেউ এসে বললো -তিনি পুরুষ, আর হলো নাকি! তিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানী এলিসন কার্লসনের সাথে মিলে তার নিজস্ব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। বিজ্ঞানীরা আজ জানেন নারী কিংবা পুরুষ হবার ব্যাপারটা শুধু ক্রোমোজমের গঠনের উপরই নির্ভরশীল নয়, তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে হরমোনের উপর [9]। অথচ অলিম্পিক কমিটির পরীক্ষায় হরমোন সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপারই নেই। মারিয়া দাবী করলেন, তার পেলভিক কাঠামো এবং কাঁধের কাঠামোর গঠন এবং অন্যান্য দেহজ বৈশিষ্টগুলো দেখে যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নারীদের ইভেন্টগুলোতে প্রতিযোগিতা করা জন্য তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে 'নারীত্ব' আছে কিনা! প্রায় আড়াই বছর ধরে যুদ্ধ চালানোর পর ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার এথলেটিক ফেডারেশন [10] (IAAF) মারিয়াকে

পূর্বেকার পদে পুনর্বহাল করলো এবং ১৯৯২ সালে মারিয়া আবার স্প্যানিশ অলিম্পিক দলে যোগদান করতে পারলেন। ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত কোন নারী আইওসির 'সেক্স টেস্ট' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের পরিচিতি নিয়েই অলিম্পিক দলে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করলেন। তবে আইএএফ মারিয়ার ব্যাপারে উদারতা দেখালেও আইওসি এখনও সেই সনাতন Y ক্রোমোজম দেখে সেক্স টেস্ট- এর রীতিতে বিশ্বাসী।

মারিয়ার মত ঘটনাগুলো আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে তৈরী করেছে যেমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির, তেমনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে 'সেক্স' নিয়ে আমাদের সনাতন ধ্যান ধারণাগুলোকে। এ ধরণের বহু ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা অবশেষে বুঝতে ছিখেছি যে, শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে এমনকি ক্রোমজোমের গঠন দিয়ে নারী- পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করার দিন আর নেই। মানুষের লৈঙ্গিক পরিচিতি তুলে ধরতে হলে বাহ্যিক প্রকৃতির পাশাপাশি গণ্য করতে হবে মানুষের সমাজ- মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকেও। আর এ জন্যই সেক্স জিনিসটার পাশাপাশি জেন্ডারের ধারণা থাকা, এবং জেন্ডার- সচেতনতা থাকা এই একবিংশ শতাব্দীতে খুবই প্রয়োজনীয়।

যৌনতার শরীরবৃত্তিয় বিভাজন মেনে নিয়েও বলা যায়, সামাজিক অবস্থার (চাপের) মধ্য দিয়েই আসলে এখানে একজন নারী 'নারী' হয়ে উঠে, আর পুরুষ হয়ে ওঠে 'পুরুষ'। আমাদের রক্ষণশীল সমাজ নারী আর পুরুষের জন্য জন্মের পর থেকেই দুই ধরনের দাওয়াই বাৎলে দেয়। নানা রকম বিধি- নিষেধ ও অনুশাসন আরোপ করে। পোশাক আষাক থেকে শুরু করে কথা বলার স্টাইল পর্যন্ত সবকিছুই এখানে লৈঙ্গিক বৈষম্যে নির্ধারিত হয়। এর বাইরে পা ফেলা মানেই যেন নিজ লিঙ্গের অমর্যাদা। কোন ছেলে একটু নরমভাবে কথা বললেই তাকে খোঁটা দেওয়া হয় 'মেয়েলী' বলে, আর নারীর উপর হাজারো রকম বিধি- নিষেধ আর নিয়মের পাহাড় তো আছেই। ফলে দুই লিঙ্গকে আশ্রয় করে তৈরি হয় দু'টি ভিন্ন বলয়। কিন্তু সমস্যা হয় রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে। এরা আরোপিত বলয়কে অতিক্রম করতে চায়। তারা কেবল 'যৌনাঙ্গের গঠন অনুযায়ী' লিঙ্গ নির্ধারনের সনাতনী প্রচলিত ধারনাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তারা শারীরিক

লিঙ্গকে অস্বীকার করে বিপরীত সাংস্কৃতিক বা মানসিক লিঙ্গের সদস্য হতে চায়। তারা মনে করে দেহ নামক বাহ্যিক কাঠামোটি তাদের জন্য সঠিক লৈঙ্গিক পরিচয় তুলে ধরছে না; মনে করে সেক্স নয়, আসলে জেন্ডার অনুযায়ী তাদের লিঙ্গ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর পর থেকে (বস্তুতঃ বিগত কয়েক দশকে) পশ্চিমা বিশ্বে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা যত ঋদ্ধ হয়েছে ততই লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে সেক্সচেঞ্জ অস্ত্রোপ্রচারে এসেছে বিপ্লব[11]। কানাডা, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে রূপান্তরকামী মানুষের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে সেক্সচেঞ্জ অপারেশনকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের মত সংখ্যাগরিষ্টদের জন্য ব্যাপারটা 'অস্বাভাবিক' কিংবা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' শোনালেও খোদ প্রকৃতিতেই বহু প্রজাতির মধ্যে সেক্স চেঞ্জ বা রূপান্তরপ্রবণতা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এমনি কিছু উদাহরণ পাঠকদের জন্য হাজির করিঃ

উত্তর আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরা আটলান্টিক স্লিপার শেল (Atlantic Slipper Shell) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের নাম ক্রিপিডুলা ফরমিক্যাটা (Crepidula Fornicata)। এই প্রজাতির পুরুষেরা একা একা ঘুরে বেড়ায়। তারপর তারা কোন স্ত্রী সদস্যদের সংস্পর্শে এলে সংগমে লিপ্ত হয়। যৌন সংসর্গের ঠিক পর পরই পুরুষদের পুরুষাংগ খসে পড়ে এবং এরা রাতারাতি স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের পর এরা আর একাকী ঘুরে বেড়ায় না, বরং স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। প্রকৃতিতে পুরুষ থেকে নারীতে পরিনত হবার এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ক্রিপিডুলা নিয়ে গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে আরো নানা ধরনের বিচিত্র তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই প্রজাতির একটি সদস্যকে খুব ছোট অবস্থায় অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এর মধ্যে স্ত্রী জননাঙ্গের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি একে কোন পরিণত ক্রিপিডুলার সাথে রাখা হয়, তবে সে ধীরে ধীরে পুরুষে রূপান্তরিত হরে থাকে।

উত্তর আমেরিকার ওই একই অঞ্চলের 'ক্লিনার ফিশ' নামে পরিচিত এক ধরনের মাছের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা রূপান্তরকামীতার পরিস্কার প্রমাণ পেয়েছেন। এ মাছগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাবারিডেস ডিমিডিয়াটাস (Laborides dimidiatus)। এ প্রজাতির পুরুষেরা সাধারণতঃ পাঁচ থেকে দশজন স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধে (নাকি 'হারেম বাঁধে' বলা উচিৎ?)। কোন কারণে পুরুষ মাছটি মারা পড়লে স্ত্রীদের মধ্যে যে কোন একজন

[11] কারো চাহিদা বা অভিপ্রায়লে মূল্য দিয়ে সেক্স চেঞ্জ অপারেশন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও পরিণত বয়সে পৌছুনোর পূর্বেই অভিভাবকদের বা ডাক্তারদের ইচ্ছাকে মুল্য দিতে গিয়ে সেক্সচেঞ্জ করে উভলিঙ্গত্ব থেকে শিশুকে 'মুক্তি দেয়ার' চেষ্টা আজকে বিতর্কিত এবং মুল্যবোধের কষ্ঠিপাথরে প্রশ্নবিদ্ধ। এ নিয়ে পরবতীতে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(সম্ভবতঃ সবচেয়ে বলশালী জন) সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই ওই স্ত্রীমাছটির মধ্যে দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দু সপ্তাহের মধ্যে সে পরিপূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায় (তার গর্ভাশয় ডিম্বানু উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, এবং নতুন করে পুরুষাংগ গজাতে শুরু করে) এবং এবং অন্যান্য স্ত্রী মাছদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী থেকে পুরুষে রূপান্তরের এও একটি মজার দৃষ্টান্ত। রূপান্তরকামীতার উদাহরণ আছে এনিমোন (anemone) বা 'ক্লাউন মাছ'দের (Clown Fish) মধ্যেও। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামুদ্রিক প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি বেড়ে ওঠা মাছদের মধ্যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যৌনতার পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক ঘটনা[12]।

চিত্রঃ এনিমোন বা ক্লাউন মাছদের মধ্যে সেক্স চেঞ্জ অতি সাধারণ একটি ঘটনা। প্রাকৃতিক ট্রান্সেক্সুয়ালিটির বাস্তব উদাহরণ।

ইউরোপিয়ান ফ্লে অয়েস্টার (European Flay Oyster) ও অস্ট্রা এডুলিস (Ostrea edulis) প্রজাতির ঝিনুকেরা যৌনক্রিয়ার সময় পর্যায়ক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বস্তুতঃ এদের একই শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ জনন অংগের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, এই প্রজাতির ঝিনুকেরা পুরুষ হিসেবে যৌনজীবন শুরু করার পর ধীরে ধীরে স্ত্রীর ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়। ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে এই ধরনের ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো প্রতিবছর একবার করে তাদের যৌনতার পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় উষ্ণ অঞ্চলে ওই একই ঝিনুকের দল প্রতি ঋতুতেই তদের যৌন রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। নারী

[12] *Sex change? Something Fishy*, Release from Philadelphia Inquirer.

থেকে পুরুষ কিংবা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরের আকছার প্রমাণ পাওয়া গেছে ইউনো মার্জিনালিস (Uno marginalis) নামের আরো একটি প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যেও। সামুদ্রিক পোকা বলিনিয়ার মধ্যেও এ ধরণের রূপান্তর ঘটে থাকে। যৌনতার পরিবর্তন হরহামেশাই ঘটে চলেছে কিছু মাছি, কেঁচো, মাকড়শা এবং জলজ ফ্লি ডাফনিয়াদের মধ্যেও, এমনকি এদের অনেকেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 'যৌনপ্রজ' থেকে 'অযৌনপ্রজ'তেও রূপান্তরিত হয়[13] ।

তাহলে এখন প্রশ্ন হল, এই সমস্ত উদাহরণ এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল, প্রকৃতির বৈচিত্রময় জীবজগতের সাথে পরিচিত হওয়া। সেই সাথে এটাও বুঝা যে ব্যাপারগুলো এত সোজাসাপ্টা নয়, যে আমরা হলফ করে বলে দিতে পারব শুধু আমরা যৌনপ্রজরাই প্রাকৃতিক, আর বাকীরা সব 'বানের জলে ভেসে এসছে' । এরকম ভাবার আগে আমাদের বোঝা উচিৎ যে, সাদা- কালো এরকম চরম সীমার মাঝে সবসময়ই কিছু ধুসর এলাকা থাকে। আর সেই ধুসর এলাকায় নির্বিঘ্নে বাস করে সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মত যৌনপ্রবৃত্তিগুলো।

উভকামিতার জগৎ

মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড অনেক আগেই যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে উভকামিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছিলেন[14] -

> " পৃথিবীর সব মানুষই আসলে উভকামী. . . এবং তাদের লিবিডো থাকে দুই লিঙ্গের পরিসীমায় বিন্যস্ত . . . ।'

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে যখন কিন্সের স্কেলের সাথে পরিচিত হব তখন দেখব যে, সমকামিতা এবং বিষমকামিতা - মানব জীবনের এই দুই যৌপ্রবৃত্তি থাকে স্কেলের দুই দিকের দুই প্রান্তসীমায়। মাঝামাঝি অংশটিতে থাকে উভকামিতার অনন্য ভূবণ। কোন ব্যক্তি যখন একই সাথে সমলিঙ্গ ও বিষমলিঙ্গের প্রতি যুগপৎ যৌনাকর্ষণ অনুভব করেন, তখন তাকে উভকামী (Bisexual) বলা হয়। উভকামী ব্যক্তির যৌনজীবন খন্ডিত ভাবে

---

[13] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[14] ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ উক্তিটি ছিলো এরকম -

'We have come to learn, that **every human being is bisexual** in this sense, and that his libido is distributed, either in a manifest or a latent fashion, over objects of both sexes'
(Ref. Steven Angelides , A History of Bisexuality, University Of Chicago Press; 1 edition (September 15, 2001)

দেখা হলে কখনো তাকে বিষমকামী কখনো বা সমকামী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা উভকামিতাকে আলাদা একটি যৌনপ্রবৃত্তি হিসবে গন্য করারই পক্ষপাতি। এটা নিশ্চিত যে, ব্যক্তির যৌনজীবনের সামগ্রিকরূপটি যদি উন্মোচিত হয়, তবে তাকে উভকামিতার পর্যায়ে ফেলাই হবে সংগত। কিন্তু মুশকিল হল, উভকামিতাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে নারী- পুরুষের 'স্বাভাবিক' প্রথাসিদ্ধ জীবন অনেক সময়ই ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, উভকামিতা নামক প্রবৃত্তিটি বিষমকামী সম্পর্কের সনাতন 'মনোগামিতার মিথ'টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই। অস্কার ওয়াইল্ডের উদাহরনটি এখানে উল্লেখ্য। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন উভকামী। তিনি বিবাহিত জীবন যাপনের পরেও একজন পুরুষের সাথে মনোদৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিলেন। ওয়াইল্ডের এই প্রবৃত্তিকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে মেনে নিতে গেলে তার স্ত্রীর বাইরে ওই পুরুষটির সম্পর্কটিকেও মেনে নিতে হয়। ফলে 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটির ভিত দুর্বল হয়ে যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজ একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেনি। অস্কার ওয়াইল্ডকে সেজন্য পোহাতে হয় কারাদন্ড। শুধু ওয়াইল্ড কেন কিছুদিন আগে জেমস ম্যাকগ্রিভি তাঁর নিভৃত সমকামের কথা স্বীকার করে নিউজার্সির গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০০৪ সাল । তিনি বিবাহিত ছিলেন, ছিলেন দুই কন্যার পিতা। তার সমকামী প্রবণতার কথা প্রকাশিত হবার আগ পর্যন্ত সবাই তাকে বিষমকামীই ভেবেছিলেন। তার সমকামিতার ঘটনা প্রকাশিত হবার পর স্ত্রীর সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রী এও বলেন, 'ম্যাকগ্রিভি সমকামী জানলে তাকে আমি কখনোই আমার সন্তানের পিতা হতে দিতাম না'। আসলে উভকামীরা অনেক সময়ই শুধু প্রথাগত সমাজ নয়, সমকামী এবং বিষমকামী - দু দল থেকেই বঞ্চনার স্বীকার হয়। বিষমকামী তো বটেই এমনকি সমকামী মানুষদেরও এমন ধারণাই বদ্ধমূল যে, বিষমকামিতার বাইরে 'সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তি' বলতে কেবল সমকামিতাকেই বোঝায়। সমকামীরা উভকামীদের সমস্যাকে বুঝতে চায় না। তাদের অনেকের কথা হল - উভকামী বলে কিছু নেই; আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিখ্যাত উক্তির মত উক্তি উভকামীদের প্রতিনিয়ত হজম করতে হয় - 'স্টে আইদার উইথ আস অর উইথ দেম'[15]। আর কোন তৃতীয় সত্তাকে কোন দলই গ্রহণ করতে চায় না। ব্যাঙ্গালোরের 'পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টি'র ক্ষেত্র- সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে সমকামীরা উভকামীদের শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, ঘৃণাও করে[16]। ফলে প্রান্তিকায়িত যৌন প্রবৃত্তির সদস্যদের মধ্যেও উভকামীরা দ্বিতীয়বার প্রান্তিক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা হয়ে ওঠে সত্যিকার সংখ্যালঘু। এদের জীবন- যন্ত্রণা হয় আরো মর্মান্তিক, এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভয়াবহ।

---

[15] ' You are either with us or against us' , Bush's speech in 20001 for Combating terrorism; http://archives.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/

[16] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম*, পূর্বোক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

উভলিঙ্গত্ব

১৮৪৩ সাল। সেলসবুরির অধিবাসী ২৩ বছরের লেভি সুয়েদাম নগর নির্বাচকদের কাছে স্থানীয় নির্বাচনে হুইগের[1] প্রার্থী হিসেবে ভোট দেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। সাথে সাথেই তিনি বিরোধী দল থেকে ঘোরতর সমালোচনার সম্মুখীন হলেন। সমালোচনার কারণটি আজকের যুগে শুনলে হয়তো অনেকেরই অবাক লাগবে। না সমালোচনার পেছনে লেভি সুয়েদামের কোন দুর্নীতি, চারিত্রিক দুর্বলতা কিংবা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অযোগ্যতা বা এই ধরনের কিছু ছিলো না। বিরোধী দলের প্রধান আপত্তি ছিলো - লেভিকে দেখলে যতটা পুরুষসুলভ মনে হয়, তার চেয়ে বেশী নারী সুলভ। আর সে সময় নারীদের কোন ভোটাধিকার ছিলো না। কাজেই লেভি সুয়েদামকে 'নারী' প্রমাণ করতে পারলেই হয়তো 'কম্ম সাবার'। নির্বাচকেরা এই দ্বন্দের সুরাহা করতে একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসলেন। বিজ্ঞ ডাক্তার উইলিয়াম বেরী সুয়েদামের দেহে লিঙ্গ এবং অন্ডাশয়ের অস্তিত্ব সনাক্ত করে রায় দিলেন লেভি সুয়েদাম পুরুষ। কাজেই লেভি ভোট দেয়ার যোগ্য। লেভি সুয়েদামের ভোটে হুইগ নির্বাচনে জিতলো এক ভোটের ব্যবধানে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ডাক্তার উইলিয়াম বেরী লেভি সুয়েদামকে পরীক্ষা করতে এসে হতভম্ব হয়ে দেখেন তার নিয়মিত মাসিক হয়, এবং তার উন্মুক্ত যোনীদ্বার রয়েছে। তার কাঁধ মেয়েদের কাঁধের মতই অপ্রশস্ত, নিতম্ব মেয়েদের মতই ভারী। শুধু তাই নয়, লেভি সব সময়ই একটু রঙ চঙ্গা কাপড় চোপড় পছন্দ করতেন, কায়িক শ্রম অপছন্দ করতেন ইত্যাদি। তার এই 'মেয়েলী বৈশিষ্ট্যগুলো'[2] ডাক্তারের চোখে ধরা পড়ে যাবার পরে তিনি আবারো ভোটের অধিকার হারিয়েছিলেন কিনা তা কেউ বলতে পারে না[3]। ফলাফল যাই

---

[1] One of the political party in the United States from about 1829 to 1856, opposed in politics to the Democratic party.

[2] উল্লেখ্য, ঊনবিংশ শতকের ডাক্তারদের মাথায় 'সেক্স' এবং 'জেন্ডারের' মধ্যে কোন পার্থক্য ছিলো না।

[3] Two Sexes Are Not Enough, Anne Fausto-Sterling, NOVA Online, http://www.pbs.org/wgbh/nova/gender/fs.html , Also see Sexing the body, Anne Fausto-Sterling, পুর্বোক্ত।

হোক না কেন লেভি সুয়েদাম কিংবা মারিয়া প্যাতিনোর মত (পুর্ববর্তী অধ্যায় দ্রঃ) ঘটনাগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষকে কেবল 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুইভাগে বিভক্ত করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা অনেকক্ষেত্রেই খুব সরল। যেখানে বিভক্তি এত স্পষ্ট নয়, সেখানে জোর করে লিঙ্গ আরোপকরণ সমস্যা কমায়নি, বরং আরো জটিল করে তুলেছে।

আমি আগের অধ্যায়ে রূপান্তরকামিতা নিয়ে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বলেছিলাম, সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মত যৌনপ্রবৃত্তিগুলোকে ঢালাওভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' অভিধায় অভিহিত করার আগে আমাদের আরেকটিবার চোখ মেলে প্রকৃতির দিকে তাকানো উচিৎ। এরপর সামগ্রিকভাবে বোঝা উচিৎ যৌনতার উদ্ভবকে। প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হল - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণিদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite)[4], কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোন শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। এরা এদের উভলিঙ্গত্ব নিয়েই স্বাভাবিক বংশবিস্তারে সক্ষম[5]। অর্থাৎ, যে যৌনতার বিভাজনের জন্য আমরা যৌনপ্রজরা আজ গর্ববোধ করি, অবলীলায় অন্যদের 'অ্যাবনরমাল', 'আননেচারাল'- এর তকমা এঁটে দেই- গোড়ার দিকে কিন্তু প্রকৃতিতে যৌনতার সেরকম কোন সুস্পষ্ট বিভেদ ছিল না। ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, মানব সমাজেও উভলিঙ্গত্ব বিরল নয়। প্রাচীন গ্রীসে সমকামিতা, প্রাচীন রোমে খোজা প্রহরী (eunuch), নেটিভ ইন্ডিয়ানদের মধ্যে 'দ্বৈত সত্তা' (two-spirits), আরব ও পার্সিয়ায় 'বার্দাশ' এবং ভারতবর্ষে 'হিজড়া'দের অস্তিত্ব সেই সাক্ষ্যই দেয়। এ ছাড়া আছে ভারতের কোতি, ওমানের জানিথ, ইন্দোনেশিয়ার লুডরুক বান্টুট, মাসরি এবং রায়গ, মালয়শিয়ায় আহকুয়া, বাপুক, পোনদান কিংবা নাকনিয়া। তুরস্কে নসঙ্গা, মুস্তাক্‌নেৎ, আরবের মুখান্নাথুন, নেপালের মেটি, থাইল্যান্ডের কাথোই, চিনের তাংঝি, মালাগাসির তসিকাত্, মিশরের খাওয়াল, অ্যাঙ্গোলার চিবাদোস্, কেনিয়ার ওয়াসোগা, পর্তুগালের জিম্বাদা, পলিনেশিয়ার ফাফাফিনি, মেক্সিকোর জোতো/পুতো, ব্রাজিল এবং ইসরায়েলের ত্রাভেস্তি এবং ত্রান্সফরমিস্তা সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রূপান্তরকামী কিংবা উভলিঙ্গ

[4] হার্মাফ্রোডাইট শব্দটি এসেছে গ্রীক উপকথা থেকে। হার্মাফ্রোডিটসও ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন দেবতা। তার বাবার নাম ছিল হার্মেস, আর মা ছিল আফ্রোডাইট। একদিন প্রস্রবণে স্নানের পর তিনি উভলিংগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। হার্মাফ্রোডিটস থেকেই ইংরেজীতে হার্মাফ্রোডাইট (hermaphrodite) শব্দটি এসেছে। শ্লেষাত্মক হলেও সত্যি যে, পশ্চিমা বিশ্ব গ্রীক মিথলোজির সাথে তাল মিলিয়ে প্রানীজগতের সমন্বয় করলেও, প্রানীজগতের উভলিঙ্গত্ব কোন মিথলজি কিংবা রূপকথা নয়, বরং কঠিন বাস্তবতা।

[5] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, পূর্বোক্ত।

সত্তা[6]। হিন্দুদের পুরাণে আমরা পেয়েছি বৃহন্নলা কিংবা শিখন্ডীর মত চরিত্র। আছে শিবের অর্ধনারীশ্বর মুর্তি। পশ্চিমা বিশ্বে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মত ইন্টারসেক্স -সেলিব্রিটিরা বহাল তবিয়তে বাস করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা এদের অনেককেই 'অস্বাভাবিক' হিসবে চিহ্নিত করবেন। আমরা বরং 'স্বাভাবিক' মানুষদের কথা বলি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিবর্তনের দীর্ঘ পথ- পরিক্রমায় আমরা গর্বিত 'স্বাভাবিক' মানুষেরাও নিজেদের দেহেই উভলিঙ্গত্বের বহু আলামত বহন করে চলেছি - নিজেদের অজান্তেই। যেমন, নারী জননাংগ পুরুষের মত না হলেও, পুরুষের শিশ্নের অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যাকে ভগাংগুর বা ক্লাইটোরিস বলে। আবার অন্যদিকে পুরুষ শরীরে স্ফীত স্তন না থাকলেও স্তন ও স্তনবৃন্তের সুপ্ত উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষ্যনীয়। বলাবাহুল্য, বংশবিস্তারে এসমস্ত অংগের কোন ভূমিকা নেই, তবুও আমরা এসমস্ত 'এবনরমালিটি' বহন করে চলেছি 'প্রাকৃতিক ভাবেই' - বিবর্তনের পথ ধরে। আরো কিছু উদাহরণ দেই। পুরুষ শরীরের থেকে ব্যাপক পরিমানে অ্যান্ড্রোজেন (androgen) যেমন নিঃসৃত হয়, তেমনি অল্প পরিমানে হলেও এস্ট্রোজেন (estrogen) নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই এস্ট্রোজেন 'স্ত্রী হরমোন' হিসেবে পরিচিত। ঠিক তেমনি, মেয়েরা স্ত্রী হরমোন নিঃসরণের পাশাপাশি সামান্য পরিমানে হলেও পুরুষ হরমোনও নিঃসরণ করে থাকে। এইভাবে বিপরীত লিঙ্গের অনেক কিছুই আমরা প্রাণের উৎপত্তির ঊষালগ্ন হতে ধারণ করে চলেছি - এবং তা প্রাকৃতিকভাবেই। শুধু মানুষ কেন অনেক প্রানীর মধ্যেই এমনটি লক্ষ্যনীয়। আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী হায়নাদের (spotted hyena) কথা বলা যায়, যাদের নারী সম্প্রদায়কে দেখলে পুরুষ বলেই বিভ্রম হবার কথা। সায়েন্টেফিক আমেরিকানে প্রকাশিত প্রবন্ধে অধ্যাপক ডেভিড ক্রুস বলেন[7] - "The large erectile clitoris of a female spotted Hyena closely resembles a male's penis. Much like many male animals, female spotted hyenas use their clitorises in greeting displays and dominance interactions". এ ধরনের 'পুরুষাংগ সদৃশ' দীর্ঘ ভগাংগুর শুধু স্পটেড হায়নাদের মধ্যে নয়, আছে কাঠবিড়ালী সদৃশ নিশাচর প্রাইমেট 'বুশ বেবী' এবং 'স্পাইডার মাঙ্কি' এবং 'উলি মাঙ্কি'র মধ্যেও[8] । আবার বিপরীতটাও (মেয়েদের মত যৌনাংগ) দুর্লভ নয়। পুরুষ ডলফিন এবং তিমিদের ক্ষেত্রে চোখে পড়ার

[6] বইইয়ের পরিশিষ্টে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এবং সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা রূপান্তরকামী এবং উভলিঙ্গ সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

[7] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[8] Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004।

মত কোন 'বহিস্থ পুরুষাংগ' দেখা যায় না। এই জলজ স্তন্যপায়ীদের (Cetaceans) কোন অণ্ডাশয়ও নেই[9] ।

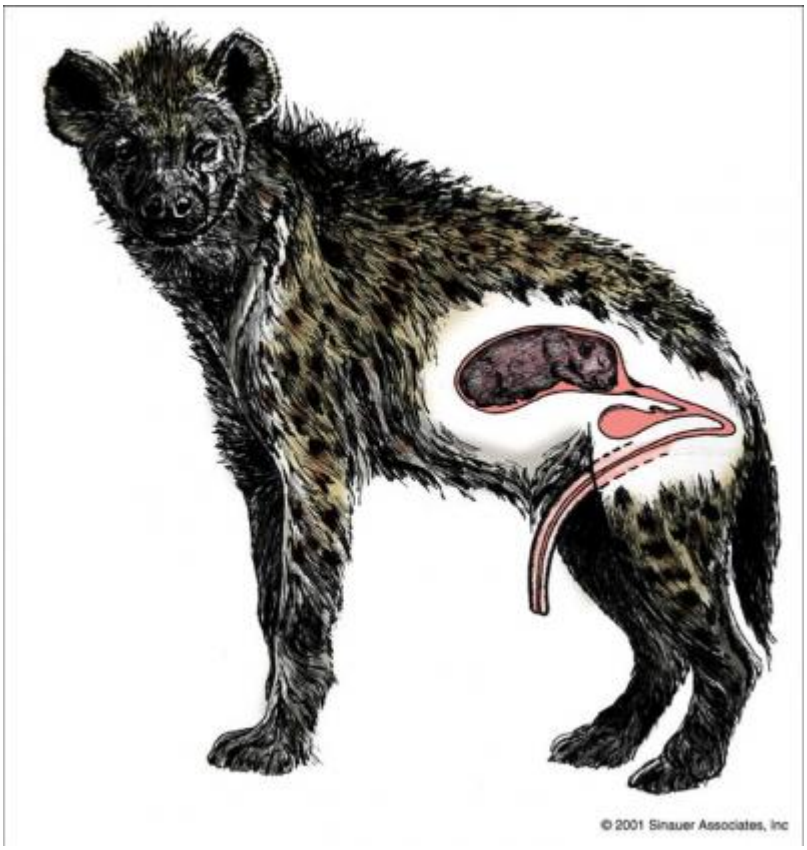

চিত্রঃ আফ্রিকার নিশাচর মাংশাসী স্পটেড হায়নাদের নারী সম্প্রদায়ের পুরুষাংগ সদৃশ দীর্ঘ ক্লাইটোরিস দেখে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন।

এ প্রসংগে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙ্গারুদের কথাও একটু বলে নেই। মেয়ে ক্যাঙ্গারুরা পেটের বাইরের দিকে লাগানো একটি থলিতে বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে - এ ধরণের ছবি আমরা বই- পত্র, সিনেমায় হর- হামেশাই দেখি। পেটের আলগা চামড়া দিয়ে তৈরি থলিটা (ইরেজীতে পাউচ) আসলে ক্যাঙ্গারুদের গর্ভাশয়ের বিকল্প; কারণ মেয়ে ক্যাঙ্গারুদের ওই থলিটা অপরিণত বাচ্চাকে এর মধ্যে রেখে ধীরে ধীরে বড় করে তুলে। অপরিণত বাচ্চাকে অন্য প্রাণীর মায়েরা নিজেদের ইউটেরাসে যেভাবে বড় করে, ঠিক সেভাবেই ক্যাঙ্গারুরা বাচ্চাকে নিজের থলিতে প্রায় নয় মাস রেখে বড় করে তুলে। কাজেই এটা হয়ত ভেবে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শুধু মেয়ে ক্যাঙ্গারুদের পেটে ওইরকম থলি থাকার কথা, ছেলে ক্যাঙ্গারুদের নয়। কিন্তু গোল বাঁধালো ইস্টার্ণ গ্রে ক্যাঙ্গারুরা। এদের

[9] Joan Roughgarden, পূর্বোক্ত।

মধ্যে পুরুষাঙ্গ এবং থলির সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, ক্রোমোজম বিশ্লেষণ করেও কিন্তু দেখা গেছে এরা স্ত্রী জননকোষ (XX) এবং পুরুষ জননকোষ (XY)- এর সমন্বয়ে আভিনব ধরণের XXY প্যাটার্ণ দিয়ে তৈরি[10] । এধরনের উভলিঙ্গ সত্তা এবং অদ্ভুতুরে ক্রোমজোম প্যাটার্ন আছে ফ্রিমার্টিন নামে এক ধরণের গরুজাতীয় প্রানীর মধ্যেও। এদের ক্রোমজমের প্যাটার্ণ XXY, XXX, XXYY, XO থেকে শুরু করে নানা ধরণের বিন্যাস এবং সজ্জা থাকতে পারে। একেক ধরণের বিন্যাস জন্ম দিতে পারে পুরুষ- মহিলার সমন্বয়ে একেক ধরণের মিশ্রণের। আবার কিছু কিছু প্রাণি আছে যাদের দেহের অর্ধেকটা পুরুষ আর অর্ধেকটা নারী; আরো স্পষ্ট করে বললে- দেহের ডানদিকটা (সাধারণতঃ) থাকে পুরুষের আর বাম দিকটা থাকে মেয়েদের। কিছু প্রজাপতি, কাকড়া, মাকড়শা, পাখি, ভালুক সহ বেশ কিছু স্তন্যপায়ী প্রানীদের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এই "অর্ধনারীশ্বর" প্রতিমূর্তির সন্ধান পেয়েছেন। বিজ্ঞানের ভাষায়, যে সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরকম প্রজাতির জন্ম হতে পারে সেগুলো হল চিমারিজম (chimerism), মোজাইক (Mosaic) কিংবা গ্যানাড্রোমরফিজম (Gynandromorphism)। এ ব্যাপারটি শুধু পশু-পাখি নয়, বহু মানুষের মধ্যেও লক্ষ্যনীয়। অনেকেই হয়ত লিডিয়া ফেয়ার চাইল্ড এবং ক্যারেন কিগানের কথা মিডিয়ার দৌলতে জেনে ফেলেছেন। এরা মানুষের মধ্যে 'সিমারিজম'এর বাস্তব উদাহরণ। নিউসায়েন্টিস্ট পত্রিকার ২০০৩ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের মানুষের জন্ম হতে পারে, এবং এখন পর্যন্ত অন্ততঃ ৩০ - ৪০টি এ ধরনের 'ডকুমেন্টেড কেস' আছে[11]।

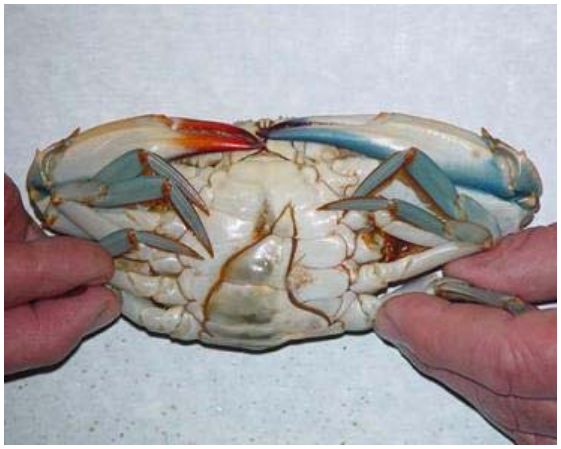

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা প্রজাপতি, কাঁকড়া সহ বহু প্রজাতিতে উভলিঙ্গ সত্তার (গ্যানাড্রোমরফিজম) হদিস পেয়েছেন।

[10] Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, Stonewall Inn Editions, 2000

[11] The Stranger Within, New Scientist vol 180 issue 2421 - 15 November 2003, p 34, On line: http://www.katewerk.com/chimera.html

শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জই কি উভলিঙ্গ সত্তা থেকে মুক্তির এক মাত্র সমাধান?

কিছুদিন আগেও এমনকি পশ্চিমের হাসপাতালে উভলিঙ্গ মানব শিশু (অর্থাৎ, একই দেহে নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সন্তান) জন্মালে ডাক্তারের একটাই কাজ ছিল- অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের এই 'বার্থ ডিফেক্ট' অবহিত করে 'সেক্স চেঞ্জ' (চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় 'সেক্স রিএসাইনমেন্ট') অপারেশন[12] করে হয় ছেলে নয়ত মেয়ে বানিয়ে ছেড়ে দেয়া। অভিভাবকেরাও যেহেতু উভলিঙ্গ সন্তান নিয়ে সমাজে ঝামেলা পোহাতে চেতেন না, তাদের কাছেও এটা একটা সবসময়ইই খুবই আকর্ষনীয় একটা সমাধান হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু আমেরিকায় ডেভিড রেইমার নামে এক রোগীর বিয়োগান্তক পরিনতি সেক্সচেঞ্জ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক সময়ের ধ্যান ধারণা চিকিৎসকদের মধ্যে অনেকটাই পালটে দিয়েছে।

ডেভিড রেইমারকে নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন দুইজন যৌনবিশেষজ্ঞ। এদের একজন হলেন জন মানি, অন্যজন মিল্টন ডায়মন্ড। চিকিৎসাবিদ্যায় এদের বিতর্ক পরিচিত হয়ে আছে 'মানি -ডায়মন্ড'/ 'জন -জোয়ান' বিতর্ক নামে [13]। জন মানি ছিলেন সেসময়কার জগদ্বিখ্যাত যৌন- বিশেষজ্ঞ; অধ্যাপনা করতেন আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষাট এবং সত্তুরের দশকে 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন সেসময়কার শীর্ষস্থানীয় কান্ডারী। তার ধারনা ছিলো, মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মায় 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' হিসেবে। জেন্ডার জিনিসটা যেহেতু পুরোটাই সাংস্কৃতিক, এর সাথে শরীরবৃত্তীয় মনস্তত্বের কোন যোগ নেই। অর্থাৎ জেন্ডার পরিচয় জন্মগত নয়, পুরোপুরি পরিবেশগত। কাজেই জন্মের সময় লৈঙ্গিক জটিলতা সম্পন্ন কোন শিশুকে যদি খুব কম বয়সেই সেক্স চেঞ্জ অপারেশনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জেন্ডার প্রদান করা হয়, তাহলে শিশুটির ভবিষ্যত মানসগঠন ওই প্রদত্ত জেন্ডারের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিবে কোন ধরনের অসুবিধা ছাড়াই। তার তত্ত্বের সাপেক্ষে ডঃ মানি ডেভিড রেইমার নামে এক রোগীর দৃষ্টান্ত হাজির করতেন। রেইমারের সত্যিকারের নাম ধাম পরিচয় প্রকাশ না করে 'জন্' হিসবে অভিহিত করে তিনি তার গবেষণাপত্র এবং পাঠ্যবইয়ে বলেছিলেন, জন্ নামের শিশুটি জীবনের শুরুতেই একটি দুর্ঘটনায় যৌনাংগের একটা বড় অংশ হারিয়ে ফেলে। তার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেক্স রিএসাইনমেন্ট সার্জারির

[12] পরিশিষ্টে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

[13] The Case Of John/Joan; John Colapinto
The Rolling Stone, December 11, 1997; http://www.infocirc.org/rollston.htm

মাধ্যমে অবশিষ্ট পুরুষাঙ্গটি ছেদন করে তাকে নারীতে রূপান্তরিত করে ফেলা হয়েছিল। অভিভাবকদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল তাকে 'জোয়ান্' হিসেবে যেন বড় করা হয়। জোয়ানের অভিভাবকেরা জন মানির কথামত তাইই করে যাচ্ছিলেন। আর ডঃ জন মানিও তার এই সাফল্য ফলাও করে বৈজ্ঞানিক সাময়িকীগুলোতে প্রচার করে যাচ্ছিলেন। মানি তার পেপার আর বইগুলোতে দেখিয়েছিলেন - জোয়ান হিসবে বড় হতে জনের কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। কাজেই ডঃ মানি তর্কাতীত ভাবে সবার সামনে প্রমাণ করেছিলেন - 'মানুষের জেন্ডার নির্ধারণে প্রকৃতির কোন প্রভাব নেই, প্রভাব পুরোটুকুই পরিবেশ সঞ্জাত'। জন মানি তার তত্ত্বের 'প্রমাণের' জন্য বহু পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছিলেন।

তবে সবাই যে জন মানির কথা চোখ বুজে বিশ্বাস করছিলেন তা নয়। এমনি একজন সংশয়ী ছিলেন মিল্টন ডায়মন্ড। তিনি সে সময় কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছিলেন। তিনি এবং তার অধীক্ষক (supervisor) গবেষণার মাধ্যমে দেখালেন যে মানুষের মধ্যকার যৌনতার পার্থক্য আসলে পরিবেশ দ্বারা সূচিত হয় না, সূচিত হয় 'হরমোন' দিয়ে। অর্থাৎ, ডায়মন্ড দাবী করলেন, জন মানি যেভাবে জন্মের সময় 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' থাকে বলে মনে করছেন, তা মোটেই ঠিক নয়। ছেলে মেয়ের পার্থক্যসূচিত ব্যাপার স্যাপারগুলো অনেক আগেই গর্ভকালীন (prenatal) হরমোনের প্রভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। নীচের ছবির মাধ্যমে মানি- ডায়মন্ডের মতাদর্শগত পার্থক্যকে তুলে ধরা যায়। বা দিকের গ্রাফটি মানির 'জেন্ডার নিরপেক্ষ' মডেলকে নির্দেশ করছে, আর ডানদিকের মডেলটি ডায়মন্ডের অনিরপেক্ষ বা ঝোঁকযুক্ত মডেলকে।

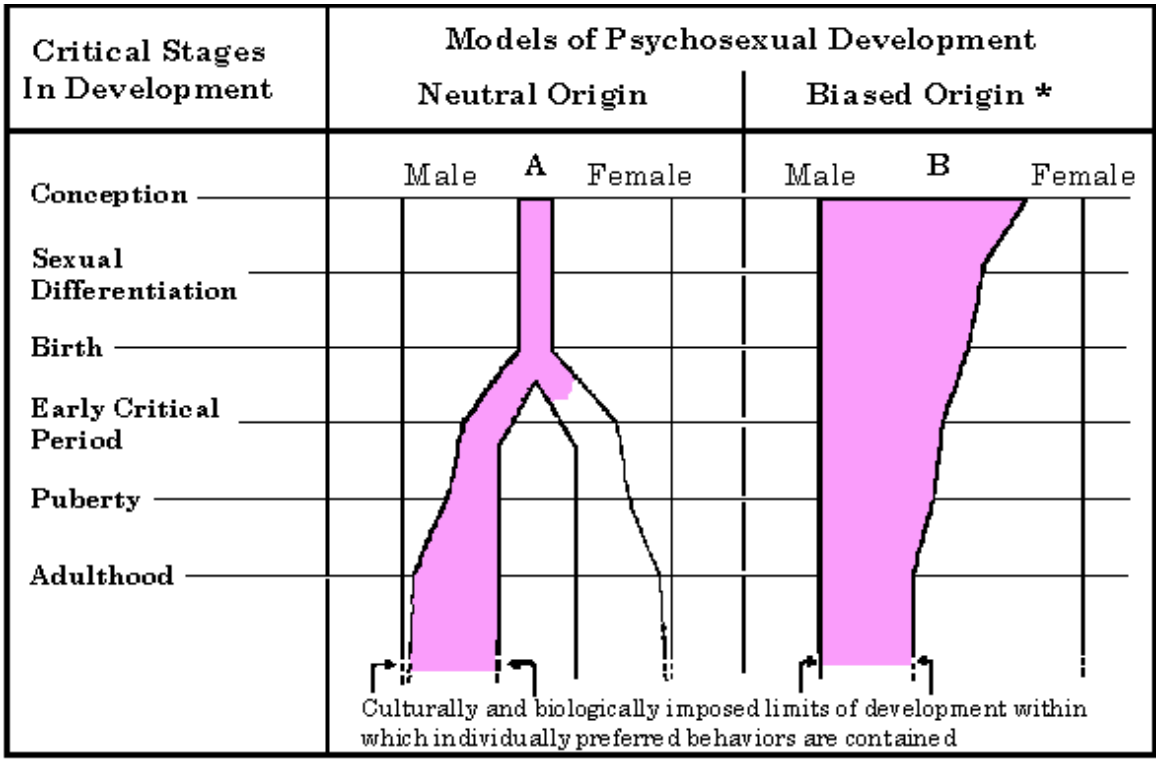

Fig. 1. Models of Psychosexual Development
A. Stemming from a psychosexual neutral dispositoin at birth;
B. Stemming from a psychosexual redisposition at birth.

শুধু ডায়মন্ডই নন, তখন ডঃ বার্নাড জুগার্ড নামে আরেক মনোবিজ্ঞানীও তার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে দেখাচ্ছিলেন যে, ডঃ মানির অনুমান মোটেও সত্য নয়।

কিন্তু ডঃ মানি ডায়মন্ড কিংবা জুগার্ডের গবেষণাকে গোনায় না ধরে নিজের প্রচারনা চালিয়েই যাচ্ছিলেন। এমনকি ১৯৮২ সালের পেপারেও তিনি জন/জোয়ান কেসের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন - 'to support the connection that sex roles and sexual identity are basically learned'। জন মানির এই দৃষ্টিভঙ্গি সেসময় প্রগতিশীল মহলে দারুন সমর্থন পেয়েছিলো, এমনকি নিউইয়র্ক টাইমসের মত পত্রিকা প্রায়ই জন মানিকে উদ্ধৃত করে পাঠকদের বিশ্বাস করাতে চাইতো আমাদের প্রবৃত্তির সবকিছুই পরিবেশগত, জন্মগত কিছু নেই।

এ সময় বিবিসি থেকে জন- জোয়ান কেসের উপর ফীচার করে একটি ডকুমেন্টরী করার পরিকল্পনা করা হয়। বিবিসির মূল লক্ষ্য আসলে ছিল জন মানির কাজকে তুলে ধরা, এবং সামান্য সময়ের জন্য বিপরীত ধারণা হিসেবে ডায়মন্ডের কথাবার্তা হাল্কা ভাবে দেখানো। কিন্তু ফীচার করতে গিয়ে বিবিসির অনুসন্ধিৎসু দল এক অদ্ভুত জিনিস আবিস্কার করলেন। জন মানি তার তত্ত্বের স্বপক্ষে ডেভিড রেইমারের যে কেসকে 'সফল' হিসবে প্রতিপন্ন করে এসেছেন, সেটা মোটেই সফল নয়। তারা লক্ষ্য করলেন 'ব্রেন্ডা রেইমার' নামে বড় হওয়া মেয়েটি হাটে ছেলেদের মত, গলার স্বরও মেয়েলী নয়। অভিভাবকের সাথে কথা বলে জানা গেল, মেয়ে হিসবে বড় হতে গিয়ে তাকে নানা ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনই সে মেয়েদের পুতুল পছন্দ করতো না, মেয়েদের ড্রেস দু চোখে দেখতে পারতো না, এমনকি বাথরুমে গিয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে চাইতো। একটা সময় 'মেয়েলী' সমস্ত কিছু করার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো সে। দু তিন বার আত্মহত্যার প্রচেষ্টাও নিয়েছিল সে। জন মানিকে এ বিষয়ে বিবিসির সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করলে জন মানি সাংবাদিকদের সাথে এ নিয়ে কোন ধরনের আলোচনা করা থেকে বিরত থাকলেন।

চিত্রঃ ক) মেয়ে হিসবে বড় হতে থাকা ডেভিড রেইমার খ) বড় হয়ে পুনরায় ডেভিডে প্রত্যাবর্তন

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। একটা সময় পর ব্রেন্ডার অভিভাবকেরা তার মানসিক অস্থিরতা সহ্য না করতে পেরে তার শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জ সংক্রান্ত অপারেশনের কথা বলে দিলেন। সেটা শুনে ব্রেডা বুঝতে পারলো - কেন তার মেয়ে হিসবে খাপ খাইয়ে নিতে বরাবরই সমস্যা হচ্ছিলো। সে আসলে ছেলেই ছিলো বরাবরই - মানসিকভাবে। বাবা মার কাছ থেকে আসল ঘটনা শোনামাত্র সে তৎক্ষনাৎ তার ব্রেডা নাম পরিত্যাগ করে পুনরায় ডেভিড হয়ে গেল। চুল ছেটে ফেলল প্রথমেই। সার্জিকাল অপারেশন করে স্তনের আকার কমিয়ে আনলো। পরে তার অনুরোধে ডাক্তারেরা তার দেহে নতুন করে পুরুষাঙ্গ

পুনঃস্থাপিত করলো, এমনকি পরবর্তীতে জেন নামে চমৎকার একটি মেয়ের সাথে পরিনয়সূত্রে পর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে পড়লেন ডেভিড।

এদিকে মিল্টন ডায়মন্ড এই ঘটনা লোকমুখে জানতে পেরে তার সাথে একসময় দেখা করেন, এবং সব কিছু নিজের চোখে দেখে হতভম্ব হয়ে যান। তিনি ডেভিডকে অনুরোধ করেন ভবিষ্যত রোগীদের কথা ভেবে তিনি যেন তার ঘটনা মিডিয়ায় প্রকাশ করেন। ডেভিড প্রথমদিকে অস্বীকৃতি জানালেও পরবর্তীতে রাজী হন এবং ১৯৯৭ সালে মিল্টন ডায়মন্ড ডেভিড রেইমারের সুপারভাইজিং সাইক্রিয়াট্রিস্ট কেইথ সিগ্মুন্ডসনের সাথে মিলে একটি পেপার প্রকাশ করলে ডেভিডকে নিয়ে সমস্ত জারিজুরি জনসমক্ষে ফাঁস হয়ে যায়। ঠিক একই সময়ে বিজ্ঞান লেখক জন কলাপিন্টো রোলিংস্টোন ম্যাগাজিনে ডেভিড রেইমারকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ[14] লিখেন এবং পরবর্তীতে সেটিকে আরো বিবর্ধিত করে একটি বই রচনা করেন - 'As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl' শিরোনামে[15]।

ডেভিডের এই ঘটনা একাডেমিক জগত শুধু নয়, সাধারণ মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা বদলে দারুনভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়মন্ড জন মানির তত্ত্বের মূল ভিত্তি পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দেন আর প্রমান করেন যে, কারো মনোযৌনতার ক্যানভাস 'নিরপেক্ষ' হয়ে জন্মায় না[16]। শুধু তাই নয়, পুরুষাঙ্গ কিংবা ক্লাইটোরিসের কিংবা আকার, আকৃতি কিংবা 'বিকৃতি' দেখে চিকিৎসকদের তাৎক্ষনিক সিদ্ধান্তে 'সেক্স চেঞ্জ' রোগীর পরবর্তী জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। তবে অনেকেই মনে করেন যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে মানি এবং অন্যান্য 'বিশেষজ্ঞ'দের ভুলের পেছনে প্রধান কারণ ছিলো বিজ্ঞানমনস্ক যৌনসচেতনতার অভাব। কারণ, তারা সজ্ঞাতভাবে ধরেই নিয়েছিলেন -

১। প্রকৃতিতে শুধুমাত্র দুইটি সেক্স থাকবে - নারী এবং পুরুষ।
২। প্রকৃতিতে শুধুমাত্র 'হেটোরোসেক্সুয়ালিটি' বা বিষমকামীতাই 'স্বাভাবিক'।
৩। জন্ম মূহূর্তেই হার্মাফ্রোডাইট বা মিশ্রিত যৌনতা সম্পন্ন শিশুর জেন্ডার পরিবর্তিত করে দিয়ে মানসিক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মানুষ তৈরী করা যায়।

---

[14] "The True Story of John/Joan", Colapinto, John, Rolling Stone, 1997, pp. 54-97.
[15] As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl, John Colapinto, Harper Perennial. ISBN 0-06-092959-6. Revised in 2006
[16] According to Dr. Diamond, far from being sexually neutral, the brain was infact prenatally generated. For Details, check, Clinical implications of the organizational and activational effects of hormones, Milton Diamond, Hormones and Behavior 55 (2009) 621–632.

ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক পরিনতি[17] ডাক্তারদের এই সনাতন মনমানসিকতাগুলো বদলানোর পেছনে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছে। আগে মনে করা হত, মানুষের প্রবৃত্তি কিংবা জেন্ডারর গঠনে জিন কিংবা হরমোনের কোন প্রভাব নেই, পুরোটাই পরিবেশ নির্ভর। কিন্তু রেইমারের ঘটনার পর এই সংক্রান্ত চিন্তাধারা অনেকটাই বদলে গেছে [18]। এর প্রভাব পড়েছে নারীবাদী, সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামীদের আন্দোলনেও। নর্থ আমেরিকান ইন্টারসেক্স সোসাইটি শিশু বয়সে সেক্স চেঞ্জ অপারেশনের তীব্র বিরোধিতা করে মতামত ব্যক্ত করে যে, ডেভিড রেইমারের বিয়োগান্তক দৃষ্টান্ত থেকে সামাজিক জটিলতাগুলো বুঝতে ডাক্তারদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। তাদের মতে, একটি শিশু বড় হয়ে যখন নিজের জেন্ডার আইডেন্টিটি সচেতন হয়ে উঠে, তার আগে 'সেক্স অপারেশন' করা আসলে শিশু নিপীড়নের সমতুল্য। যৌনতা পরিবর্তনের চেয়ে যেটা আরো বেশী দরকার সেটা হল - নারী- পুরুষের বাইরেও অন্যান্য লৈঙ্গিক পরিচয় এবং যৌনতাগুলো সম্পর্কে জনসচেততনা এবং এগুলোর সামাজিক স্বীকৃতি। এটাই এখন যুগের দাবী।

কেমন আছে বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবেরা?

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা আর কলমজীবী বুদ্ধিজীবীরা যেমন যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে সমকামীতার স্বীকৃতি নিয়ে ভাবিত নয়, তেমনি ভাবিত নয় 'হিজড়া'[19] নামে কথিত বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের সমস্যা কিংবা তাদের অধিকার নিয়ে। উভলিঙ্গ মানবরা সমাজে অপাংক্তেয়, পরিত্যক্ত। বাংলাদেশে উভলিঙ্গ মানবদের সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ বলে অনুমিত হয়[20]। তবে এই সংখ্যাটি নিয়ে বিতর্ক আছে। কারণ অপ্রকাশিত উভলিঙ্গ মানবদের সংখ্যা বের করা কঠিন। আর্থিক সঙ্গতি যে সমস্ত পরিবারে আছে তাদের অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই পরিচিতি সযত্নে ঢেকে রাখতে পারেন বলে বাইরের মানুষ তা অনেক সময়ই জানতে পারে না। যে সমস্ত জায়গায় লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পরিচিতি আর ঢেকে রাখা যায় না কিংবা বাইরে থেকে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তাদের সামনে আর কোন উপায় খোলা থাকে না। কেবল তখনই তারা 'হিজড়া' হিসেবে সমাজে

---

[17] ডেভিড রেইমার পরবর্তীতে ভাইয়ের মৃত্যু, নিজের বিবাহ বিচ্ছেদ এবং চাকরীগত সমস্যা সহ নানা কারনে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যা করেন। ডেভিডের অভিভাবকেরা ডেভিডের এই বিয়োগান্তক পরিণতির জন্য জন্ মানির সারা জীবনের ভুল চিকিৎসাকে দায়ী করেছেন।

[18] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন পরিশিষ্ট: মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?

[19] হিজড়া শব্দটি আমাদের দেশে খুব তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় বলে আমি তাদের বোঝাতে এই বইয়ে ' উভলিঙ্গ মানব' শব্দটি চয়ন করেছি। তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুল শব্দটিই বহাল রেখেছি বাস্তবতা বিবেচনায়। যেমন হিজড়া- পল্লী, হিজড়া সমাজ ইত্যাদি। তবে এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিজড়াদের সবাই বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে ' উভলিঙ্গ' নাও হতে পারে, অনেকেই হয়তো কেবল মানসিকভাবে রূপান্তরকামী।

[20] হিজড়া: প্রকৃতির বিচিত্র খেয়ালের এক দুর্ভাগা শিকার, রণদীপম বসু, মুক্তমনা।

আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয় এবং পরিবার থেকে বের হয়ে যেতে হয়। রাজধানী ঢাকাতে উভলিঙ্গ মানবের সংখ্যা প্রায় পনের হাজার বলে মনে করা হয়[21]।

কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের অবহেলা আর বঞ্চনার শিকার হলেও বেঁচে থাকার তাগিদে উভলিঙ্গ মানবরা তৈরী করেছে নিজেদের এক নিজস্ব জগৎ। সেখানেই তারা যায়, যেখানে তাদের নিজস্ব জগতটা নিজেদের মতো করেই সাজায়, অব্যক্ত বেদনাগুলো ভাগাভাগি করে নেয় নিজেদের মধ্যেই। তারা নিজেরা বসবাসের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৈরী করে হিজড়া পল্লী। 'পল্লী' মানে হচ্ছে আসলে 'হিজড়াদের বস্তি' যেখানে সংঘবদ্ধ হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাস করতে পারে উভলিঙ্গ মানবরা। যেখানে তাদের নিজস্ব সমাজ, নিজস্ব নিয়ম, নিজস্ব শাসন পদ্ধতি, সবই ভিন্ন প্রকৃতির। কোথাও কোন বাড়িতে কোন উভলিঙ্গ সন্তান জন্মের খবর পেলেই তারা দল বেধে চলে যায়, বাড়ির সামনে নাচ গান করে, তারা শিশুটিকে নিজেদের পল্লীতে নিয়ে আসতে চায়। অনেক সময় পরিণত বয়সেও অনেকে হিজড়া-পল্লীতে যোগদান করে। দেখা গেছে যে অসচ্ছল নিম্নশ্রেণীর পরিবার থেকেই বাইরে বেরিয়ে যাবার প্রবণতা বেশি। তবে যে সময়ই বা যেখান থেকেই যোগদান করুক না কেন, তাদের সাদরে হিজড়া সমাজে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অন্যান্য উভলিঙ্গ মানবেরা আগামী দিনের সহচরী তাদের বরণ করে নেয়। এরা নতুন সাথীকে কখনোই ভুলে না, বরং উৎফুল্ল হয় আরেকজন সঙ্গী বাড়ছে বলে। অনেক সময় নানা কারণে পল্লীতে যোগদান করতে ইচ্ছুক রূপান্তরকামী কিংবা উভলিঙ্গ মানবদের পথ দেখিয়ে তারাই নিয়ে যায় তাদের নিজেদের পল্লীতে, শেখায় তাদের নিয়ম কানুন। যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে পুরুষ, কিন্তু মানসিকভাবে নারী স্বভাবের সে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবদেরকে পল্লীতে ডাকা হয় 'অকুয়া' হিসবে। অন্য দিকে যে সমস্ত উভলিঙ্গ মানবরা শারীরিকভাবে নারী, কিন্তু মানসিকভাবে পুরুষ, তাদের বলা হয় 'জেনানা'। এছাড়া সামাজিক প্রথার শিকার হওয়া মনুষ্যসৃষ্ট উভলিঙ্গ মানবদেরকে (এরা আসলে রূপান্তরকামী) বলা হয় 'চিন্নি'।

হিজড়া বলে কথিত বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানবদের সামাজিক নিয়মকানুনগুলো ভিন্ন প্রকৃতির। রাজধানীর প্রতিটি এলাকায় একজন করে সর্দার থাকে। তারা সাধারণ উভলিঙ্গ মানবদের নিয়ন্ত্রণ করে। রাজধানীতে পাঁচ গুরুর আওতায় প্রায় পনের হাজার 'হিজড়া' রয়েছে। একজন উভলিঙ্গ মানবের কাছে তার রক্তের সম্পর্ক বড় নয়। রক্তের চেয়ে অনেক বড় হচ্ছে গুরু শিস্য সম্পর্ক। শিস্যের কাছে গুরুই সব। দলে ভিড়ে যাবার পর সে গ্রহণ করে তার পছন্দমত কোন বয়স্ক উভলিঙ্গ মানবের শিষ্যত্ব। সর্দারের বা গুরুর আদেশ

[21] পূর্বোক্ত।

ছাড়া কোনও দোকানে কিংবা কারও কাছে হাত পেতে টাকা চাইতে পারবে না। গুরুই শিষ্যদের এলাকা ভাগ করে দেয়। প্রতিটি গুরুর অধীনে ৮/১০টি দল থাকে। একটি দলে ৫/৬ জন থাকে। প্রতিদিন সকালে গুরুর সঙ্গে দেখা করে দিক- নির্দেশনা শুনে প্রতিটি দল টাকা তোলার জন্য বের হয়ে পড়ে। বিকাল পর্যন্ত যে টাকা তোলা হয়। প্রতিটি দল ওই টাকা সর্দারের সামনে এনে রেখে দেয়। গুরু ওই টাকার অর্ধেক নিয়ে নেয় আর বাকি টাকা শিষ্যরা ভাগ করে নেয়। প্রতি সপ্তাহে উভলিঙ্গ মানবদের সালিশি বৈঠক হয়। ১৫/২০ সদস্যের সালিশি বৈঠকে গুরুর নির্দেশ অমান্যকারী উভলিঙ্গ মানবদের কঠোর শাস্তি পর্যন্ত দেওয়া হয়। বেত দিয়ে পেটানোসহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক নির্যাতন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য টাকা তোলার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। জরিমানা হয় অপরাধের ধরন অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। দন্ডিত উভলিঙ্গ মানবকে তার নির্ধারিত এলাকা থেকে তুলে এই টাকা পরিশোধ করতে হয়। গুরুর এ শাস্তি উভলিঙ্গ শিস্যরা সাধারণতঃ মাথা পেতে মেনে নেয়[22]।

উভলিঙ্গত্ব - আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা

উভলিঙ্গ মানবদের ইংরেজীতে অভিহিত করা হয় হার্মফ্রোডাইট হিসেবে। সোজা বাংলায় উভলিঙ্গ। উভলিঙ্গত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় - প্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (true-hermaphrodite) এবং অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (pseudo-hermaphrodite)। প্রকৃত উভলিঙ্গ হচ্ছে যখন একই শরীরে স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের সহাবস্থান থাকে। তবে প্রকৃতিতে প্রকৃত উভলিঙ্গত্বের সংখ্যা খুবই কম। বেশী দেখা যায় অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব। সাধারণতঃ ছয় ধরণের অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব দৃশ্যমান[23] - কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH), এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS), গোনাডাল ডিসজেনেসিস, হাইপোস্পাডিয়াস, টার্নার সিন্ড্রোম (XO) এবং ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম (XXY) । উভলিঙ্গত্বের বিভিন্ন প্রপঞ্চের উদ্ভব বিভিন্ন কারণে হয়। যেমন, মারিয়ার ক্ষেত্রে হয়েছে এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম - শিশু বয়সে তার দেহকোষ এন্ড্রোজেন সনাক্ত করতে পারে নি। এ ছাড়া ক্রোমজমের বৈসাদৃশ্যতার কারণেও উভ্লিঙ্গত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যেমন ক্লেইনফ্লেয়ার সিন্ড্রোমের

[22] হিজড়া সম্প্রদায় তৃতীয় লিঙ্গ নয় কেন?, ঝর্না রায়, সাপ্তাহিক ২০০০ বিশেষ প্রতিবেদন, নভেম্বর ১৪, ২০০৮।
[23] সারণী ৩.১ দ্রষ্টব্য।

ক্ষেত্রে পুরুষ শিশু একটি বাড়তি ক্রোমোজম নিয়ে জন্মায় (অর্থাৎ, XY এর বদলে XXY))। টার্নার সিন্ড্রোমে আবার মেয়ে শিশুর একটি এক্স ক্রোমোজম কম থাকে (XO)। এ গুলো ছাড়াও বিশেষ কিছু হরমোনের অভাবে উভলিঙ্গত্ব প্রকাশ পেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে জীবন ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকলেও অধিকাংশ প্রকরণগুলোই চিকিসাবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে ক্ষতিকর কিছু নয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্যিকার জীবন ঝুঁকি তৈরি হয়, সেগুলোতে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করা অপরিহার্য, অন্যগুলো নিতান্তই কসমেটিক। প্রচলিত দৃষ্টিকোন থেকে উভলিঙ্গত্বকে অস্বাভাবিক বলে মনে করা হলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রানীজগতের একেবারে গোড়ার দিকে কিছু পর্ব হল - প্রটোজোয়া, পরিফেরা, সিলেনটেরেটা, প্লাটিহেলমিনথিস, অ্যানিলিডা, মোলাস্কা ও কর্ডাটা। এই সমস্ত প্রাণিদের বেশিরভাগই উভলিঙ্গ বা হার্মাফ্রোডাইট (Hermaphrodite), কারণ এদের শরীরে স্ত্রী ও পুরুষজননাঙ্গের সহবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এদের জন্য উভলিঙ্গত্ব কোন শারীরিক ত্রুটি নয়, বরং এটি পুরোপুরি 'প্রাকৃতিক'। প্রকৃতিতে এখনো পালমোনেট, স্নেইল এবং স্লাগেদের অধিকাংশই হার্মাফ্রোডাইট। তবে মানুষের সমাজে যেহেতু জেন্ডার ইস্যু খুব প্রবল সেহেতু উভলিঙ্গ মানবদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তারপরেও ধ্যান ধারণা সাম্প্রতিক সময়ে কিছুটা পাল্টেছে। পশ্চিমা বিশ্বের বহু জায়গায় ইতোমধ্যেই কেবল নারী- পুরুষ - এই দ্বিলিঙ্গভিত্তিক সমাজ ঘুচিয়ে দিয়ে বহুলিঙ্গভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে [24]। পশ্চিমে শেরিল চেজ, এরিক শেনিগার, জিম সিনক্লায়ারের মত ইন্টারসেক্স - সেলিব্রিটিরা নিজ পরিচয়ই বাস করেন। ভারতেও 'শবনম মৌসি' নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে পেরেছেন। বাংলাদেশেই বা উভলিঙ্গ মানবরা তৃতীয় লিঙ্গ বলে বিবেচিতা হবে না কেন - যুগের দাবীর প্রেক্ষাপটে এ অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন আজ।

সারণী ৩.১ *প্রকৃতিতে ঘটা উভলিঙ্গত্বের সবচেয়ে সাধারণ প্রকরণগুলো*

[24] উদাহরণ স্বরূপ, সম্প্রতি জীববিজ্ঞানী Anne Fausto-Sterling 'নারী' এবং 'পুরুষ' এই দুই লিঙ্গের পাশাপাশি *হার্মস* (ট্রু হার্মাফ্রোডাইট), *নার্মস* (মেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) এবং *ফার্মস* (ফিমেল সুডো হার্মাফ্রোডাইট) - এর প্রস্তাব করেছেন। A. Fausto-Sterling (1993). "The Five Sexes: Why male and female are not enough". The Sciences (May/April 1993): 20–24. এ ছাড়া অনলাইনে দেখুন, Two Sexes Are Not Enough, Nova Online.

নাম	কারণ	বৈশিষ্ট
কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH)	সাধারনতঃ CYP_{2I} জিনের অনুপস্থিতি কিংবা বাধা জনিত কারণে দেহে এন্ড্রোজেনের তারতম্য ঘটে।	মেয়েদের (**XX** সন্তানের) ক্ষেত্রে 'পুরুষত্ব' বৃদ্ধির লক্ষণ যেমন - দীর্ঘ ভগাঙ্গুর দৃশ্যমান থাকে। কিছু ক্ষেত্রে দেহে লবন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে এবং জীবন মৃত্যু ঝুঁকির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ স্ট্রেস হরমোন কর্টিসোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম (AIS)	দেহস্থ কোষে 'এন্ড্রোজেন গ্রাহক'- জনিত সমস্যার ফলে উদ্ভুত।	XY সন্তানের মেয়েলী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বয়োসন্ধিকালে স্তন বৃদ্ধি পায়, নারী কাঠামোর আদলে দেহ বৃদ্ধি পায়।
গোনাডাল ডিসজেনেসিস	বিভিন্ন কারণে ঘটে, কিছু ক্ষেত্রে জেনেটিক।	XY সন্তানের জননতন্ত্র সঠিকভাবে বিবর্ধিত হয় না।
হাইপোস্পাডিয়াস	এটিও বিভিন্ন কারণে ঘটে, এর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হল এন্ড্রোজেনের তারতম্য।	মুত্রনালীর দ্বার লিঙ্গের মুখে না হয়ে নীচে গঠিত হয়। চরম কিছু ক্ষেত্রে মুত্রদ্বার লিঙ্গের একদম গোড়ায় তৈরি হতে পারে।
টার্নার সিন্ড্রোম	জন্মানোর সময় মেয়ে শিশুর একটি ক্রোমোজম কম থাকে (XO) ।	মেয়েদের জননতন্ত্রের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। ডিম্বাশয় সঠিক আকারে গঠিত হয় না। গৌন জননগত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুপস্থিত থাকে। সাধারনতঃ এস্ট্রোজেন এবং অন্যান্য বৃদ্ধিসূচক হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।
ক্লাইনেফেল্টার সিন্ড্রোম	পুরুষ শিশুর একটি X ক্রোমোজম বেশি থাকে	জননতন্ত্রের সমস্যা থেকে বন্ধ্যাত্ব সংক্রান্ত সমস্যা

নাম	কারণ	বৈশিষ্ট
	(XXY) ।	তৈরি হতে পারে। বয়োসন্ধিকালের পর স্তনের বৃদ্ধি ঘটে। টেস্টোস্টেরোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

তবে এত কিছুর মধ্যেও আশার কথা যে, বিগত নির্বাচনের (২০০৯) ভোটার তালিকায় এই প্রথম উভলিঙ্গ মানবদেরকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের এই উদ্যোগ বিবেকবান মানুষের সমর্থনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থারও প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। তবু প্রায় এক লাখ উভলিঙ্গ মানবকে এবারের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা এখনো রয়ে গেছে বলে জানা যায়। কেননা,

- তাদেরকে তাদের নিজের পরিচয় উভলিঙ্গ মানব হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি বা করা যায়নি; হয়েছে ছেলে বা মেয়ের লৈঙ্গিক পরিচয়ে, যেখানে যেটা সুবিধাজনক মনে হয়েছে সেভাবেই। ফলে সবকিছু থেকে বঞ্চিত এই সম্প্রদায়ের আদতে কোন সামাজিক স্বীকৃতি মেলেনি।

এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো আছে, তার মধ্যে [25]

- বাংলাদেশে নারীর তুলনায় পুরুষের অনুপাত বেশী হবার কারণে আদমশুমারিতে বেশিরভাগ উভলিঙ্গ মানবকেই দেখানো হয় পুরুষ হিসেবে।
- এদের নিয়ে বিদেশ ভ্রমণে নানা জটিলতা। ভিসা ফর্মগুলোতে এদের জন্য কোনো ঘর বরাদ্দ করা হয়নি। এদেরকে হয় পুরুষ কিংবা নারীর ঘরে টিক দিতে হয়, ইমিগ্রেশনে গিয়ে পড়তে হয় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি।
- বাংলাদেশে এদের জন্য পাসপোর্ট করতে হলেও পরিচয় দিতে হয় পুরুষ অথবা নারী হিসেবে।
- ভাসমান জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় আর স্থায়ী ঠিকানা না থাকায় অনেকেই আবার পাসপোর্টও পায় না।

এই জটিলতার কারণ হচ্ছে ‘নারী’ ‘পুরুষ’ ছাড়া আর কোন লৈঙ্গিক পরিচয় আমাদের সমাজে গ্রহনযোগ্য না হওয়া বা স্বাভাবিক না মনে করার প্রবণতা। আসলে নারী-

[25] মাহবুব লীলেন, রণদীপম বসুর প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, সচলয়ায়তন।

পুরুষের বাইরে অন্য লিঙ্গগুলোও সমাজে পরিচিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। পশ্চিমে সতাতন লিঙ্গের বাইরে অন্যান্য লৈঙ্গিক স্বীকৃতি অল্প হলেও কিছুটা আদায় করা গেছে। বহু ইন্টারসেক্স সেলিব্রিটি সেখানে নিজ পরিচয়ই সমাজে বাস করেন। এমনকি ভারতেও উভলিঙ্গ সম্প্রদায় থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে উভলিঙ্গ মানবদের প্রাপ্য অধিকার ও মানুষ হিসেবে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ আইনের দরকার হয়ে পড়েছে আজ, প্রয়োজন হয়েছে সনাতন লৈঙ্গিক বলয় ভাঙ্গার। এজন্যেই আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে 'হিজড়া'দেরকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মানবিক দাবীটাও।

কয়েকটি সংগঠন খুব ছোট্ট পরিসরে হলেও বাংলাদেশের উভলিঙ্গ মানব সমাজের জন্য কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, সুস্থ জীবন, বাঁধন হিজড়া সংঘ, লাইট হাউস, দিনের আলো ইত্যাদি সংগঠনের নাম উল্লেখ্য। এদের কার্যক্রম ততোটা প্রচারের আলোতে না এলেও এইডস প্রতিরোধসহ কিছু উন্নয়ন কার্যক্রমে এরা যুক্ত রয়েছে বলে জানা যায়। কিন্তু এদের কাজকর্মের পেছনে রাষ্ট্রের কোন অনুদান নেই। আসলে উভলিঙ্গ মানবদের সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তা এবং সমাধান করার জন্য কোন রাষ্ট্রীয় বাজেটও বরাদ্দ নেই। তাই রাষ্ট্রের কাছে উভলিঙ্গ মানবদের প্রধান দাবি আজ, তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি। কেননা এই লিঙ্গস্বীকৃতি না পেলে কোন মানবাধিকার অর্জনের সুযোগই তারা পাবে না বলে অনেকে মনে করেন। শুধু বাংলাদেশ নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই এই দাবী কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবর্তনের দৃষ্টিতে সমকামিতা

প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং সমকামিতা

এ অধ্যায়ে আমরা আবারো যৌনপ্রজ এবং অযৌনপ্রজদের গল্পে ফিরে যাব। বিবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে যৌনপ্রজদের যাবতীয় কাজ- কর্ম যে বিধ্বংসী রকমের অপচয়ী তা আগেই উল্লেখ করেছি (প্রথম অধ্যায় দ্রঃ)। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী প্রফেসর রিচার্ড ডকিন্স এই অপচয়ী প্রক্রিয়ার 'তান্ডব' দেখে এক সময় মন্তব্য করেছিলেন, কোন প্রজাতি যদি একবার কোনভাবে যৌনপ্রজ থেকে অযৌনপ্রজয় রূপান্তরিত হয়ে যায়, তবে সে প্রজাতিতে আর মনে হয়না সেক্স আবার কখনো ফেরৎ আসবে- 'স্ট্যাটিস্টিকালি ইম্প্রোবাবেল'। ফরাসী ফসিলবিদ লুইস ডোল্লোর অনুকল্প যদি সঠিক হয়ে থাকে (বিবর্তনের কোন ধারা যদি একবার ভেঙ্গে যায়, তা আর নতুন করে কখনো গজাবে না), তবে অপচয়বপ্রবণ সেক্সের আবার সেই প্রজাতিতে ফেরৎ না আসারই কথা। এখন, যৌনপ্রজদের যৌনতার ব্যাপারটা যদি এত নিকৃষ্ট এবং অপচয়প্রবনই হয়ে থাকে তবে তারা এত ঢালাওভাবে প্রকৃতিতে টিকে আছে কি করে? যৌনপ্রজদের নামে এত গীবৎ গাওয়ার আর অযৌনপ্রজদের এত গুণগান করার পরও দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির উচ্চশ্রেনীর জীবজগতের শতকরা নিরানব্বই ভাগই 'অযৌনপ্রজ' নয়, বরং 'যৌনপ্রজ'। কেন এমন হল? ব্যাপারটা জীববিজ্ঞানীদের কাছে অনেকটা ধাঁধার মত। ধাঁধার উত্তর বহু গবেষক অনেকভাবে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। কেউ বলেছেন, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে খারাপ দেখালেও হয়ত যৌনতার ব্যাপারটা দলগতভাবে সেরকম খারাপ নয়, বরং টিকে থাকার ক্ষেত্রে এটি কোন বাড়তি সুবিধা দেয়। অনেক বিজ্ঞানীর মতে, সেক্স জিনিসটা জীবজগতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জেনেটিক প্রকারণ (variation) বা ভিন্নতা তৈরি করে, যা বিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। কথাটার মাঝে যে কিছুটা হলেও সত্যতা নেই তা নয়। এটা ঠিক পার্থেনোজেনেসিস নামধারী অযৌনপ্রজদের প্রাকৃতিক ক্লোনিং প্রক্রিয়ায় কোন রকম বংশগত ভিন্নতা বা বৈচিত্র থাকে না, কারণ, এরা কেবলমাত্র মায়ের একই জেনেটিক বৈশিষ্ট নিয়েই জন্মায়। যার ফলে জন্মানো সবাই - ছেলে, নাতি, পুতি, জ্ঞাতিগোষ্ঠি - বংশগতভাবে একই হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোন মিউটেশন না ঘটে এবং তা

বংশপরপম্পরায় চালিত না হয়। বিজ্ঞানীরা ধারনা করেন, জেনেটিক প্রকারণ না থাকায়, হঠাৎ করে পরিবেশে কোন পরিবর্তন ঘটলে তারা এর সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে যেমন খাদ্যাভাব বা রোগবালাইয়ের আগমনে এরা নিজেদের সহজে রক্ষা করতে নাও পারতে পারে যা হতে পারে প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ। আবার, কখনো কোন কারণে এদের বংশধারার মধ্যে একবার কোন ক্ষতিকর মিউটেশনের জন্ম হলে, (জেনেটিক প্রকারণ না থাকায়) তারা এই ক্ষতিকর মিউটেশনটি বহন করে যাবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। কিন্তু তারপরও শুধুমাত্র 'জেনেটিক ভ্যারিয়েশনের' ধুয়া তুলে নিতান্ত অপচয়ী এই মাধ্যমের টিকে থাকার ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করাকে আনেক গবেষকই মেনে নিতে পারেন নি। সাসেক্স ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক *জন মায়নার্ড স্মিথ* , সেই ১৯৭৮ সালে একটি বই লিখেছিলেন -'ইভল্যুশন অব সেক্স'[1] নামে। সেখানে তিনি সেক্স বা যৌনতার ব্যাপারে জীববিজ্ঞানের চিরায়ত ব্যাখ্যাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এই বলে যে, শুধু জেনেটিক প্রকারণ যৌনতার টিকে জন্য উপযুক্ত ব্যাখ্যা হতে পারে না। মায়নার্ড স্মিথের মত ইউনিভার্সিটি অব অ্যারিজোনার বিবর্তনীয় জীববিদ্যার অধ্যাপক রিচার্ড মিকন্ডও মনে করেন, শুধু জেনিটিক প্রকারণ দিয়ে সেক্সকে ব্যাখ্যা করার সনাতন প্রচেষ্টা সঠিক নয়[2]। তাহলে সেক্সের উদ্দেশ্য কি? হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অব সেক্স? সত্যি বলতে কি ব্যাপারটি এখনো জীববিজ্ঞানীদের কাছে ধাঁধা হয়েই রয়েছে, কিন্তু সেখানে যাবার আগে সেক্স বা যৌনতার অপচয়ী মনোবৃত্তির নমুনাটা আমরা আরেকবার দেখি, এবার একটু অন্যভাবে।

মানুষের কথাই ধরা যাক। একটি সুস্থ 'যৌনপ্রজ' দম্পতি তাদের দীর্ঘ জীবনে গড়ে প্রতি সপ্তাহে একবার করে তিরিশ- চল্লিশ বছর ধরে সঙ্গম করে থাকে। কিন্তু সে হিসেবে তাদের বাচ্চা কাচ্চার সংখ্যা থাকে নিতান্তই নগন্য - দুইটি কি তিনটি। উন্নত বিশ্বে এখন এমন দম্পতিও আছে যারা বাচ্চা কাচ্চা একেবারেই নেয় না। সে সব বহু দেশেই জন্মহার এখন পড়তির দিকে। বুঝলাম, আজকাল কৃত্রিম জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাচ্চা-কাচ্চার সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ বা একশ বছর আগের উদাহরণ দেখলেও দেখা যায় যে, কোন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ছাড়া ও কোন মানব দম্পতির খুব বেশী হলে ১২- ১৪ টা ছেলেমেয়ে হত। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার বড় হওয়ার আগেই বিভিন্ন রোগেশোকে মৃত্যুবরণ করতো। কাজেই যৌনতার 'একমাত্র' উদ্দেশ্য যদি কেবল পরবর্তী প্রজন্মে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে বলতেই হয় এই আনাড়ি পদ্ধতিটি নিসন্দেহে একটি 'অকর্মার ধাড়ি'। শুধু মানুষ নয়, হাতী, গরিলা, শুয়োর, ঘোড়াদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তারা যৌন সংসর্গে যে পরিমানে সময় ও শক্তি ব্যয়

[1] John Maynard Smith, *The Evolution of Sex*, Cambridge University Press; 1978।
[2] Richard E. Michod, *Eros and Evolution: A Natural Philosophy of Sex*, Perseus Books, 1996

করে সে তুলনায় ভবিষয়ত প্রজন্ম তৈরি করতে পারে একদমই কম। বিজ্ঞানীরা বলেন, সারা জীবনের নব্বইভাগ যৌনসংসর্গেই কোন ধরনের অযাচিত গর্ভধারণের ভয় থাকে না। আর সমকামিতার উদাহরণ হাজির করলে তো সেক্সের মূল উদ্দেশ্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। সেক্সের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি কেবল ভবিষ্যত প্রজন্ম টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'জিন সঞ্চালন' হয়ে থাকে, তবে সমকামীরা নিঃসন্দেহে "বায়োলজিকাল ডেড এন্ড"- এ। আর অনেক বিবর্তনবাদীরাই সেজন্য খুব যান্ত্রিকভাবে ডারউইনবাদকে সমকামিতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। আর এমন সমস্ত 'যুক্তি' উপস্থাপন করা শুরু করেন যখন মনে হয় তাদের জায়গা ওই ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের সাথে একই বিছানায়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই 'যান্ত্রিক' ডারউইনবাদীরা সেক্সুয়াল সিলেকশন বা যৌন-নির্বাচনের ধুঁয়া তুলে সমকামিতাকে অস্বীকার করেন, কিংবা বলার চেষ্টা করেন এরা প্রকৃতির এক ধরনের বিচ্যুতি (aberration)। ভাবখানা যেন, ওই দু'চারটা সমকামীদের নিয়ে অতটা চিন্তা আমাদের না করলেও চলবে!

কিন্তু সত্যই কি তাই? তারা সমকামীদের সংখ্যা 'দু-চারটি' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেও বাস্তবতা কিন্তু ভিন্ন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সের রপোর্ট অনুযায়ী প্রতি দশ জন ব্যক্তির একজন সমকামী[3]। অর্থাৎ, জনসংখ্যার শতকরা প্রায় দশভাগই ওই যান্ত্রিক ডারউইনবাদীদের আভিলাসে ছাই দিয়ে অর্থাৎ জীন সঞ্চালনের 'মহৎ' প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করে টিকে আছে। কিন্সের গবেষণা ছিল সেই চল্লিশের দশকে। সাম্প্রতিক কালে (১৯৯০) ম্যাকহুটার, স্টেফানি স্যান্ডার্স এবং জুন ম্যাকহোভারের গবেষনা থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে শতকরা প্রায় চোদ্দ ভাগের মত সমকামি রয়েছে[4]। ১৯৯৩ সালের 'জেনাস রিপোর্ট অন সেক্সুয়াল বিহেভিয়ার' থেকে জানা যায়, পুরুষদের মধ্যে প্রায় শতকরা নয় ভাগ এবং মহিলাদের মধ্যে শতকরা ৪ ভাগ সমকামি রয়েছে[5]। কাজেই সংখ্যা হিসেবে সমকামীদের সংখ্যাটা কিন্তু এ পৃথিবীতে খুব একটা কম নয়। সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইণ্ড-এর ২০০৬ এর একটি ইস্যুতে সমকামীদের সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ৩ থেকে ৭ ভাগ উল্লেখ করা হয়েছে[6]। কিন্তু এ কথা বলতেই হবে, পরিসংখ্যানগুলোর পরিসীমা একে অন্যের খুব কাছাকাছি (মোটামুটি

[3] Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , *Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male,* W. B. Saunders Company , 1953

[4] David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders and June Machover Reinisch, *Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation*, Oxford University Press, USA, 1990

[5] Samuel S. Janus and Cynthia L. Janus, *The Janus Report on Sexual Behavior*, Wiley, March 1994.

[6] Robert Epstein, *Do Gays Have a Choice? Science offers a clear and surprising answer to a controversial question*, Scientific American Mind, February 2006।

৫- ১৫ ভাগ) হলেও কোনটাই হয়ত প্রকৃত অবস্থা নির্দেশ করছে না। কারণ সামাজিক একটা চাপ সবসময়ই থেকে যায় সমকামিতাকে নিরুৎসাহিত করে বিষমকামিতাকে উৎসাহিত করার। রক্ষণশীল সমাজে এই চাপ আরো প্রবল। ফলে অনেক সময়ই দেখা যায় সমাজের চাপে একজন প্রকৃত সমকামি বিষমকামী হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বামী কিংবা বউ বাচ্চা নিয়ে সংসার করছেন। এদের বলা হয় নিভৃত সমকামী (closet gay)। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত মানবাধিকার কর্মীর কথা জানি যিনি নিভৃত সমকামী হয়ে তার স্ত্রীর সাথে বিবাহিত জীবন যাপন করছেন।

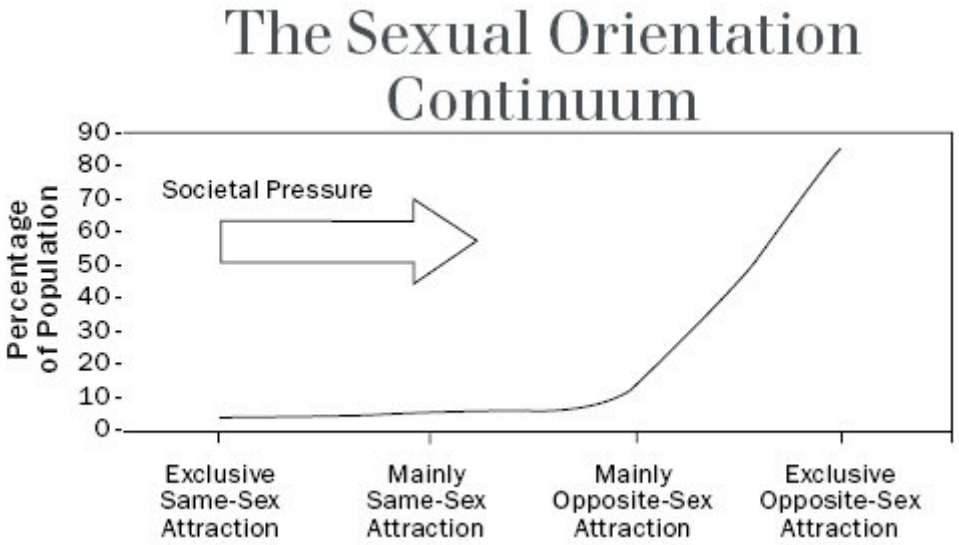

চিত্র: আমাদের সমাজে সবসময়ই একটা চাপ থাকে সমকামীদের নিরুৎসাহিত করে বিষমকামের দিকে ঠেলে দেওয়ার।

আরেকজন 'বিবাহিত সমকামীর' কথা পড়েছিলাম একটি কেস স্টাডিতে। উনি দিল্লিতে বসবাসরত দন্ত চিকিৎসক। নাম রমেশ মন্ডল। নিজে সমকামী। কিন্তু পারিবারিক চাপে পড়ে তাঁকে একসময় বিয়ে করতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর সাথে তার সম্পর্ক স্রেফ যান্ত্রিক। তিনি তার যৌনচাহিদা নিরসন করেন গোপনে তার এ সমকামী বন্ধুর সাথে। কখনো- সখনো জব্বলপুর, কোলাপুরে চলে যান। তার স্ত্রী আজও এ ব্যাপারটি জানেন না। সম্পূর্ন মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে রমেশের দাম্পত্য জীবন। আরেক সমকামি ভদ্রলোক নীতিন দেশাই স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যান মুম্বই- এর চৌপাট্টির সমুদ্র সৈকতে। কারণ সহজেই অনুমেয়।

অনেক পাঠক হয়ত পাকিস্তানী সমকামী কবি ইফতি নাসিমের[7] ব্যক্তিগত জীবনের সমপ্রেমের মর্মন্তুদ কাহিনী জানেন। কবি নাসিম ছোটবেলা থেকেই তার সমবয়সী একটি ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তারপর দুই কিশোর কৈশোরকাল অতিক্রম করে বড় হলো। পড়াশুনার পাঠ চুকিয়ে তারা তখন প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। তখন স্বাভাবিকভাবেই বাসা থেকে এল বিয়ের চাপ। এমন কি ইফতির বন্ধুটির বাসার লোকজন মেয়ে টেয়ে দেখে তার বিয়ে পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল। ইফতির বন্ধু সেদিন তার সমকামী মানসিকতার কথা বাসায় খুলে বলতে পারেন নি। আর তাছাড়া পাকিস্তানী গোড়া মুসলিম সমাজে বড় হবার কারনে কোরাণের সমাকামিদের প্রতি ঘৃণা- উদ্রেককারী আয়াতগুলোর কথাও তার ভালই জানা ছিলো। ফলে যা হবার তাই হল। বেশ ধূম ধাম করে বিয়ে হল ওই বন্ধুর। সে বিয়েতে ইফতিও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং হাজিরও ছিলেন। ফুল শয্যার রাতে বন্ধুর বাড়িতে ইফতি ছিলেন। যে মানুষটির সাথে তার এতদিনের প্রেমের সম্পর্ক, সে মানুষটি সমাজের চাপে পড়ে এক অচেনা নারীর বাহুলগ্ন হবেন, এ চিন্তা তাকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল - 'আজকে রাতে তুমি অন্যের হবে, ভাবতেই চোখ জলে ভিজে যায়'! সারা রাত তিনি ঘুমাতে পারলেন না। এ পাশ ও পাশ করে কাটালেন। শেষ রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা। হুড়মুড় করে বিছানায় উঠে বসলেন ইফতি। দরজা খুলে ইফতি দেখলেন- অসহায়ভাবে বাইরে তার বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেই নির্বাক।

হারুণ নামে (আসল নাম নয়) আমাদের খুব কাছের একজন মুক্তমনা সদস্য সমকামী। খুব ছোটবেলায় পাড়ার এক সমকামী হুজুরের পাল্লায় পড়েন। কিছুদিন পরে সে সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এলেও পরে কৈশোরোত্তীর্ণ যুবক বয়সে তার খুব কাছের এক বন্ধুর সাথে সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং সামাজিক আইন কানুনের কথা বিবেচনা করে তারা এক সাথে থাকতে পারেননি। সেই বন্ধু তারপর তার বোনকে বিয়ে করেন। বিয়ের কারণ হিসেবে বন্ধুটি হারুণকে বোঝান যে, এর ফলে তারা 'বৈধভাবেই' সম্পর্ক তৈরী করে বাসায় থাকতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই সম্পর্কও টেকেনি। বন্ধুটি তারপর থেকেই হয়ে ওঠেন চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ। হারুণ হয়ে ওঠেন প্রতিহিংসার প্রধাণতম টার্গেট। খুনের হুমকি, ধামকি সম্পত্তি দখল সহ নানা জিঘাংসার স্বীকার হন তিনি। শেষ পর্যন্ত দেশত্যাগ। আজকে তিনি ইউরোপের একটি দেশে বসবাস করছেন তার এক সমকামী সাথীর সাথে।

শুধু বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তানে কেন, খোদ আমেরিকাতেও একই অবস্থা। অনেক পাঠকই হয়ত ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মিল্ক' ছবিটি দেখেছেন। ছবিটি আমেরিকার প্রথম

[7] পাকিস্তানী কবি, নরমান সহ অন্যান্য কাব্যপুস্তক প্রনেতা। এই বইয়ের নবম অধ্যায়ে ইফতি নাসিমের কবিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া দেখুন, http://www.glhalloffame.org/index.pl?todo=view_item&item=91

নির্বাচিত সমকামী রাজনীতিবিদ হার্ভে মিল্কের (১৯৩০- ১৯৭৮) জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এ ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, কত প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে মিল্ককে সে সময় নির্বাচিত হতে হয়েছিলো; কিন্তু নির্বাচিত হতে গিয়ে তিনি আপোষ করেননি, সমকামিতাকে 'নিভৃত কক্ষে' আটকে রাখেননি, বরং মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে একে আন্দোলনের এক হাতিয়ারে পরিণত করেছেন[8]। 'মিল্ক' চরিত্রে অভিনয় করে শন পেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে অস্কার পেয়েছেন। সমাজে ইফিতি নাসিম বা মিল্কের মত লোকদের 'কামিং আউট অব ক্লোসেট' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

মানুষের কথা বাদ দেই, প্রানীজগতেও কিন্তু সমকামীদের সংখ্যা নেহাৎ মন্দ নয়। গবেষকরা অনেকদিন ধরেই এ নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রসঙ্গতঃ লু হুজি, কর্ণেল লক, জিউনার, জুরের, হাবাক, উইলিয়ামস, শের জং, জেন গুডোয়ল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ গবেষনার কথা উল্লেখ করা যায়[9]। এদের গবেষণার মধ্য দিয়ে উঠে আসতে থাকে প্রানীজগতের নানা অজানা তথ্য। আবার অন্যদিকে অ্যালেন, প্রেনটিস, অ্যালেন লিস, জেমসন, মারফি প্রমুখ বিজ্ঞানীরা প্রানীজগতের যৌনতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা চালিয়েছেন। তাদের গবেষনায় প্রানীজগতে সমকামিতার সুস্পষ্ট নিদর্শন ধরা পরে। সে নিদর্শনগুলোর নমুনা জানতে চাইলে পাঠকেরা জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিলের লেখা '*বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স : এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি*'[10] বইটি পড়ে দেখতে পারেন । বইটিতে ব্রুস ব্যাগমিল প্রকৃতিতে যে সমস্ত প্রজাতিতে সমকামিতা এবং রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব সনাক্ত করেছেন, সেগুলো নীচে দেওয়া হল :

সারণী ৪.১ *প্রকৃতিজগতের সমকামী এবং রূপান্তরকামী প্রজাতির আংশিক তালিকা*

Homosexual / Transgender Species		
1. Acanthocephalan Worms	161. Gorilla	322. Przewalski's Horse
2. Acorn Woodpecker	162. Grant's Gazelle	323. Pukeko
3. Adelie Penguin	163. Grape Berry Moth	324. Puku
4. African Buffalo	164. Grape Borer	325. Purple Swamphen
5. African Elephant	165. Gray-breasted Jay	326. Pygmy Chimpanzee
6. Agile Wallaby	166. Gray-capped Social Weaver	327. Queen Butterfly
7. Alfalfa Weevil	167. Gray-headed Flying Fox	328. Quokka
8. Amazon Molly	168. Gray Heron	329. Rabbit (Domestic)
9. Amazon River Dolphin		
10. American Bison		
11. Anna's Humminbird		

[8] হার্ভে মিল্ক সম্প্রতি (২০০৯ সালে) মরণোত্তর প্রেসিডেনশিয়াল মেডেল অব ফ্রিডমে ভূষিত হয়েছেন।
[9] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

[10] Bruce Bagemihl, *Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity*, Stonewall Inn Editions, 2000

12. Anole sp.
13. Aoudad
14. Aperea
15. Appalachian Woodland Salamander
16. Asiatic Elephant
17. Asiatic Mouflon
18. Atlantic Spotted Dolphin
19. Australian Parasitic Wasp sp.
20. Australian Sea Lion
21. Australian Shelduck
22. Aztec Parakeet
23. Bank Swallow
24. Barasingha
25. Barbary Sheep
26. Barn Owl
27. Bean Weevil sp.
28. Bedbug and other Bug spp.
29. Beluga
30. Bangalese Finch (Domestic)
31. Bezoar
32. Bharal
33. Bicolored Antbird
34. Bighorn Sheep
35. Black Bear
36. Black-billed Magpie
37. Blackbuck
38. Black-crowned Night Heron
39. Black-footed Rock Wallaby
40. Black-headed Gull
41. Black-rumped Flameback
42. Black-spotted Frog
43. Black Stilt
44. Blackstripe Topminnow
45. Black Swan
46. Black-tailed Deer
47. Black-winged Stilt
48. Blister Beetle spp.
49. Blowfly
50. Blue-backed Manakin
51. Blue-bellied Roller
52. Bluegill Sunfish
53. Blue Sheep
54. Blue Tit
55. Blue-winged Teal
56. Bonnet Macaque
169. Grayling
170. Gray Seal
171. Gray Squirrel
172. Gray Whale
173. Great Cormorant
174. Greater Bird of Paradise
175. Greater Rhea
176. Green Anole
177. Green Lacewing
178. Green Sandpiper
179. Greenshank
180. Green Swordtail
181. Greylag Goose
182. Griffon Vulture
183. Grizzly Bear
184. Guiana Leaffish
185. Guianan Cock-of-the-Rock
186. Guillemot
187. Guinea Pig (Domestic)
188. Hamadryas Baboon
189. Hammerhead
190. Hamster (Domestic)
191. Hanuman Lanur
192. Harbor Porpoise
193. Harbor Seal
194. Harvest Spider sp.
195. Hawaiin Orb-Weaver
196. Hen Flea
197. Herring Gull
198. Himalayan Tahr
199. Hoary-headed Grebe
200. Hoary Marmot
201. Hooded Warbler
202. Horse (Domestic)
203. House Fly
204. House
330. Raccoon Dog
331. Raggiana's Bird of Paradise
332. Rat (Domestic)
333. Raven
334. Razorbill
335. Red Ant sp.
336. Red-backed Shrike
337. Red Bishop Bird
338. Red Deer
339. Red Diamond Rattlesnake
340. Red-faced Lovebird
341. Red Flour Beetle
342. Red Fox
343. Red Kangaroo
344. Red-necked Wallaby
345. Redshank
346. Red-shouldered Widowbird
347. Red Squirrel
348. Red-tailed Skink
349. Reeve's Muntjac
350. Regent Bowerbird
351. Reindeer
352. Reindeer Warble Fly
353. Rhesus Macaque
354. Right Whale
355. Ring-billed Gull
356. Ring Dove
357. Rock Cavy
358. Rock Dove
359. Rodrigues Fruit Bat
360. Roe Deer
361. Roseate Cockatoo
362. Roseate Tern
363. Rosechafer
364. Rose-ringed Parakeet
365. Rove Beetle

57. Bonobo
58. Boto
59. Bottlenose Dolphin
60. Bowhead Whale
61. Box Crab
62. Bridled Dolphin
63. Broad-headed Skink
64. Broadwinged Damselfly sp.
65. Brown Bear
66. Brown Capuchin
67. Brown-headed Cowbird
68. Brown Long-eared Bat
69. Brown Rat
70. Budgeriger (Domestic)
71. Buff-breasted Sandpiper
72. Rush Dog
73. Cabbage (Small) White
74. Calfbird
75. California Gull
76. Canada Goose
77. Canary-winged Parakeet
78. Caribou
79. Caspian Tern
80. Cat (Domestic)
81. Cattle (Domestic)
82. Cattle Egret
83. Chaffinch
84. Char
85. Checkered Whiptail Lizard
86. Checkerspot Butterfly
87. Cheetah
88. Chicken (Domestic)
89. Chihuahuan Spotted Whiptail Lizard
90. Chiloe Wigeon
91. Cliff Swallow
92. Clubtail Dragonfly spp.
93. Cockroach spp.
94. Collared Peccary
95. Cammerson's Dolphin
96. Common Ameiva
97. Common Brushtail Possum
98. Common Chimpanzee
Sparrow
205. Houting Whitefish
206. Humboldt Penguin
207. Ichneumon Wasp sp.
208. Incirrate Octopus spp.
209. Inagua Curlytail Lizard
210. Indian Fruit Bat
211. Indian Mantjac
212. Indian Rhinoceros
213. Ivory Gull
214. Jackdaw
215. Jamaican Giant Anole
216. Japanese Scarab Beetle
217. Japanese Macaque
218. Javelina
219. Jewel Fish
220. Jumping Spider sp.
221. Kangaroo Rat
222. Kestrel
223. Killer Whale
224. King Penquin
225. Kittiwake
226. Koala
227. Kob
228. Larch Bud Moth
229. Laredo Striped Whiptail Lizard
230. Larga Seal
231. Largehead Anole
232. Large Milkweed Bug
233. Large White
234. Laughing Gull
235. Laysan Albatross
236. Least Chipmunk
237. Least Darter
238. Lechwe
239. Lesser Bushbaby
240. Lesser
spp.
366. Ruff
367. Ruffed Grouse
368. Rufous Bettong
369. Rufous-naped Tamarin
370. Rufous Rat Kangaroo
371. Saddle-back Tamarin
372. Sage Grouse
373. Salmon spp.
374. San Blas Jay
375. Sand Martin
376. Satin Bowerbird
377. Savanna Baboon
378. Scarab Beetle, Melolonthine
379. Scarlet Ibis
380. Scottish Crossbill
381. Screwworm Fly
382. Sea Otter
383. Senegal Parrot
384. Serotine Bat
385. Sharp-tailed Sparrow
386. Sheep (Domestic)
387. Siamang
388. Side-blotched Lizard
389. Sika Deer
390. Silkworm Moth
391. Silver Gull
392. Silvery Grebe
393. Slender Tree Shrew
394. Snow Goose
395. Sociable Weaver
396. Sooty Mangabey
397. Southeastern Blueberry Bee
398. Southern Green Stink Bug
399. Southern

99. Common Dolphin
100. Common Garter Snake
101. Common Gull
102. Common Marmoset
103. Common Murre
104. Common Pipistrelle
105. Common Racoon
106. Common Shelduck
107. Common Skimmer Dragonfly spp.
108. Common Tree Shrew
109. Cotton-top Tamarin
110. Crab-eating Macaque
111. Crane spp.
112. Creeping Water Bug sp.
113. Crested Black Macaque
114. Cuban Green Anole
115. Cui
116. Dall's Sheep
117. Daubenton's Bat
118. Desert Grassland Whiptail Lizard
119. Desert Tortoise
120. Digger Bee
121. Dog (Domestic)
122. Doria's Tree Kangaroo
123. Dragonfly spp.
124. Dugong
125. Dusky Moorhen
126. Dwarf Cavy
127. Dwarf Mongoose
128. Eastern Bluebird
Flamingo
241. Lesser Scaup Duck
242. Lion
243. Lion-tailed Macaque
244. Lion Tamarin
245. Little Blue Heron
246. Little Brown Bat
247. Little Egret
248. Livingstone's Fruit Bat
249. Long-eared Hedgehog
250. Long-footed Tree Shrew
251. Long-legged Fly spp.
252. Long-tailed Hermit Hummingbird
253. Mallard Duck
254. Markhor
255. Marten
256. Masked Lovebird
257. Matschie's Tree Kangaroo
258. Mazarine Blue
259. Mealy Amazon Parrot
260. Mediterranean Fruit Fly
261. Mew Gull
262. Mexican Jay
263. Mexican White
264. Midge sp.
265. Migratory Locust
266. Mite sp.
267. Moco
268. Mohol Galago
269. Monarch Butterfly
270. Moor Macaque
271. Moose
272. Mountain Dusky Salamander
273. Mountain Goat
274. Mountain Tree Shrew
275. Mountain Zebra
276. Mourning
Masked Chafer
400. Southern One-Year Canegrub
401. Southern Platyfish
402. Speckled Rattlesnake
403. Sperm Whale
404. Spinifex Hopping Mouse
405. Spinner Dolphin
406. Spotted Hyena
407. Spotted Seal
408. Spreadwinged Damselfly spp.
409. Spruce Budworm Moth
410. Squirrel Monkey
411. Stable Fly sp.
412. Stag Beetle spp.
413. Steller's Sea Eagle
414. Striped Dolphin
415. Stuart's Marsupial Mouse
416. Stumptail Macaque
417. Superb Lyrebird
418. Swallow-tailed Manakin
419. Swamp Deer
420. Swamp Wallaby
421. Takhi
422. Talapoin
423. Tammar Wallaby
424. Tasmanian Devil
425. Tasmanian Native Hen
426. Tasmanian Rat Kangaroo
427. Tengger Desert Toad
428. Ten-spined Stickleback
429. Thinhorn Sheep

129. Eastern Cottontail Rabbit
130. Eastern Giant Ichneumon
131. Eastern Gray Kangaroo
132. Egyptian Goose
133. Elegant Parrot
134. Elk
135. Emu
136. Eucalyptus Longhorned Borer
137. Euro
138. European Bison
139. European Bitterling
140. European Jay
141. European Shag
142. Fallow Deer
143. False Killer Whale
144. Fat-tailed Dunnart
145. Fence Lizard
146. Field Cricket sp.
147. Fin Whale
148. Five-lined Skink
149. Flamingo
150. Fruit Fly spp.
151. Galah
152. Gelada Baboon
153. Gentoo Penguin
154. Giraffe
155. Glasswing Butterfly
156. Goat (Domestic)
157. Golden Bishop Bird
158. Golden Monkey
159. Golden Plover
160. Gopher (Pine) Snake
Gecko
277. Mouse (Domestic)
278. Mouthbreeding Fish sp.
279. Mule Deer
280. Mustached Tamarin
281. Musk Duck
282. Musk-ox
283. Mute Swan
284. Narrow-winged Damselfly spp.
285. Natterer's Bat
286. New Zealand Sea Lion
287. Nilgiri Langur
288. Noctule
289. North American Porcupine
290. Northern Elephant Seal
291. Northern Fur Seal
292. Northern Quoll
293. Ocellated Antbird
294. Ocher-bellied Flycatcher
295. Olympic Marmot
296. Orange Bishop Bird
297. Orange-footed Parakeet
298. Orangutan
299. Orca
300. Ornate Lorikeet
301. Ostrich
302. Oystercatcher
303. Pacific Striped Dolphin
304. Parsnip Leaf Miner
305. Patas Monkey
306. Peach-faced Lovebird
307. Pere David's Deer
308. Pied Flycatcher
309. Pied Kingfisher
310. Pig (Domestic)
430. Thomson's Gazelle
431. Three-spined Stickleback
432. Tonkean Macaque
433. Tree Swallow
434. Trumpeter Swan
435. Tsetse Fly
436. Tucuxi
437. Turkey (Domestic)
438. Urial
439. Vampire Bat
440. Verreaux's Sifaka
441. Vervet
442. Victoria's Riflebird
443. Vicuna
444. Walrus
445. Wapiti
446. Warthog
447. Water Boatman Bug
448. Waterbuck
449. Water Buffalo
450. Water Moccasin
451. Water Strider spp.
452. Wattled Starling
453. Weeper Capuchin
454. Western Gray Kangaroo
455. Western Gull
456. Western Rattlesnake
457. West Indian Manatee
458. Western Banded Gecko
459. Whiptail Lizard spp.
460. Whiptail Wallaby
461. White-faced Capuchin
462. White-fronted Amazon Parrot
463. White-fronted Capuchin

	311. Pigeon (Domestic) 312. Pig-tailed Macaque 313. Plains Zebra 314. Plateau Striped Whiptail Lizard 315. Polar Bear 316. Pomace Fly 317. Powerful Owl 318. Prea 319. Pretty-faced Wallaby 320. Proboscis Monkey 321. Pronghorn	464. White-handed Gibbon 465. White-lipped Peccary 466. White Stork 467. White-tailed Deer 468. Wild Cavy 469. Wild Goat 470. Wisent 471. Wolf 472. Wood Duck 473. Wood Turtle 474. Yellow-backed (Chattering) Lorikeet 475. Yello-footed Rock Wallaby 476. Yellow-rumped Cacique 477. Yellow-toothed Cavy 478. Zebra Finch (Domestic)

ভেড়ার জীবন যাত্রা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা সমকামী প্রবণতার প্রচুর উদাহরণ পেয়েছেন। তবে মেষপালকেরা ভেড়ার এই প্রবণতার কথা অনেক আগে থেকেই জানতেন। এই ধরনের ভেড়ার পাল সবসময়ই মেষপালকদের জন্য হতাশা। কারণ এরা বংশবিস্তারে কোন সাহায্য করে না। তারা প্রথম থেকেই ভেড়ীদের প্রতি থাকে একেবারেই অনাগ্রহী। এদের আগ্রহের পুরোটা জুড়েই থাকে আরেকটি পুরুষ ভেড়া বা মেষ। অরেগন হেলথ এন্ড সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চার্লস রসেলির মতে শতকরা ৮ ভাগ ভেড়া এরকম সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে[11]। এই ধরণের সমকামী ভেড়া সঙ্গমের সময় আরেকটি পুরুষ ভেড়ার দিকে অগ্রসর হয় তাদের আদর সোহাগ জানাতে থাকে আর যৌনাঙ্গ শুঁকতে থাকে। অবশেষে পেছন দিক থেকে ভেড়ার উপর আরোহন করে ভেড়ার উলের উপর বীর্জ নিক্ষেপ করে (এরা কখনোই পায়ুকামে প্রবৃত্ত হয় না)। চার্লস রসেলি এ সমস্ত ভেড়ার মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে দেখান যে এদের মস্তিস্কের কিছু অংশের আকার 'স্বাভাবিক' ভেড়াদের থেকে অনেকাংশেই ভিন্ন। তিনি 'সেক্সুয়ালি ডাইমরফিক নিউক্লিয়াস' বলে মাথার হাইপোথ্যালমাসের একটা অংশে উল্লেখ করার মত পার্থক্য

[11] John Schwartz, Of Gay Sheep, Modern Science and Bad Publicity, NY Times, January 25, 2007

পান[12]। একই ধরনের পার্থক্য আরেক গবেষক সিমন লেভি লক্ষ্য করেছেন সমকামী মানুষের মস্তিস্কেও (সিমন লেভির গবেষণা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ে) ।

ভেড়া ছাড়াও সমকামী আচরণ লক্ষ্য করা গেছে বিভিন্ন স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রেও। এদের মধ্যে হাতি, সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না, ক্যাঙ্গারু, হরিণ, জিরাফ, আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকার মোষ, জেব্রা উল্লেখযোগ্য। পাখিদের মধ্যে পেঙ্গুইন, ধুসর পাতিহাঁস, কানাডা পাতিহাঁস, কালো রজহাঁস, বরফী পাতিহাঁস, মিউট রাজহাঁস, শকুন সহ অনেক প্রাণীর মধ্যে সমকামিতার সুস্পষ্ট উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। সরীসৃপের মধ্যে সমকামিতার আলামত আছে কমন অ্যামিভা, অ্যানোল, গিরগিটি, স্কিনক, গেকো মাউরিং, কচ্ছপ, রাটেল স্নেক প্রভৃতিতে। সমকামিতার অস্তিত্ব আছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাঙ, স্যালাম্যান্ডারের মত উভচর এবং বিভিন্ন মাছেও।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন প্রাইমেট বর্গের মধ্যে সাধারণ শিম্পাঞ্জিদের মধ্যে প্রজননহীন যৌনতা (non-reproductive sex) খুবই প্রকট। মানুষের মতই তারা কেবল 'জিন সঞ্চালনের' জন্য সঙ্গম করে না, সঙ্গম করে আনন্দের জন্যও। কাজেই তাদের মধ্যে মুখ- মৈথুন, পায়ু মৈথুন থেকে শুরু করে চুম্বন, দংশন সব কিছুই প্রবলভাবে লক্ষ্যনীয়। তারা খুব সচেতনভাবেই সমকাম, উভকাম এবং বিষমকামে লিপ্ত হয়। শিম্পাঞ্জীদের আরেকটি প্রজাতি বনোবো শিম্পাঞ্জী (আগেকার প্রচলিত নাম ছিলো পিগমী শিম্পাঞ্জী)দের মধ্যে সমকামী প্রবণতা এতই বেশি যে, ব্যাগমিল বলেন, এই প্রজাতিটির ক্ষেত্রে 'সমকামী যৌনসংসর্গ, বিষমকামিতার মতই স্বাভাবিক। একেকটি গোত্রে এমনকি শতকরা ৩০ ভাগ সদস্য সমকামিতা এবং উভকামিতার সাথে যুক্ত থাকে এবং দেখা গেছে ৭৫ ভাগ যৌনসংসর্গই প্রজননহীন। এদের মধ্যে প্রবলভাবে আছে নারী সমকামিতাও। এমনকি শিশুদেরও তারা রেহাই দেয় না[13]। কেউ যদি এ ধরণের সমকামে অনীহা প্রকাশ করে তবে, তাহলে বনোবো সমাজে সে 'অচ্ছুৎ' বলে পরিগণিত হয়, অন্যান্য সদস্যরা তাকে এড়িয়ে চলে[14]। বিভিন্ন রকমের সমকামী এবং উভকামী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে গরিলা, ওরাং- ওটান, গিবন, সিয়ামাং, লঙ্গুর হনুমান, নীলগিরি লঙ্গুর, স্বর্ণ হনুমান, প্রবোসিক্স মাঙ্কি, সাভানা বেবুন ইত্যাদি প্রাইমেটদের মধ্যেও।

---

[12] Roselli C, Stadelman H, Reeve R, Bishop C, Stormshak F (2007). "The ovine sexually dimorphic nucleus of the medial preoptic area is organized prenatally by testosterone". Endocrinology 148 (9): 4450–4457; এছাড়া দেখুন, Faye Flam, The Score: How The Quest For Sex Has Shaped The Modern Man, Avery, 2008

[13] Frans de Waal, author of Bonobo: The Forgotten Ape, calls the bonobo species a "make love, not war" primate.

[14] Faye Flam, পূর্বোক্ত

১৯৭২ সালে লিন্ডা উলফি নামের এর তরুন গবেষক ল্যাবরেটরীতে জাপানী ম্যাকুয়ি নামের একধরণের প্রাইমেট নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন, তাদের মধ্যে নারী সমকামিতার ব্যাপারটি প্রকটভাবে দৃশ্যমান। লিন্ডা ভাবলেন নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীর বন্দি পরিবেশে থাকার ফলে তাদের যৌনতার পরিবর্তন ঘটেছে (জেলখানায় থাকার ফলে আসামীদের মধ্যে যে ধরণের সমকামী মনোবৃত্তি জেগে উঠে অনেকটা সেরকম)। তিনি আসল ব্যাপারটি বুঝতে জাপানে গিয়ে বন্য পরিবেশে ম্যাকুয়ি পর্যবেক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। গিয়ে তিনি কি দেখলেন? হ্যা, যা ভেবেছেন সেটাই - সেখানেও নারী সমকামিতা দেদারসে রাজত্ব করে চলেছে। শুধু লিন্ডা উলফি নয় পল ভ্যাসি নামে আরেক গবেষকও জাপানী ম্যাকুয়িদের উপর দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। তিনিও ম্যাকুয়িদের মধ্যকার সমকামী প্রবণতা অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছেন এবং বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। অনেক গবেষক আগে ভেবেছিলেন, ম্যাকুয়ি সমাজে নারীতে নারীতে প্রেম আসলে পুরুষদের আকর্ষণের জন্য। নিশ্চয়ই চোখের সামনে এই 'লেসবিয়ন পর্ণ' দেখে পুরুষ ম্যাকুয়িরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং নারী ম্যাকুয়িদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। কিন্তু পল ভ্যাসি তার গবেষণায় পরিস্কার ভাবেই দেখালেন নারী ম্যাকুয়িরা যখন সমকামে মত্ত থাকে তখন তারা কোন পুরুষ ম্যাকুয়ির প্রতি কোন রকম আগ্রহই দেখায় না। তাদের জন্য সমকামিতার ব্যাপারটি 'হট বাথ'[15] নেওয়ার মতন কেবলই আনন্দের।

[15] হট বাথের ব্যাপারটি কিন্তু উপমা বা রূপক নয়। এই ম্যাকুয়িগুলো উষ্ণ প্রস্রবণে গা ডুবিয়ে আরাম করতে বড়ই পছন্দ করে।

চিত্র: বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামি প্রবণতা খুবই বেশি। বিজ্ঞানীরা এরকম ৪৫০টিরও বেশি প্রজাতিতে সমকামিতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন।

যৌনতার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধির ব্যাপারটি যেহেতু বিবর্তনের মূল চালিকা শক্তি, সেহেতু বহু বিজ্ঞানীই প্রানীজগতের মাঝে বিদ্যমান সমকামিতাকে প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেননি। তারা যে প্রকৃতিতে সমকামিতা দেখেননি তা নয়, অনেকবারই দেখেছেন - কিন্তু অবধারিতভাবে ভেবে নিয়েছিলেন এটি বিবর্তনের বিচ্যুতি, এ নিয়ে গবেষণার কোন দরকার নেই। যেমন, ভ্যালেরিয়াস গিস্ট (Valerius Geist) নামের এক বিজ্ঞানী ক্যানাডিয়ান রকি পর্বতমালায় পাহাড়ী মেষদের মধ্যকার সমকামিতা পর্যবেক্ষণ করেও সেটা গুরুত্ব দিয়ে গবেষণায় লিপিবদ্ধ করেননি। আজ তিনি সেই 'ব্যর্থতার' জন্য প্রকাশ্যেই দুঃখ প্রকাশ করেন। আসলে কিন্তু ব্রুস ব্যাগমিলের 'বায়োলজিকাল এক্সুবেরেন্স' বইটি প্রকাশিত হবার পর বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা অনেকটাই বদলে গেছে। তারা এখন সমকামিতাকে গুরুত্ব দিয়েই জীববিজ্ঞানে গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেন। ব্রুস ব্যাগমিলের গবেষনার পর অন্যান্য গবেষকেরাও গবেষণা চালিয়ে গেছেন বিষয়টি নিয়ে। বিজ্ঞানীরা এখন মনে করেন, পৃথিবীতে এমন কোন প্রজাতি নেই যেখানে

সমকামিতা দেখা যায় না। এ প্রসংগে জীববিজ্ঞানী পিটার বকম্যানের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য [16] -

> "No species has been found in which homosexual behaviour has not been shown to exist, with the exception of species that never have sex at all, such as sea urchins and aphids. Moreover, a part of the animal kingdom is hermaphroditic, truly bisexual. For them, homosexuality is not an issue."

২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা প্রানীজগতে ১৫০০'রও বেশী প্রজাতিতে সমকামিতার সন্ধান পেয়েছেন[17]। আর মেরুদন্ডী প্রাণীর তিনশ'রও বেশী প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব খুব ভালভাবেই নথিবদ্ধ[18]। সংখ্যাগুলো কিন্তু প্রতিদিনই বাড়ছে [19]।

ন্যাশনাল জিওগ্রাগিক চ্যানেলে সম্প্রতি 'Out in Nature: Homosexual Behavior in the Animal Kingdom' নামের একটি ডকুমেন্ট্রিতে প্রানীজগতের অসংখ্য সমকামিতার উদাহরণ তুলে ধরা হয়[20]। ব্রুস ব্যাগমিল এবং জোয়ান রাফগার্ডেনের কাজের উপর ভিত্তি করে অসলোর ন্যাচারাল হিস্ট্রি যাদুঘরে 'এগেইনস্ট নেচার?' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রদর্শনীটি ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়ে আগাস্টের ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলে। এতে জীবজগতের সমকামিতা, উভকামিতা সহ প্রকৃতির নানা ধরণের বৈচিত্রময় উদাহরণ হাজির করা হয়েছিলো। প্রদর্শনীটি সাড়া বছর জুড়ে দেশ বিদেশের অসংখ্য দর্শকের আগ্রহ এবং মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়[21]।

---

[16] a b c News-medical.net (2006)
[17] 1500 animal species practice homosexuality, www.news-medical.net/news/2006/10/23/20718.aspx
[18] Joan Roughgarden, The Genial Gene: Deconstructing Darwinian Selfishness, University of California Press, 2009
[19] এই বইয়ের পরিশিষ্টে উইকিপেডিয়া থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত দেয়া তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে।
[20] ইউটিউবে পুরো ফিল্মটি ছয় পর্বে রাখা আছে। http://www.youtube.com/watch?v=LFeXwKnCUNI
[21] Oslo gay animal show draws crowds, BBC News, Thursday, 19 October 2006.

চিত্রঃ নরওয়ের অসলো ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউসিয়ামে 'এগেইনস্ট নেচার?' নামে প্রদর্শনীটি দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে।

এত কিছুর পরও সমকামিতার পুরো ব্যাপারটিকে 'প্রকৃতিক' বলে মেনে নিতে অনেকেরই প্রবল অনীহা আছে। প্রানীজগতের অসংখ্য উদাহরণ হাজির করা হলেও মানুষকে এগুলো থেকে আলাদা রাখতেই পছন্দ করেন অনেকেই। কিন্তু যতই আলাদা করে রাখি না কেন, আমরা 'সৃষ্টির সেরা জীব' বলে কথিত গর্বিত মানুষেরাও কিন্তু ঘুরে ফিরে সেই প্রকৃতিরই (আরো ভালভাবে বললে প্রাইমেটদের) অংশ। ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবিন ডানবার এপ্রসঙ্গে বলেন -

> সব কথার শেষ কথা হল, অন্যান্য প্রাইমেটদের মধ্যে বিশেষতঃ এপদের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে, এর একটা বিবর্তনীয় ধারাবাহিকতা মানুষের মধ্যেও থাকবে ভেবে নেওয়াটা হয়তো অযৌক্তিক হবে না।

আমরা বনোবো শিম্পাঞ্জী কিংবা জাপানী ম্যাকাকুয়ি প্রজাতিতে সমকামিতার প্রকাশ দেখেছি। বিবর্তনের চোখ দিয়ে দেখতে শুরু করলে মানুষের অবস্থানও কিন্তু হবে এদের খুব কাছেপিঠেই। তাহলে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সমকামিতার কি ব্যাখ্যা? ওয়েল - হয়ত আসলে কোন গূঢ় কারণ নেই। ম্যাকুয়ি প্রাইমেটদের কাছে ব্যাপারটা যেমন 'স্রেফ

আনন্দের'[22] , মানুষদের মধ্যেও তা যে সেরকম কিছু নয়, তা কে বলবে? আর আনন্দের ব্যাপারটা অনেকাংশেই মুখ্য বলেই মানব সমাজেও প্রজননহীন যৌনতা খুব ভালভাবেই দৃশ্যমান[23]। অবাঞ্ছিত গর্ভকে দূরে রাখতে মানুষ জন্মনিয়ন্ত্রণেরও কৃত্রিম নানা পন্থা আবিস্কার করে নিয়েছে, কিন্তু যৌনতার আনন্দ উপভোগ করাকে কখনোই বাদ দেয়নি। সমকামিতা হয়ত কারো কারো মধ্যে সেই আনন্দ প্রকাশ এবং উদযাপনেরই একটি উদগ্র রূপ বই কিছু নয়। কিন্তু তারপরেও আমাদের ডারউইনীয় পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করতে হবে যে, এই হারে প্রজননহীন যৌনতা সম্পন্ন সমকামীরা পৃথিবীতে টিকে থাকল কি করে।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব কি সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে?

ডারউইনীয় বিবর্তনের দিক থেকে চিন্তা করলে সমকামিতার ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানীদের জন্য সব সময়ই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। কারণ 'ওটা বায়োলজিকাল ডেড এন্ড' - অন্ততঃ এভাবেই ভাবা হত কিছুদিন আগেও। বিবর্তনের কথা ভাবলে প্রথমেই প্রজননের মাধ্যমে বংশ বিস্তারের কথাটিই মাথায় সবার আগে চলে আসে। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে সমকামিতার লক্ষ্য যে বংশবিস্তার নয় - তা যে কেউ বুঝবে। তাহলে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে সমকামিতার উদ্দেশ্য কি? আগে এমনকি জীববিজ্ঞানীদের মধ্যেও সমকামিতাকে ঢালাওভাবে ' অস্বাভাবিকতা' কিংবা ' ব্যতিক্রম' ভেবে নেওয়াটাই ছিলো স্বাভাবিক, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই ধ্যান ধারনা অনেকটা বদলেছে।

প্রথম কথা হচ্ছে, সমকামিতার ব্যাপারটি কিন্তু নিখাঁদ বাস্তবতা। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে নয়, পুরো প্রানীজগতের ক্ষেত্রেই। জীববিজ্ঞানী ব্রুস ব্যাগমিল তার 'বায়োলজিকাল এক্সুবারেন্স : এনিমেল হোমোসেক্সুয়ালিটি এন্ড ন্যাচারাল ডাইভার্সিটি' বইয়ে প্রায় পাঁচশ প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্বের উদাহরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। সামগ্রিকভাবে জীবজগতে ১৫০০ রও বেশী প্রজাতিতে সমকামিতার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। মানুষের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ থেকে ১২ ভাগ সমকামিতার সাথে যুক্ত বলে পরিসংখ্যানে পাওয়া গেছে। কাজেই সমকামিতার এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করার চেষ্টা বোকামি। এখন মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন হল, সমকামিতাকে ব্যাখ্যা করার সঠিক বৈজ্ঞানিক মডেল জীববিজ্ঞানে আছে কিনা, নাকি কেবল 'সমাকামিতা অস্বাভাবিক' কিংবা 'ব্যতিক্রম' ইত্যাদি বলেই

[22] According to Paul Vasey, " Japanese macaques 're engaging in the behavior because it's gratifying sexually or it's sexually pleasurable," he says. "They just like it. It doesn't have any sort of adaptive payoff".
Matthew Grober, biology professor at Georgia State University, agrees, saying, "If [sex] wasn't fun, we wouldn't have any kids around. So I think that maybe Japanese macaques have taken the fun aspect of sex and really run with it."

[23] Jared Diamond, Why Is Sex Fun?: The Evolution Of Human Sexuality, Basic Books, 1998

ছেড়ে দেয়া হবে? এ প্রসঙ্গে জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক জোয়ান রাফগার্ডেনের উক্তিটি খুবই প্রাসঙ্গিক -

> 'My discipline teaches that homosexuality is some sort of anomaly. But if the purpose of sexual contact is just reproduction, then why do all these gay people exist? A lot of biologists assume that they are somehow defective, that some development error or environment influence has misdirected their sexual orientation If so, gay and lesbian people are mistake that should have been corrected a long time ago (thru Natural selection), but this hasn't happened. That's when I had my epiphany. **When a scientific theory says something wrong with so many people, perhaps the theory is wrong, not the people**'.

সমকামিতাকে যদি বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তবে আমাদের বের করতে হবে - ডারউইনীয় দৃষ্টিকোন থেকে এর উপযোগিতা কি। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে কঠিন। তবে কঠিন বলে কেউ হাত- পা গুটিয়ে বসে নেই। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন প্রতিদিনই। কিছু যোগসুত্র পাওয়া গেছে প্রাণী জগতে 'স্টেরাইল ওয়ার্কার' বা 'বন্ধ্যা সৈন্যের' - এর উদাহরণ থেকে। পিঁপড়ে, মৌমাছি, উই পোকা কিংবা বোলতার মত প্রজাতিতে এই ধরণের 'বন্ধ্যা সৈন্যের' উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। এরা বংশবৃদ্ধিতে কোন ভুমিকা রাখে না। কিন্তু নিজেদের গোত্রকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে জনপুঞ্জ টিকিয়ে রাখে। মানুষের জন্যও কি এটা খাটে? বিবর্তনীয় মনোবিদ্যার আলোকে একটু চিন্তা করা যাক। এমন কি হতে পারে যে, সমকামী পুরুষেরা আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই আদিম শিকারী- সংগ্রাহক সমাজে (hunter gatherer societies) বাচ্চা লালন পালনে কোন বিশেষ ভুমিকা রেখেছিলো? নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে যখন একাধিক পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে গোত্রের দায়িত্ব নিতো আর শিকারের সন্ধান করত, সেই গোত্র হয়ত অনেক বেশী খাবারের যোগান পেত, কিংবা হয়ত বহিঃশত্রুর হাত থেকেও রক্ষা পেত অন্যদের চেয়ে বেশী। ফলে টিকে থাকার প্রেরণাতেই হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষে পুরুষে সম্পর্ক তৈরী হয়েছিলো –যা গোত্রে এনে দিয়েছিলো বাড়তি নিরাপত্তা। কিংবা হয়ত এমনও হতে পারে - যখন শক্তিশালী পুরুষ শিকারে যেত, হয়ত সেই গোত্রের কোন 'গে চাচা' রক্ষা করার দায়িত্ব নিত ছোট ছোট ছেলেপিলেদের। আর পুরুষটিও শিকারে বের হয়ে স্ত্রীর 'পরকীয়া'র আশঙ্কায় ভাবিত থাকতো না! ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায়, বহু রাজা বাদশাহরা তাদের হারেম সুরক্ষিত রাখতে 'খোঁজা প্রহরী'দের নিয়োগ দিতো। আরো সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমে মেয়েরা অফিসে সমকামী পুরুষদের সাথে কাজ করতে অনেক নিরাপত্তা অনুভব করে। এটার কারণও অবোধ্য নয়। হয়ত জিন সঞ্চালন ছাড়াও অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আমাদের প্রজাতিটিকে টিকেয়ে রাখতে সমকামী সদস্যদের একটা ভূমিকা ছিলো। সেজন্য এডয়ার্ড

ও উইলসন 'কিন সিলেকশন'- এর মাধ্যমে হোমোসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন সেই ১৯৭৮ সালেই[24]।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক চিন্তা করা যেতে পারে। সমকামী প্রবৃত্তিটি হয়ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপজাত বা সাইড ইফেক্ট। বিবর্তনের অনেক কিছুর কথাই আমরা জানি যেগুলো কোন বাড়তি উপযোগিতা তৈরি করে না। কিন্তু এগুলো উৎপন্ন হয়েছে বিবর্তনের উপজাত হিসবে। এই বৈশিষ্টগুলো যদি টিকে থাকার ক্ষেত্রে বাড়তি কোন অসুবিধা তৈরি না করে তাহলে তারা উপজাত হিসেবে রয়ে যেতে পারে বংশ পরম্পরায়। বিজ্ঞানী স্টিফেন যে গুল্ড উপজাতের ব্যাপারটা বোঝাতে আমাদের বাড়ির উদাহরণ হাজির করতেন। যে কোন বড় বাড়ি কিংবা ইমারতের দিকে দেখলে দেখা যাবে – এর ধনুকাকৃতির দু'টি খিলানের মাঝে স্থান করে নিয়েছে ইংরেজি 'ভি' আকৃতির স্প্যান্ড্রেল বা মাঝখানের একটা খোলা জায়গা। বাড়ীর ইমারত বানাতে খিলান থাকা অত্যাবশক, কিন্তু খিলান বানাতে গেলে বাড়তি উপজাত হিসবে স্প্যান্ড্রেল এমনিতেই তৈরী হয়ে যায়, যা ইমারতটির ভিত্তির জন্য অত্যাবশকীয় কোন কিছু হয়ত নয়, কিন্তু এটি এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আমাদের শরীরের হাড্ডির সাদা রঙের কথা ধরা যেতে পারে। এই সাদা রঙ বিবর্তনে কোন বাড়তি উপযোগিতা দেয় না। এই সাদা রঙ তৈরি হয়েছে হাড়ে ক্যালসিয়াম থাকার উপজাত হিসেবে। তেমনি কারো কারো চোখের নীল কিংবা বাদামী রঙও হয়ত কোন বাড়তি উপযোগিতা দেয়া না - এটা প্রকৃতিতে আছে বিবর্তনের সাইড ইফেক্ট হিসবে। সমাকামিতাও বিবর্তনের সেরকম কোন উপজাত হতে পারে[25]।

ইতালীর একটি সমীক্ষায় (২০০৪) দেখা গেছে, যে পরিবারে সমকামী পুরুষ আছে সে সমস্ত পরিবারে মেয়েদের উর্বরতা (fertility) বিষমকামী পরিবারের চেয়ে বেশি থাকে । আন্দ্রিয়া ক্যাম্পেরিও- সিয়ানির ওই গবেষণা[26] থেকে জানা যায়, বিষমকামী পরিবারে যেখানে গড় সন্তান সন্ততির সংখ্যা ২. ৩ সেখানে গে সন্তানবিশিষ্ট পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ২. ৭। তার মানে যে জেনেটিক প্রভাব মেয়েদের উর্বরা শক্তি বাড়ায় - সেই একই জিন আবার হয়ত ছেলেদের মধ্যে সমকামী প্রবণতা ছড়িয়ে দেয় - বিবর্তনের উপজাত হিসেবে। সেজন্যই ডঃ ক্যাম্পেরিও ক্যানি বলেন [27] –

---

[24] Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

[25] যেমন, ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রবিন ডানবার মনে করেন, মানুষের মধ্যে সম্ভবত বিবর্তনের বাই- প্রোডাক্ট। তিনি বলেন, 'homosexuality doesn't necessarily have to have a function. It could be a spin-off or by-product of something else and in itself carries no evolutionary weight'।

[26] Corna, F., A. Camperio-Ciani and C. Capiluppi, 2004. Evidence for maternally inherited factors favouring male homosexuality and promoting female fecundity. Proceedings: Biological Sciences 271: 2217-2221.

[27] How Sex Works: Why We Look, Smell, Taste, Feel, and Act the Way We Do, Sharon Moalem, Harper; First Edition, April 28, 2009

> "We have finally solved the paradox ... the same factor that influence sexual orientation in males promotes higher fecundity in females'

বিজ্ঞানী ডীন হ্যামারও প্রায় একই কথা বলেছেন একটু অন্যভাবে[28] –

> 'The answer is remarkably simple : the same gene that causes men to like men, also causes women to like men, and as a result to have more children'

বিবর্তন তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে সামাজিক নির্বাচন। আমরা দেখেছি প্রানীজগতে সমকামিতার প্রবৃত্তি একটি বাস্তবতা। শুধু মানুষের ক্ষেত্রে সমকামিতা নেই, ছড়িয়ে আছে প্রাণিজগতের সকল প্রজাতির মধ্যেই। আসলে প্রকৃতিতে সবসময়ই খুব ছোট হলেও একটা অংশ ছিল এবং থাকবে যারা যৌনপ্রবৃত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু কেন এই ভিন্নতা? এর একটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় ইকোলজিস্ট জোয়ান রাফগার্ডেন রোথসবর্গ তার "Evolution's Rainbow: Diversity, Gender and Sexuality in Nature and People." বইয়ে[29] । তিনি বলেন, যৌনতার উদ্দেশ্য সনাতনভাবে যে কেবল 'জিন সঞ্চালন করে বংশ টিকিয়ে রাখা' বলে ভাবা হয়, তা ঠিক নয়। যৌনতার উদ্দেশ্য হতে পারে যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরন। তিনি বলেন :

> 'যদি আপনি সেক্স বা যৌনতাকে যোগাযোগের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে দেখেন, তাহলে আপানার কাছে অনেক কিছুই পরিস্কার হয়ে যাবে, যেমন সমকামিতার মত ব্যাপার স্যাপারগুলো - যা জীব বিজ্ঞানীদের বছরের পর বছর ধরে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। বনোবো শিম্পাঞ্জীদের মধ্যে সমকামী সংশ্রব বিষমকামীদের মতই দেদারসে ঘটতে দেখা যায়। আর বনোবোরা কিন্তু প্রকটভাবেই যৌনাভিলাসী। তাদের কাছে যৌনসংযোগের (Genital contact) ব্যাপারটা আমাদের 'হ্যালো' বলার মতই সাধারণ। এভাবেই তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকে। এটি শুধু দলগতভাবে তাদের নিরাপত্তাই দেয় না, সেই সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য আহরণ এবং সন্তানদের লালন পালনও সহজ করে তুলে'।

---

[28] পূর্বোক্ত।

[29] Joan Roughgarden, *Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People*, University of California Press, May 17, 2004।

শুধু বনোবো শিম্পাঞ্জীদের কথাই বা বলি কেন, বাংলাদেশেই আমরা যেভাবে বড় হয়েছি সেখানে ছেলেদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হলে একজন আরেকজনকে স্পর্শ করে, হাতে হাত ধরে কিংবা ঘারে হাত দিয়ে ঘোরাঘুরি করে। ঝগড়া- ঝাটি হলে বুকে জড়িয়ে ধরে আস্থা পুনর্প্রতিষ্ঠিত করে। মেয়েরাও তাই। এই আচরণ একটু প্যাসিভ তবে এ ধরনের প্রেরনা কিন্তু মনের ভেতর থেকেই আসে। বলা বাহুল্য, এই প্রেরণার মধ্যে কোন জিন সঞ্চালনজনিত কোন উদ্দেশ্য নেই, পুরোটাই যোগাযোগ এবং সামাজিকীকরনের প্রকাশ।

যোগাযোগ আর সামাজিকরণের কথা মাথায় রেখেই জোয়ান রাফগার্ডেন তার বিবর্তনবিদ্যা সংক্রান্ত 'ইভ্যলুশনস রেইনবো' (পূর্বে উল্লিখিত) বইয়ে 'যৌনতার নির্বাচন' (sexual selection)- এর বদলে 'সামাজিক নির্বাচন' (social selection) - এর প্রচলন ঘটানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি বলেন, প্রানীজগতের সাংগঠনিক ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে তাদের খাবার, সঙ্গী প্রভৃতির সঠিক নির্বাচনের উপর। প্রাণিজগতের এই নির্বাচনই কখনো রূপ নেয় সহযোগিতায়, কখনো বা প্রতিযোগিতায়। এবং এটাই শেষ পর্যন্ত সমস্ত পারিবারিক বিবিধ সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করে। কোন কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক একগামিতা বা মনোগামিতে রূপ নিতে পারে (মানুষ ছাড়াও কিছু রাজহাঁস, খেঁকশিয়াল, কিছু পাখির মধ্যে একগামী সম্পর্ক আছে), কখনো বা রূপ নেয় বহু(স্ত্রী)গামিতা বা পলিগামিতা (সিংহ, বহু প্রজাতির বনের মধ্যে এরকম হারেম তৈরি করে ঘোরার প্রবণতা আছে), কখনোবা বহু(পুরুষ)গামিতা বা পলিঅ্যান্ড্রি (কিছু সিংহ, হরিণ এবং প্রাইমেটদের মধ্যে)তে। এমনকি অনেকসময় দলে একাধিক 'জেন্ডারের' মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন, ব্লু গ্রীন সানফিশ নামের একপ্রজাতির মাছ আছে যেখানে এক একটি ঝাঁকে দুই পুরুষ মাছের মধ্যে সমধর্মীযৌনতার বন্ধন (same-sex courtship) গড়ে উঠে। এখানে মুখ্য পুরুষ মাছটি (এদের 'আলফা মেল' বলা হয়) একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলে আর তারপর অপর পুরুষ মাছটিকে সাথে নিয়ে তাদের যৌথ সাম্রাজ্যে স্ত্রীমাছগুলোকে ডিম পাড়তে আমন্ত্রণ জানায়। অনেকসময় দ্বিতীয় পুরুষ মাছটি স্ত্রী মাছের অনুকরণ করে স্ত্রী মাছের ঝাকের সাথে মিশে যায় - যা অনেকটা আমাদের সমাজে বিদ্যমান ক্রস- জেন্ডার প্রতিনিধিদের মতই। ড. রাফগার্ডেনের মতে, যৌন-প্রকারণ এবং সমধর্মী যৌনতা এভাবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে, যা অনেক সময়ই মোটা দাগে কেবল শুক্রানুর স্থানান্তর নয়। সামাজিক নির্বাচন হচ্ছে সেই বিবর্তন যা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে টিকিয়ে রাখে। ড. রাফগার্ডেনের মত সামাজিক নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করেন ব্রুস ব্যাগমিল এবং পল ভ্যাসি সহ অনেক বিজ্ঞানীই।

তবে বেশিরভাগ জীববিজ্ঞানীই এখনই 'যৌনতার নির্বাচনকে' সরিয়ে দিয়ে 'সামাজিক নির্বাচন'কে গ্রহণ করার পক্ষপাতি নন, কারণ প্রকৃতিজগতের বেশিরভাগ ঘটনাকেই 'যৌনতার নির্বাচন' দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনবাদী জীববিদ জেরি কয়েন রাফগার্ডেনের সমালোচনা করে বলেন[30]:

> 'She ignores the much larger number of species that do conform to sexual selection theory, focusing entirely on the exceptions. It is as if she denies the generalization that Americans are profligate in their use of petrol by describing my few diehard countrymen who bicycle to work.'।

নেচার পত্রিকায় রাফগার্ডেনের বইটির ভুয়সী প্রসংশা করার পরও তার 'সামাজিক নির্বাচন' তত্ত্বের সমালোচনা করে নৃতত্ত্ববিদ সারাহ হর্ডি বলেন[31] - '(তার) এ (উদাহরণ) গুলো যৌনতার নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উপযুক্ত কারণ নয়, বরং এগুলো হতে পারে জীব- বৈচিত্রকে (সামাজিকভাবে) গ্রহণযোগ্য করার অনুপ্রেরণা'। এর কারণ আছে। অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, যৌনতার নির্বাচনের মাধ্যমেই হোমসেক্সুয়ালিটিকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। সমকামিতার জিন (যদি থেকে থাকে) যোগাযোগ ও সামাজিকতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে উপযোগী তা বনোবো শিম্পাঞ্জীদের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এটি সত্য হতেই পারে[32]। আবার এমনো হতে পারে মানুষের মধ্যে 'গে জিন'- এর ভূমিকা পুরুষ এবং স্ত্রীতে ভিন্ন হয়। ইতালীর একটি সমীক্ষার (২০০৪) কথা আমরা আগেই জেনেছি - যা থেকে বেরিয়ে এসেছে, যে প্রকরণটি পুরুষদের মধ্যে সমকামিতা ছড়াচ্ছে সেটাই মেয়েদের ক্ষেত্রে আবার উর্বরাশক্তি বাড়াচ্ছে। এছাড়া 'কিন সিলেকশন'- তত্ত্বের সাহায্যেও সমকামিতাকে বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন। ইন্টারনেটের বহুল- প্রচারিত টক- অরিজিনের[33] একটি লিঙ্কেও[34] বিবর্তনের আধুনিক তত্ত্বের মাধ্যমে সমকামিতার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কাজেই যে কারনেই সমাজে হোমোসেক্সুয়ালিটির অস্তিত্ব থাকুক না কেন, এবং সেগুলোকে উপস্থাপনের সঠিক মডেল নিয়ে বিবর্তনবাদীদের মধ্যে যত বিতর্কই থাকুক না কেন (বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানে এধরনের বিতর্ক খুবই স্বাভাবিক), এটি এখন মোটামুটি সবাই স্বীকার

[30] A Review by Jerry Coyne, http://www.powells.com/review/2004_08_15.html
[31] Sarah Blaffer Hrdy, Sexual diversity and the gender agenda, Nature 429, pp 19 – 21, 06 May 2004
[32] The evolution of human homosexual behavior. Current Anthropololgy 39(1): 385-413.
[33] Talk.Origins is a moderated Internet discussion forum concerning the origins of life and evolution. The group includes detailed and reasoned rebuttals to creationist claims. There is an expectation that any claim is to be backed up by actual evidence, preferably in the form of a peer-reviewed publication in a reputable journal.
[34] Index to Creationist Claims Claim CB403: Evolution does not explain homosexuality: Response: http://www.talkorigins.org/indexcc/CB/CB403.html

করে নিয়েছেন যে, সমকামিতার মত যৌন- প্রবৃত্তিগুলো 'অস্বাভাবিক' বা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' নয়, বরং বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও তত্ত্বের সাহায্যেই এই ধরনের যৌন- প্রবৃত্তিগুলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। আজ আমি যখন এ বইটি লিখতে বসেছি তখন সারা পৃথিবী জুড়ে চারশ'রও বেশি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে 'গে জিন' নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। কাজেই সমকামিতার ব্যাপারটি এখনো জীববিজ্ঞানীদের কাছে গবেষণার সজীব একটি বিষয় - যে কোন সম্ভাবনার এক অবারিত দুয়ার!

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার রুদ্ধ দুয়ার খুললেন যারা

যৌনতা মানব- সমাজের অত্যন্ত গোপনীয় দিক। মানুষের 'প্রাইভেট- লাইফ'- এর সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক। ফলে প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। নানাভাবে ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কখনো বোধ করি অস্বস্তি। সে সজন্য যৌনতা নিয়ে ভাল কোন গবেষণা আঠারো শতকের আগে শুরুই হয়নি, যদিও রগরগে 'সেক্স ম্যানুয়াল'- এর অভাব সমাজে কখনোই ছিল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের কথা তো আমরা সবাই জানি। এটি লেখা হয়েছিল বোধ হয় সেই দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে। তারও আগে ছিল রোমান কবি অভিডের (Ovid) লেখা 'আরস আমাতোরিয়া' বা 'Arts of Love'। এছাড়া ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ভারতীয় লাভ ম্যানুয়াল 'অনঙ্গ রাঙ্গা' কিঙ্গা গ্রীক 'এলিফান্তিস'- এর কথাও হয়ত অনেকে জানেন। এগুলোতে নানাপদের আশন- কুশন আর 'ক্যামনে স্ত্রীকে বশে রাখা যায়' – এ নিয়ে রগরগে উপাদান আছে ঢের, কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই যৌনতা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়নি।

যৌনতার উপর প্রাথমিক গবেষণা বলতে আমরা অনেকে ফ্রয়েডের গবেষণাই বুঝে থাকি, যদিও ফ্রয়েডেরও আগে রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং এ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। রিচার্ড ফ্রেইহার মানবজীবনে যৌনতার বিভিন্নরূপকে লিপিবদ্ধ করে ১৮৮৬ সালে 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' (Psychopathia Sexualis) নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন । বইটিতে তিনি সমকামী প্রবণতাকে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' বলে আখ্যায়িত করেন। সমকামিতা ছিলো তার চোখে উত্তরাধিকারের অধঃপতন[1]। তিনি আরো মনে করতেন হস্তমৈথুনের কারণে মানব জীবনে সমকামিতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বইটি সে সময় শুধু চিকিৎসক কিংবা সার্জনদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি,

[1] অধঃপতন তত্ত্বের ("Degeneracy" theory) মূল উদ্ভব ঘটেছিলো আঠারো শতকে, কিন্তু উনিশ শতকে এটি পূর্ণতা পায়। মানুষের যে কোন অস্বাভাবিকতা - তা সে নির্বুদ্ধিতাই হোক, কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব কিংবা হোক না খুন খারাবির মতো কোন অপরাধ - সবই এই ' অধঃপতন' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা হত । চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে ১৮৫৭ সালে বি. এ মোরেল নামে এক ' বিশেষজ্ঞের' হাত দিয়ে। তিনি কিছু বিশেষ শারীরিক অবস্থা - যেমন ক্ষয়রোগ (যক্ষা) এবং ক্রেটিনিজম (এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব) সহ বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে এই অধঃপতন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। তখন যেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান এত উন্নত পর্যায়ের ছিলো না, ডাক্তাররা এই অদ্ভুতুরে তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলো বলা যায়। রিচার্ড ভন ক্রাফট ইবিং মোরেলের এই তত্ত্ব তার যৌনতার তত্ত্ব ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন এবং সমকামিতাকে এক ধরণের ' অধঃপতনের প্রকাশ' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

সাধারণ মানুষদের মাঝেও এটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। রিচার্ড ফ্রেইহারের জীবদ্দশাতেই এই বইটির প্রায় ডজন খানেক মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, অনুদিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। এই বইটি লেখার আগে বিশ্বে ইবিং- এর তেমন কোন পরিচিতি ছিল না। কিন্তু এই একটি বইই তাকে নিয়ে আসে একেবারে খ্যাতির উজ্জ্বল আলোয়। অখ্যাত এক জার্মান নিউরোলজিস্ট রাতারাতি পরিণত হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানে। আর তার বই 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' দেশ বিদেশে মুড়ি মুরকির মতই বিক্রি হতে থাকে। এই বইটিই মুলতঃ প্রথম বারের মত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন' থেকে সমকামিতাকে সর্বসাধারণের কাছে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' এবং 'অসুস্থতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো, যার প্রভাব বজায় ছিলো পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত[2]। আর তার বইয়ের সূত্রেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন 'পাগল সারাবার' নানা চিকিৎসা; অন্য দিকে ধর্মের ধ্বজাধারী চার্চ খুঁজে পেল সমকামীদের হেনস্থা করার সুদৃঢ় 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'। যদিও সেসময়ের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমকামিতার কোন জৈববৈজ্ঞানিক ভিত্তি রিচার্ড ইবিং- এর জানা ছিলো না, কিন্তু 'নিঃসংশয়ী এবং প্রত্যয়ী' ইবিং ঢালাওভাবে তার বইয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমকামীরা বিকৃত মনোভাবাপন্ন, কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম এবং তারা মনোরোগী[3]। বলা বাহুল্য, সমকামী প্রবৃত্তি নিয়ে ইবিং- এর গৎবাঁধা বুলিগুলো আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগেই[4]। কিন্তু তিনি প্রথম অপ্রচলিত 'হোমোসেক্সুয়ালিটি' শব্দটিকে (যা কার্ল মারিয়া কার্টবেরি অনেক আগে ১৮৬৯ সালে একটি প্যাম্ফ্লেটে ব্যবহার করেছিলেন) একাডেমিয়ায় শুধু নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার দুয়ার উন্মোচন করেন। ইবিং- এর এ ধরণের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হন আরেক বিখ্যাত যৌনগবেষক – যার নাম আমরা সবাই জানি - বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড এস. ফ্রয়েড।

বিশ শতকের প্রথম দিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড তার বিভিন্ন মক্কেলদের সাথে কথোপকথোন এবং তাদের যৌন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অধ্যয়নের ভিত্তিতে যৌনতার যে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তার প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বজায় ছিল। তবে পরবর্তীতে ফ্রয়েডের অনেক গবেষণাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। যেমন, কোন আবদ্ধ পরিবারে বাবার দূরে থাকার কারণে কোন ছেলে কেন সমকামীমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, ছেলেটি 'ইডিপাস কম্পলেক্স' থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। আবার

[2] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996

[3] Krafft-Ebing, R. [1886] 1999. Psychopathia Sexualis. Reprinted by Bloat Books.

[4] Today, most contemporary psychiatrists no longer consider homosexual practices as pathological (as Krafft-Ebing did in his first studies): partly due to new conceptions, and partly due to Krafft-Ebing's own self-correction. From Wikipedia.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing

একই পরিস্থিতিতে একটি মেয়েশিশু কেন সমকামী হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হল, এতে থাকে তার প্রতি তার মার অবচেতন ঘৃণা (unconscious hatred of their mothers) কিংবা তার ভাইয়ের লিঙ্গের প্রতি ঈর্ষা (envy of a brother's penis)। ফ্রয়েডের এ ধরণের ব্যাখ্যাকে 'বৈজ্ঞানিক' না বলে এখন 'ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার' বলাই শ্রেয়। ড. হুমায়ুন আজাদ তার 'নারী' গ্রন্থে এধরণের ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার সম্বন্ধে বলেছেন[5],

> '... ফ্রয়েডের সমস্ত সিদ্ধান্ত এখন গন্য হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক বলে; শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলও : একরাশ পিতৃতান্ত্রিক, গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার পেশ করেছিলেন মনোবিশ্লেষনরূপে। ফ্রয়েড যখন উদঘাটন ও প্রকাশ করে চলেছিলেন মনের 'অদৃশ্য' সূত্র, শোনাচ্ছিলেন লিবিডো, অহম, অবচেতনা, ইডিপাস- ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা, শিশ্নাসূয়ার পূরাণ; কামকে করে তুলেছিলেন বিশ শতকের আল্লা ... ফ্রয়েডের মানুষধারনাকেই ভুল মনে হয় আজ; পিতৃতন্ত্রের, গোত্রের ও নিজের দুঃস্বপ্ন মানুষ নামে তিনি উপস্থিত করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে।'

ড. হুমায়ুন আজাদের কথায় আবেগের আতিশয্য থাকলেও অতিশয়োক্তি নেই কোথাও। তবে তারপরও বলতে হয়, ফ্রয়েডর গুরুত্ব এখানেই যে তিনিই প্রথম যৌনতা নিয়ে প্রথাগত গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। আরো একটা ব্যাপার সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েড তার পূর্বসুরী গবেষক ইবিং এর মত সমকামিতাকে কোন 'রোগ' বলে মনে করতেন না। তিনি ভেনিসের Die Zeit পত্রিকায় সমকামিতা সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সরাসরি – 'সমকামী ব্যক্তিরা অসুস্থ নয়'[6]। একবার এক আমেরিকান মহিলা তার ছেলের সমকামিতা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে ফ্রয়েডের সাহায্য কামনা করলে, ফ্রয়েড তাকে চিঠিতে জানান-

> 'আমি আপনার চিঠি থেকে যা বুঝলাম তা হল আপনার সন্তান সমকামী। কিন্তু আপনি সেই কথা আপনার চিঠিতে সরাসরি কোথাও উল্লেখ করেননি। আমি কি জানতে পারি কেন আপনি এটা এড়িয়ে গেলেন? সমকামিতার হয়তো কোন উপকারিতা নেই, কিন্তু এতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই। এটি কোন অসুস্থতা নয়, কিংবা নয় কোন ধরণের অধঃপতন। এটাকে কোন রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং আমরা একে যৌনতার এক প্রকারণ (variation) হিসেবে দেখি, যা কোন ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে বিভিন্ন

[5] হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২

[6] His exact comment was – "Homosexual persons are not sick". (Ref. Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996)

> কারণে জন্ম নিতে পারে। প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বহু জ্ঞানী গুনী এবং শ্রদ্ধেয় মানুষজন সমকামী ছিলেন (যেমন প্লেটো, মাইকেলএঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখ)। সমকামিতাকে অপরাধ হিসবে চিহ্নিত করে এর উপর নিষ্ঠুর হওয়া নিঃসন্দেহে অনৈতিক হবে'।

তবে ফ্রয়েডের এ ধরণের 'প্রথাগত' গবেষনার অনেক আগেই আঠারো শতক থেকেই – কিছু দার্শনিক সমকামিতার ব্যাপারে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমত জানিয়েছিলেন। যেমন দার্শনিক ভলটেয়ারের (১৬৯৪ - ১৭৭৮) কথা বলা যায়। ভলটেয়ার ১৭৬৪ সালে লেখা একটি বইয়ে সমকামিতাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অনৈতিক প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করেছিলেন; কিন্তু আবার এই আচরণের ব্যাপক প্রসার দেখে বিস্মিতও হয়েছিলেন[7]। তিনি মনে করতেন, এই মানসিকতার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিংবা 'গড়ম বেশী পড়লে' সমকামিতার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বলে তিনি ভাবতেন। আরেক ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) মনে করতেন সমকামিতা মুলতঃ এসেছে আরব দেশগুলো থেকে। তবে যেহেতু সারা পৃথিবীর সকল দেশেই সমকামিতা ছড়িয়ে গেছে, তাই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াই সঙ্গত।

ইবিং এর 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' প্রকাশিত হবার আগে ১৮৬২ সালে জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী কার্ল হেনরিখ উলরিচস 'উরানিসম'[8] নামের একটি ধারণার জন্ম দেন। সমকামিতার ইতিহাসে উলরিচসের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তিনি ছিলেন সমকামী মানবাধিকারের আদি প্রবক্তাদের অন্যতম এবং একজন বিদ্রোহী লেখক। প্রথম দিকে তিনি Numa Numantius নামের ছদ্মনামে লিখলেও পরবর্তীতে নিজ নামেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং প্রকাশ্যে নিজেকে 'উরানিয়ান' হিসেবে অভিহিত করতেন (তাকে এখন ইতিহাসের প্রথম 'আউট অব ক্লোজেট' বলে মনে করা হয়)। তিনি আইনের যাতাকলে পিষ্ট সমকামী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলেন এবং সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক সমস্ত আইনকানুন লোপ করার আহবান জানান। সমকামিতা তার কাছে কোন 'অপরাধ' ছিলো না, বরং তার চোখে একেবারেই 'প্রাকৃতিক' এবং খুবই 'স্বাভাবিক' একটি প্রবৃত্তি। তিনি তার লেখায় সেজন্যই বলেন, "There is no such thing as unnatural love. Where true love is, there nature is also"

---

[7] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

[8] উরানিজম উনবিংশ শতকের একটি মতবাদ। এই মতবাদে মনে করা হত সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ। এরা উলরিচসের চোখে ছিলো তৃতীয় লিঙ্গ।

সমকামিতা সম্বন্ধে সরাসরি কিছু না বললেও ফরাসী চিন্তাবিদ দিদেরোর (১৭১৩- ১৭৮৪) দৃষ্টিভংগী পরবর্তীতে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি পাল্টাতে সাহায্য করেছিল। তিনি মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে অহেতুক নীতি কপচানোর ব্যাপারে চার্চের ভূমিকার সমালোচনা করেন। দিদেরোর মতামতকে গ্রহণ করে নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও দার্শনিক চার্চের অসহিষ্ণু মনোভাবের নিন্দা করেছেন। এর মধ্যে ফরাসী সাহিত্যিক মার্কুইস দে সাদ এবং এমিল জোলার কথা আলাদা করে বলা যায়। এরা সমকামী মনোবৃত্তিকে জন্মগত বলে মত দিয়েছেন, এবং এও বলেছেন, এই মানসিকতাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

এখন একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, সমকামিতা নিয়ে শরীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্বিক গবেষণা শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরেই। শুধু সমকামিতা নয়, পাশাপাশি রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা এবং অপরাপর যৌনপ্রবৃত্তি নিয়েও সামগ্রিকভাবে গবেষণা হচ্ছে ঢের। এর ফলে যে যৌন- প্রবৃত্তিগুলো একসময় নিকষ অন্ধকারের কালো চাঁদরে ঢাকা ছিল, তা ধীরে ধীরে উঠে আসছে দিনের আলোতে। সমকামিতা বিষয়ে লিখতে গিয়ে যাদের কথা না বললেই নয়, তারা হলেন ব্রিটিশ ডাক্তার হেনরি হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯- ১৯৩৯), জন এডিংটন সিমন্ডস (১৮৪০- ১৮৯৩) এবং জার্মান মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড (১৮৬৪ - ১৯৩৫)। এরা সকলেই ছিলেন ইবিং এর প্রায় সমসাময়িক কিন্তু ইবিং এর মতামতের সাথে তারা একমত ছিলেন না।

জন এডিংটন সিমন্ডস বিজ্ঞানের কোন গবেষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম প্রধান ইংরেজ কবি। সাত খন্ডে প্রকাশিত ‘ইতালির রেনেঁসা’ (Renaissance in Italy) বইটি তার প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। তিনি শুধু কবিতাই লেখেননি, শেলী এবং সিডনির মত ইংরেজ কবি, নাট্যকার বেন জনসন এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পীদের জীবনীও লিখেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক উঁচু মানের সমালোচক।

কিন্তু যত বিখ্যাত মানুষের জীবনীই তিনি লিখুন না কেন নিজের জীবনী কিন্তু তিনি আমৃত্যু প্রকাশিত হতে দেননি। তার মৃত্যুর দু’বছর পরে ১৮৯৫ সালে তার প্রকাশক এইচ. এফ. ব্রাউন তার স্মৃতিকথার ভিত্তিতে সিমন্ডসের একটি জীবনী প্রকাশ করেন, কিন্তু সিমন্ডসের মূল পান্ডুলিপিটি তিনি কাউকে দেখতে দেননি। ব্রাউন সাহেব ‘যক্ষের ধনের’ মত সিমন্ডসের পান্ডুলিপিটি নিজের কাছে আমৃত্যু আগলে রাখেন, শুধু তাই নয় ১৯২৬ সালে মৃত্যুর সময় তিনি পান্ডুলিপিটি লন্ডন লাইব্রেরীকে দান করে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে যান যে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেন পান্ডুলিপিটি খোলা না হয় – সেটিকে যেন নিভৃত একটি জায়গায় আবদ্ধ করে রেখে দেয়া হয়।

লন্ডন লাইব্রেরী তাই করলো; ব্রাউন সাহেবের প্যাকেটটিকে একেবারে সিল গালা করে লাইব্রেরীর সিন্দুকে তুলে রাখল। এর ২৩ বছর পরে ১৯৪৯ সালে সিমন্ডসের কন্যা ডেম ক্যাথেরিন তার পিতার পান্ডুলিপিটি পড়তে চাইলে লন্ডন লাইব্রেরী 'বিশেষ বিবেচনায়' ক্যাথেরিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ক্যাথেরিনের সামনে উন্মোচিত হল সবুজ এক বাক্সে রাখা ৬ বাই ১২ বাই ১৮ ইঞ্চি এক খাতা, যার উপরের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল – 'J A Symond's papers'[9]। কিন্তু ডেম ক্যাথেরিন লাইব্রেরী থেকে ফিরে এসে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললেন না, বাবার পান্ডুলিপি নিয়ে কোন ধরণের উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করলেন না। ফলে সিমন্ডসের পান্ডুলিপি রহস্য হয়েই রইলো আম- জনতার কাছে।

১৯৫৪ সালে লাইব্রেরীর উপকমিটি একটি মিটিং করে বাছাই করা কিছু বিশেষজ্ঞকে (বোনাফাইড স্কলার) পান্ডুলিপি পড়বার অনুমতি দিলেন, তাও বিশেষ প্রহরায়। কি ছিলো সেই পান্ডুলিপিতে? কেন এই সতর্কতা? কেনই বা এত লুকোচুরি? লুকোচুরির কারণ বোঝা গেল পান্ডুলিপিটার 'ইমোশোনাল ডেভেলপমেন্ট' নামে একটা অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ পড়েই[10] –

> 'আমি যখন কারো জীবনী লিখি, তখন চেষ্টা করি সততার সাথে আর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে। আমি মনে করিনা আমার নিজের জীবনীর ক্ষেত্রেও সেটা কোন ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু বিভিন্ন বোধগম্য কারণে আমার জীবনের সবগুলো ব্যাপার আমার পক্ষে আগে ঠিক মত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। আমি ভবিষ্যত মনোবিজ্ঞানী এবং সাইকোলজির ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য এমন একটি উপকরণ রেখে যেতে চাইছিলাম যেটা পড়ে তারা বুঝতে পারে, এমন মানুষও আছে যার কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবৈকল্য ছিলো না, আগা- গোড়া একটি সুস্থ্য, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করেছে, কিন্তু এমন একটি অনুভূতিময় কামনায় মত্ত ছিল – যা বর্তমান সমাজের চোখে আপত্তিকর। আর সেই অনুভূতির নাম – পুরুষে পুরুষে প্রেম – সমকামিতা!'

জন এডিংটন সিমন্ডস বড় হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসবে। আর দশটা ছাত্রের মতই স্কুলে গিয়েছিলেন, বন্ধু বান্ধবেরও অভাব ছিলো না। কিন্তু তিনি ছোটবেলায় খেলাধূলা তেমন পছন্দ করতেন না, তার চেয়ে ঢের বেশি পছন্দ করতেন বই পড়তে। পরে অক্সফোর্ডে এসে গ্রীক সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে তার। গ্রীক সাহিত্য

[9] John Addington Symonds, The Memoirs of John Addington Symonds, Univ of Chicago Pr, 1986
[10] পূর্বোক্ত।

এবং ইতিহাস পড়েই সিমন্ডস বুঝতে পারেন সমকামিতা পৃথিবীর ইতিহাসে সবসময়ই ছিলো, কখনো প্রকাশ্যে, কখনোবা অপ্রকাশ্যে। বিশেষতঃ হোমারের *ইলিয়াড* পড়ে তিনি অভিভূত হন। গ্রীক দেবতা হার্মেসের কাহিনীও তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল দারুনভাবে, উপন্যাসে বর্ণিত হার্মেসের সৌন্দর্য তার গভীরে তৈরি করল 'ফোয়ারার এক অবিনাশী ফল্গুধারা'[11] । সব মিলিয়ে গ্রীক সাহিত্য সিমন্ডসের সামনে খুলে দিলো প্রবৃত্তির এক অজানা দুয়ার।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিকালীন একটা সময়ে নিজের বাড়িতে যান অবসর কাটাতে। সেখানে তিনি তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট এক ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন এই সম্পর্ককে তিনি স্থায়ী করতে পারবেন না। তিনি যতই গ্রীক সাহিত্য পড়ুন না কেন, তিনি জানেন গ্রীক সমাজের সাথে ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের বিস্তর ফারাক। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সমকামিতা শুধু অস্বীকৃত নয়, দন্ডনীয় অপরাধ। তিনি লিখলেন -

> I could not marry him; modern society provided no bond of comradeship whereby we might have been united. So my first love flowed to waste…

১৮৬১ সালে সিমন্ডস আরেকটি সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, আলফ্রেড ব্রুক নামের একুশ বছরের এক যুবকের সাথে - কিন্তু সে সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। এ সময় বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বে তার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যৌন হতাশায় ভুগতে থাকেন সিমন্ডস। এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন। এদের মধ্যে একজন ' রক্ষিতা' রাখারও পরামর্শ দেন, কিন্তু সিমন্ডসের তা মনঃপূত হয়নি।

১৮৮৪ সালে বাবার চাপে পড়ে জ্যানেট ক্যাথেরিন নামের এক মহিলাকে বিয়ে করেন সিমন্ডস। ভাবলেন এর ফলে তিনি ' অস্বাভাবিকতা' থেকে মুক্তি পাবেন। বছর কয়েকের মধ্যেই তিনি চার সন্তানের পিতা হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার উপলব্ধি হতে শুরু করল যে, বিয়ে করাটা ছিলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি তার জীবনীতে লিখলেন - ' Perhaps the great crime of my life was my marriage.' ।

ধীরে ধীরে আবারো একাকী হয়ে উঠলেন সিমন্ডস। রোগ শোক প্রায়শঃই হানা দিতে থাকে আগের মতই। তার ডাক্তার পিতা সিমন্ডসের রোগ সনাক্ত করে বললেন তার টিবি হয়েছে। বায়ু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশীরভাগ সময়ই তিনি ইতালী এবং

[11] জন এডিংটন তার জীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন - 'Hermes, in his prime and bloom beauty, unlocked some deeper fountains … in my soul' (source: The Memoirs of John Addington Symonds, পূর্বোক্ত)

সুইজারল্যান্ডে কাটাতে থাকেন। তিনি নিজেকে নিয়ে দুটো স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করে ফেললেন - একটা নিজের স্ত্রী- কন্যাদের জন্য, আর অন্যটি তার বন্ধু জগৎ নিয়ে। তার ফুসফুসের অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তিনি স্ত্রীকে বলেন যে, তাদের একসাথে আর থাকা উচিৎ নয় - এত রোগ- শোক নিয়ে ঘর সংসার করে বউকে বিপদে ফেলা খুবই অনৈতিক। বলাবাহুল্য সমকামিতার ইতিহাসে সিমন্ডসই প্রথম কিংবা সর্বশেষ ব্যক্তি নন - যাকে ' সংসার' নামক এই দ্বিচারিতার সাথে প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়েছে। এখনো সমাজের চাপে বহু সমকামীদেরই ' সংসার ধর্ম' পালন করতে হয়, অভিনয় চলতে হয় সমাজের আর দশটি ' স্বাভাবিক' মানুষের মতই। সমকামীদের জীবনের এ এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।

এ সময় সিমন্ডস আবারো গ্রীক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টোফেন, জেনোফন এবং অন্যান্যদের নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে থাকেন। এ সময়েই তিনি নীরবে, নিভৃতে রচনা করেন অষ্ট আশি পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা - ' A Problem in Greek Ethics' । ১৮৮৩ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুস্তিকাটির মাত্র দশ কপি ছাপিয়েছিলেন আর বিতরণ করেছিলেন তার খুব কাছের বন্ধুমহলে। এ বইয়ে তিনি গ্রীক সংস্কৃতির পাইদারেস্তিয়া বা কিশোর প্রেম, ইরোমেনোস - ইরাস্তেস সহ বহু হারিয়ে যাওয়া বিষয় আশয় অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় তুলে আনেন। তিনি তার বইয়ে স্পষ্ট করে লেখেন -

> বহু মেডিকেল ডাক্তার এবং আইনী লেখকেরা মোটেও অবগত নন যে, ইতিহাসের পাতায় বহু মহান এবং উন্নত জাতির অস্তিত্ব আছে যারা সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো না, বরং ছিলো পুরোপুরি সহানুভূতিশীল। এমনকি, তারা সমকামিতার চর্চা করে আত্মিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছিলো।

বছর খানেক পরে তিনি আরেকটি বই লেখেন - The problem in Modern Ethics (১৮৯১)। তিনি এ বইয়ে সমকামিতার তৎকালীন ধ্যান ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ- মনস্তাত্বিক কারণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বইয়ে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমকামিতা সম্পর্কে নিবর্তনমূলক ধ্যান ধারণা আর আইন কানুন রহিত করা প্রয়োজন। এই বইটি পঞ্চাশ কপি ছাপিয়েছিলেন সিমন্ডস এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বিতরণ করেন। তাদের বলে দেয়া হয় যে, তারা বইটি পড়ার সময় বইয়ের পাশে নোট লিখে যেন লেখককে আবার ফেরৎ দেন। ঠিক এ সময়ই বিখ্যাত ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ডকে সমকামিতার অপরাধে দুই বছরের দন্ড পোহাতে হয়। সম্ভবতঃ সিমন্ডস এ কারণেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

সমকামিতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ‘এ প্রবলেম অব গ্রীক এথিক্স’ এবং ‘প্রবলেম অব মডার্ণ এথিক্স’ – বই দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটো বইকে বর্তমানে ইংরেজী সাহিত্যের জগতে প্রথম দিককার পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে পুরুষে পুরুষে প্রেমের সরাসরি তথ্যসূত্র বিশ্বস্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও সিমন্ডসের মনে হয়েছিলো সমকামিতা সম্বন্ধে মানুষজনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন করতে হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু সিমন্ডস নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় এদিক থেকে সন্তুষ্টি পাচ্ছিলেন না। ঠিক এসময়ই ১৮৯০ সালে তার সাথে পরিচয় ঘটে ব্রিটিশ ডাক্তার হ্যাভলক এলিসের সাথে। এ যেন ছিলো সঠিক সময়ে সত্যিকার মনি- কাঞ্চন যোগ।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জন্য হ্যাভলক এলিস সম্বন্ধেও কিছু বলে নিতে হয়। সে সময় এলিস ছিলেন সিমন্ডসের চেয়ে প্রায় বছর বিশেক ছোট। নিজে সমকামী না হলেও হ্যাভলক এলিসের স্ত্রী ছিলেন সমকামী[12]। ফলে তিনি খুব কাছ থেকে সমকামীদের জীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমকামিতার আইনী স্বীকৃতির আগে এই প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া দরকার । ১৮৯৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘Sexual Inversion’ নামের একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি এলিসের বলা হলেও আসলে গ্রন্থটি লিখেছিলেন এলিস এবং সিমন্ডস দু’জনে মিলে। হ্যাভলক এলিস লিখেছিলেন বইটির মূল অংশ – চিকিৎসাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে, আর ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন জন এডিংটন সিমন্ডস। এ ছাড়াও সিমন্ডস ‘উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গী’ নামে একটি অধ্যায় বইটিতে নিজের নামেই সংযুক্ত করেন এবং তার পুর্বেকার লেখা ‘প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স’ সন্নিবেশিত করেন বইয়ের পরিশিষ্টে। বইটির প্রথম মূদ্রণ দু’জনের নামেই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৯৭ সালে। কিন্তু বইটি প্রকাশের পর সিমন্ডেসের পরিবারের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হল – প্রকাশকের কাছে দাবী করা হল যেন, বইটি থেকে সিমন্ডসের নাম এবং সমস্ত রেফারেন্স তুলে নেয়া হয়। সিমন্ডসের বইয়ের সম্পাদক হোরাশিও ব্রাউন সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বইটির কপি সংগ্রহ করে বাজার থেকে তুলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান, যদিও কিছু কপি তার হাতের ফাঁক গলে ঠিকই পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলো। এই চাপ সামলাতে গিয়ে এলিসকে মহা বিপদে পড়তে হয়। অবশেষে, বইটির দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশের সময় এলিস সিমন্ডসের নাম তুলে নেন,

[12] যে কোন বিচারে হ্যাভলক এলিস এবং তার স্ত্রী এডিথ লীজের বিয়ে ছিল সে সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই ব্যতিক্রমী। এলিসের স্ত্রী এডিথ লীজ ছিলেন নারীবাদী কবি (তার অন্য চার বোনেরা ছিলেন আবার সবাই অবিবাহিত)। তারা পারস্পরিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও দু’জনেই সাড়া জীবন মুক্ত সম্পর্কে (Open relationship) আস্থাশীল ছিলেন, এবং একে অন্যের যৌনস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না । যৌনতার ব্যাপারে তারা ছিলেন সমস্ত সামাজিক সংস্কারের উর্ধ্বে।

‘প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স’ অংশটি পরিশিষ্ট থেকে বাদ দেন ‘উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গী’ অধ্যায়টির লেখক হিসেবে অজ্ঞাত ‘Z’ অন্তর্ভুক্ত করেন; এবং সিমন্ডসের দেওয়া তথ্যসূত্রকে ‘বিশ্বস্ত সূত্রে’ পাওয়া বলে উল্লেখ করেন[13]। বইটির এই পরিবর্তিত মূদ্রণটি চিকিৎসকদের মধ্যে যথেষ্টই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, যেটা ছিলো আসলে তাদের বইটি লেখার পেছনে মূল অনুপ্রেরণা।

এই বইয়েই প্রথম বারের মত ইবিং- এর সমকামিতাকে ‘বিকৃতি’ বা ‘ব্যাধি’ হিসবে প্রচার করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয় – বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে। এলিস বইটিতে ইবিং এর ‘অধঃপতন’ তত্ত্বের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি হাজির করেন, তিনি বইটিতে ইবিং- এর হস্তমৈথুনের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের ধারণাও বাতিল করে দেন। আর তারপর ১৯১৫ সালে এলিস প্রকাশ করেন আরেকটি গ্রন্থ ‘Psychology of Sex’। এলিস যে সময় এ ধরণের গবেষণা শুরু করেছিলেন সে সময়টায় ইংল্যান্ড ছিল পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল। ফলে গবেষণা করতে গিয়ে এলিসকে দূর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তার প্রথম বই প্রকাশের পর বইয়ের সবগুলো কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রকাশককে পেতে হয় কঠিন শাস্তি। পরে তার গবেষণাকাজের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল[14]।

সমকামিতার গবেষনায় আরেকজন গবেষক - যার গুরুত্ব অপরিসীম তিনি হলেন জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড। তিনি সমকামীদের ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ নামে অভিহিত করে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সংক্রান্ত সনাতন ধারনা খন্ডন করতে প্রয়াসী হন। শুধু গবেষনাই নয়, তিনি সে সময় ‘সায়েন্টিফিক এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান কমিটি’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হার্চফিল্ড ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি যুক্তিনির্ভর কথা বলতেন এবং সব ধরনের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এবং বক্তব্যকে স্বাগত জানাতেন। সমকামিতার নানান দিক বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং আইনজ্ঞদের তাঁর সংস্থায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তার কমিটির শ্লোগান ছিল – ‘জাস্টিস থ্রু সায়েন্স’।

---

[13] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, পূর্বোক্ত।

[14] কথিত আছে, এক পুলিশের গোয়েন্দা ১৮৯৮ সালের ২৭ শে মে লন্ডনের একটি বইয়ের দোকান থেকে দশ শিলিং দিয়ে ‘সেক্সুয়াল ইনভারশন’ নামে একটি বই ক্রয় করেন। এর চারদিন পরে পুলিশ দোকানে এসে জর্জ বেডব্রাউ নামে দোকানের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন দোকানে ‘অশ্লীল’ বইপত্র রাখার অযুহাতে। এলিসকে গ্রেফতার করা না হলেও এলিস এবং প্রকাশকের উপর দিয়ে রীতিমত ঝড় বয়ে যায় সে সময়। পত্র- পত্রিকাতেও নানা রকমের রং- বেরঙের কেচ্ছা কাহিনী লেখা হতে থাকে। বেডব্রাউকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। এলিস সব কিছু দেখে এতই ক্ষুব্ধ হন যে তিনি তার পরবর্তী বই আর ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশ করবেন না বলে মনস্থ করেন।

বস্তুতঃ এই সংস্থার উদ্যোগে জার্মানীতে প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিকভাবে সমকামী মানসিকতার কারণ নির্ণয় করা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, সমকামিতার আইনী স্বীকৃতির ব্যাপারে এই সংস্থা সচেষ্ট হয়। তখনকার জার্মান ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকামিতা বিষয়ক আইন সংশোধনের জন্য হার্চফিল্ড পাঁচ হাজার বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে সহযোগী গবেষক ইভান ব্লোচের সাথে মিলে সমকামী মানুষদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং যৌনতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগী পাল্টানো্র জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেন, এবং এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'Institut für Sexualwissenschaft' নামে আরেকটি সংগঠনও গড়ে তুলেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় এসে হার্চফিল্ডের কাজ বন্ধ করে দেয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আজকে ইন্টারনেটে নাৎসী বাহিনীর বই- পোড়ানোর যে সমস্ত ছবি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই আসলে হার্চফিল্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরীর[15] ।

চিত্রঃ নাৎসী বাহিনী ১৯৩৩ সালে ক্ষমতা দখলের পর হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেয়।

এত কিছু করেও কিন্তু এ সংক্রান্ত গবেষণা থামিয়ে রাখা যায় নি। ফার্ডিন্যান্ড হ্যাক, এডিংটন সায়মন্ডস, ইভান ব্লোচ, ক্লারা থমসন, থিডর হেনরিখ, ইরভিং বেইবার, অটো

[15] 'The press-library pictures & archival newsreel film of Nazi book-burnings seen today are usually pictures of Hirschfeld's library ablaze', wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld

গ্রস, হুকার, মিলার, স্কোফিল্ড, হেনরি বেঞ্জামিন প্রমুখ গবেষকের বহুমুখী গবেষণা গহীন আঁধার থেকে সমকামিতাকে নিয়ে আসল দিনের আলোয়। এদের মত গবেষকদের জন্যই সহমর্মিতা আর সহিষ্ণুতার ঢেউ এসে লাগে সমাজে। একদিন যাদের অচ্ছুৎ বলে গন্য করা হত, দেখা হত সমাজের 'নিকৃষ্টতম জীব' হিসেবে, তাদের প্রতি বাড়িয়ে দেওয়া হল সাহায্যের হাত। সারা পৃথিবী জুড়ে বহুসংগঠন গড়ে উঠল এই সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক মানুষদের সাহায্য করার এবং তাদের মানবিক অধিকার রক্ষার তাগিদে। রক্ষণশীলতা, প্রগতিশীলতা, বিজ্ঞান ও বাস্তবতার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ আর প্রতিসংঘর্ষে একটা সময় যৌনতা সংক্রান্ত সনাতন ধারনাই গেল পালটে। পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তির বিপ্লব, এনলাইটমেন্টের পাশাপাশি হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করল 'যৌনতার বিপ্লব' – যা মানুষের যৌণতাসংক্রান্ত সামাজিক এবং মনঃস্তাত্বিক ধ্যান ধারণাকেই আমূলভাবে পালটে দিল। আর যে ব্যক্তিটির গবেষণা এই যৌনতার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানীবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলফ্রেড কিন্সে (১৮৯৪ - ১৯৫৬)।

কথিত আছে, প্রকৃতিপ্রেমিক এই তরুণ প্রফেসর কিন্সে গল ওয়াস্প নামে একধরনের বোলতার উপর ক্লাসে একদিন লেকচার দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে আলোচনা কোন একভাবে চলে গেল বোলতাদের যৌনপ্রবৃত্তির দিকে। ক্লাসের অনেক ছাত্র সুযোগ পেয়ে এ সময় নানাধরনের প্রশ্ন করা শুরু করল। কখনও বা তা চলে গেল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির দিকেও। কিন্সে তার জীববিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতুহল মেটাতে থাকলেন। পুরো ক্লাস পরিণত হল এক 'সরস' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এমনকি এর জের পুরোমাত্রায় বজায় রইল ক্লাসের বাইরেও। অনেক ছাত্র- ছাত্রী কিন্সের কক্ষে এসে ব্যক্তিগতভাবে যৌনতা বিষয়ে নানা ধরণের পরামর্শ চাওয়া শুরু করল। কিন্সে দেখলেন, এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর, কিন্তু পুরো বিষয়টিকে ঢেকে রাখা হয়েছে নীতি- নৈতিকতার অদৃশ্য কালো চাঁদরে। তিনি বুঝতে পারলেন, 'সেক্স নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা না করার' এই চিরায়ত সনাতনী প্রথাটা যে করেই হোক ভাংতে হবে। তিনি ছাত্রদের ডীনের কাছে ধর্না দিলেন, এবং ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে যৌনশিক্ষার একটি কোর্স চালু করার পক্ষে ওকালতি শুরু করলেন। বললেন, ছাত্র- ছাত্রীরা যে হারে আমাদের দেশের মত 'রসময়গুপ্ত মার্কা' চটি বই পড়ে সেক্স সম্বন্ধে ভুল ভাল ধারণা পাচ্ছে, তার থেকে আমরা একাডেমিকভাবে কিছু পড়াই না কেন! কিন্সে শেষ পর্যন্ত তার আবেদন মঞ্জুর করিয়ে ছাড়লেন। তিনি ফুল হাউজ অডিটোরিয়ামে একাডেমিকভাবে প্রথম 'সেক্স কোর্স' –এর উপর ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। তবে সে ক্লাস উন্মুক্ত ছিল কেবল শিক্ষকবৃন্দ, গ্র্যাজুয়েট কিংবা সিনয়র ছাত্র, কিংবা বিবাহিত ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য। কিন্সে আগের মতই ছাত্র- ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের

উত্তর দিয়ে কৌতুহল মিটাতে লাগলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি এবং যৌনজীবনের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক কোন ভাল সমীক্ষাই বাজারে নেই। ফলে একটা সময় কিন্সের নিজেকেই যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণায় নামতে হল। সম্পূর্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমীক্ষার প্রয়োজনে প্রশ্নাবলী তৈরি করলেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে এ গবেষণা চালিয়ে ১৯৪৮ সালে লিখলেন 'Sexual Behavior in the Human Male' নামে একটি যুগান্তকারী বই; এবং এর পাঁচ বছর পর ১৯৫৩ সালে বের করেন 'Sexual Behavior in the Human Female'। গ্রন্থদুটির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের এমন কিছু দিক উন্মোচিত হল যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নতুন, এবং অনেকের কাছেই খুব 'অস্বস্তিকর'। এমনকি এসব তথ্য দেখে কিন্সে নিজেও খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই কিন্সের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এল, মানুষকে সামাজিকভাবে কেবল বিষমকামী বলা একেবারেই ঠিক নয়, বহু মানুষ আছে যারা যৌনপ্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে সমকামী। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল বিষমকাম আর সমকাম – মোটা দাগে এই দু'ভাগ করাটাও বোকামী। যৌনতার সম্পুর্ণ ক্যানভাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করার জন্য কিন্সে উদ্ভাবন করলেন তার বিখ্যাত 'কিন্সে স্কেল'। এ স্কেল সমন্ধে কিন্সে তার বইয়ে বলেন[16],

> 'পুরো জনসমষ্টিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই নির্দিষ্ট ভুবনের বাসিন্দা মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীটা কেবল – ছাগল আর ভেড়ায় বিভক্ত নয়। প্রকৃতিতে খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরণের চরমসীমার রাজত্ব দেখা যায়, এর চেয়ে বরং এখানে থাকে বিবিধ উপাদানের সুষম বন্টন।'

কিন্সের স্কেলেটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। স্কেলের দুই প্রান্তকে '০' এবং '৬' হিসেবে চিহ্নিত হয়। ০ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা পরিপূর্ণভাবে বিষমকামী, আর ৬ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা সম্পুর্ণভাবে সমকামী। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থা পাঁচটিভাগে বিভক্ত; এবং ওই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যৌনতার যে রূপ প্রতিভাত হচ্ছে তাকে উভকামিতা বলাই শ্রেয়, যদিও উভকামিতার রকমফের আছে। নীচের ছকটি দেখলে এ সম্বন্ধে আরেকটু ভাল বোঝা যাবে :

[16] Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male, W. B. Saunders Company , 1953

রেটিং	বর্ণনা
০	পরিপুর্ণভাবে বিষমকামী
১	মূখ্যত বিষমকামী, কদাচিৎ সমকামী
২	মূখ্যত বিষমকামী, কিন্তু প্রায়শই সমকামী
৩	বিষমকামিতা এবং সমকামিতার প্রভাব সমান
৪	মূখ্যত সমকামী, কিন্তু প্রায়শই বিষমকামী
৫	মূখ্যত সমকামী, কদাচিৎ বিষমকামী
৬	পরিপুর্ণভাবে সমকামী
X	অযৌনপ্রজ (Asexual)

উপরের ছকটি কিন্সের স্কেলের সারমর্ম বলা যেতে পারে, যদিও কিন্সে বইটি লিখার সময় অযৌনপ্রজদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এটি স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয় পরে। আগেই বলা হয়েছে '০' দাগাঙ্কিত কক্ষটি থাকে পরিপুর্ণভাবে বিষমকামীদের দখলে। এই কক্ষে থাকা লোকেরা কখনোই সমকামের সাথে যুক্ত হয় না। '১' চিহ্নিত কক্ষে অবস্থানরত ব্যক্তিরা মূলতঃ বিষমকামী হওয়া সত্ত্বেও কালেভদ্রে সমকামিতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এরা পরিবেশ- পরিস্থিতির কারণে কিংবা কৌতুহলবশতঃ হঠাৎ করে সমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও এর সাথে কোন গভীর মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। '২' চিহ্নিত কক্ষের লোকেরা প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে এদের মতই, কিন্তু এদের সমকামী প্রবণতা আরেকটু বেশি

; কিন্তু তারপরও তা কখনোই বিষমকামীতাকে ছাপিয়ে যায় না। '৩' নম্বর কক্ষের আধিবাসীরা হয়ত সত্যিকার উভকামী। এদের সম্পর্কে কিন্সে বলেন[17], 'তারা সমানভাবে দুই ধরণের সংশ্রবই গ্রহণ এবং উপভোগ করে থাকে। কোনটির উপরেই তাদের কোন নির্দিষ্ট পক্ষপাতিত্ব নেই।' '৪' নং কক্ষের সদস্যরা সমকামী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বিষমকামের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে '৫' নং কক্ষে এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলবে যারা সমকামী হয়েও মাঝে মধ্যে কিংবা কদাচিৎ বিষমকামে জড়িয়ে পড়ে।

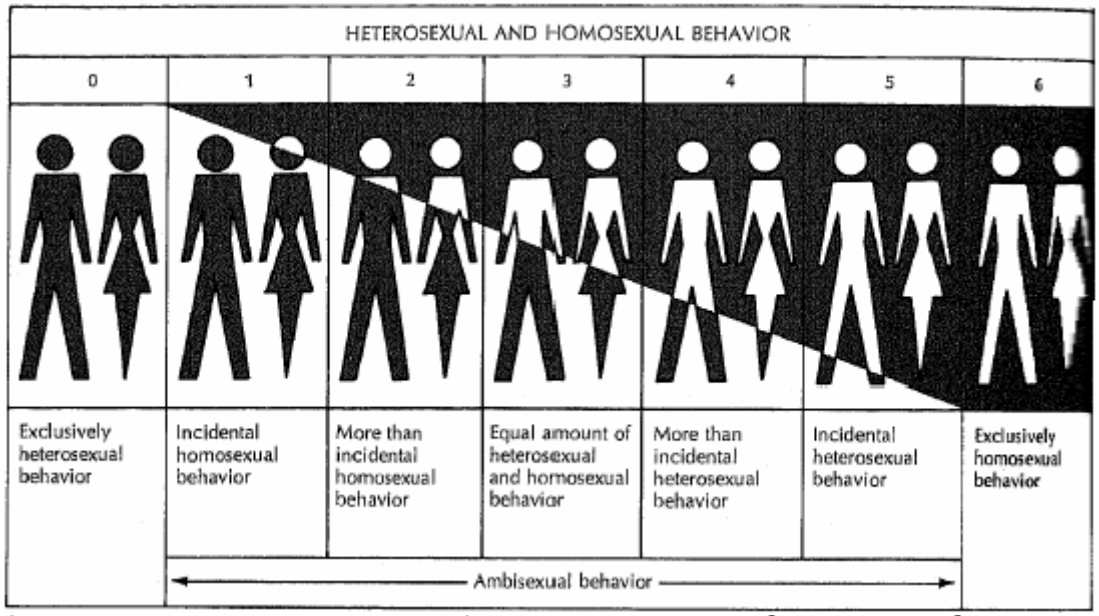

চিত্র : কিন্সে স্কেল থেকে বোঝা যায়, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই ভাগে ভাগ করা ভুল হবে ।

'৬' নং কক্ষের বাসিন্দারা পরিপূর্ণ সমাকামী। ছকটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ০ এবং ৬ বিপরীত মেরুতে। তেমনিভাবে ১ এবং ৫ পরস্পরের বিপরীত। ঠিক একইভাবে ২ এর বিপরীতে ৪ এর অবস্থান। অর্থাৎ, ০ এবং ৬ –এই চরমসীমা বাদ দিলে বাকী পাঁচটি কক্ষের অধিবাসীরা কমবেশি উভকামী।

যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে কিন্সের যুগান্তকারী গবেষণা বই আকারে প্রকাশের পর পরই ড. কিন্সে তৎক্ষনাৎ সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়ে গেলেন। ১৯৫৩ সালের অগাস্টের ২৪ তারিখে ড. কিন্সেকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বের হল, এবং তাতে লেখা হল – 'কিন্সে সেক্সের ক্ষেত্রে সেই কাজটিই করলেন যে কাজটি অনেকদিন আগে কোপার্নিকাস করেছিলেন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে'। এমনকি তাকে নিয়ে একটি কমিক বই পর্যন্ত বাজারে

[17] পূর্বোক্ত।

বের হয়ে গেল – "ওহ! ড. কিন্সে'। মার্থা রে'র লেখা এই কমিক বই- এর বিক্রি সে সময়ই আধা মিলিয়নে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চিত্রঃ টাইম ম্যাগাজিনের (আগাস্ট ২৪, ১৯৫৩) প্রচ্ছদে ড. কিন্সে

কিন্সে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে নতুন ধারা তৈরি করার পর আরো বহু গবেষক এ ধরনের কাজে এগিয়ে এলেন। এর মধ্যে সান্ড্রা বেম, জ্যানেট স্পেন্সর, রবার্ট হেলম্রিখ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে যৌণ মনোবিজ্ঞানীদের নানা পদের গবেষণায় নতুন নতুন তত্ত্বের আগমন ঘটতে লাগল। এর সাথে যোগ দিলেন জীববিজ্ঞানীরাও। মনঃস্তাত্বিক, আচরণগত, সমাজ- সাংস্কৃতিক, এবং যৌন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জেনেটিক, কগনিটিভ, হরমোনাল, শরীরবৃত্তিয়, মস্তিস্ককেন্দ্রিক এবং বিবর্তনীয় নানা রকমের গবেষনা যৌনপ্রবৃত্তির নানা আকর্ষণীয় দিক উন্মোচন করে চলল। প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে আমরা ঝালাই করে নিতে থাকলাম আমাদের পরিপার্শ্বিকতাকে।

১৯৮০ সালে ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল স্টর্মস এর একটি গবেষণা পত্রে মত প্রকাশ করলেন[18], যৌন প্রবৃত্তি নির্ধারিত হওয়া উচিৎ কোন ব্যক্তির ফ্যান্টাসি এবং কামপ্রবণতার (eroticism) উপর নির্ভর করে, কারো দৈনন্দিন যৌনকর্মের উপর

[18] Michael D. Storms, Theories of sexual orientation. Journal of Personality and Social Psychology 38: 783-792, 1980.

ভিত্তি করে নয়। তিনি দেখালেন, কোন কোন সময় উভকামীর ফ্যান্টাসির জগৎটা এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, তা কেবলমাত্র পরিপূর্ণ বিষমকামের সাথেই তুলনীয়। আবার বিপরীত ছবিটাও কখনো সখনো প্রকট হয়ে উঠে। অর্থাৎ, উভকামীর মধ্যে দেখা দিতে পারে তীব্র সমকামিতার প্রকাশ।

এরপর ১৯৮৫ সালে ফ্রিৎস ক্লেইন তার সহযোগী সেপেকফ এবং উলফের সাথে মিলে যৌনতা পরিমাপের একটু ভিন্নধর্মী স্কেল উদ্ভাবন করেন; একে 'Klein Sexual Orientation Grid' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্সের স্কেলটি ছিল সরল রৈখিক এবং একমাত্রার। ক্লেইন একে দ্বিমাত্রার ছক (মেইট্রিক্স) আকারে প্রকাশ করেন। তিনি যৌনতাকে স্থবির নয়, বরং 'গতিশীল' এবং 'বহু চলক সমৃদ্ধ' জটিল ব্যাপার বলে মনে করেন। তিনি তার ক্লেইন- স্কেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করেন এবং মত প্রকাশ করেন - যৌনতার ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন; এগুলো হল, যৌনপ্রবৃত্তি, যৌন আচরণ, যৌন আকর্ষণ, যৌনতা সম্বন্ধে ফ্যান্টাসি, আবেগ, যৌন সঙ্গী, জীবন ধারা, আত্মপরিচয় ইত্যাদি। এইভাবে নতুন- নতুন গবেষণায় প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হতে থাকে যৌনতা বিষয়ক নানান দিক। তবে তারপরও কিন্সের গুরুত্ব কখনোই ম্লান হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, যৌনতা বিষয়ে সমস্ত গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কিন্সের গবেষণাকে চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য কিন্সের গবেষণার প্রায় ষাট বছর পরে আজও গবেষক রবার্ট এপস্টেইন সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের একটি বইয়ে (২০০৬) লেখেন :

> "Ever since the late 1940s, when biologist Alfred Kinsey published his extensive reports on sexual practices in the U.S., it has been clear, as Kinsey put it, that people "do not represent two discrete populations, heterosexual and homosexual....The living world is a continuum in each and every one of its aspects." A recent position statement by the APA, the American Academy of Pediatrics and eight other national organizations agrees that "sexual orientation falls along a continuum." In other words, sexual attraction is simply not a black-and-white matter, and the labels "straight" and "gay" do not capture the complexities."

যৌনপ্রবৃত্তি যে কেবল সাদা- কালো এই দুই চরমসীমায় বিভক্ত নয় – মানব সমাজে এই চিন্তা- চেতনার ক্রমোত্তরণ ঘটানোর জন্য যে ব্যক্তিটির গবেষণা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তিনি হলেন জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সে। মুলতঃ কিন্সের গবেষণাই ষাটের

দশকে সূচিত করে যৌনতার বিপ্লবের (sexual revolution) এবং পরবর্তীতে উন্মোচন করে দেয় লেসবিয়ন, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মত সংখ্যালঘু মানুষের 'এলজিবিটি[19] আন্দোলনের' দুয়ার। তবে সেসমস্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ঢুকবার আগে আমাদের আধুনিক জীব বিজ্ঞান আর জেনেটিক্সের বইয়ের পাতায় একটু ভালমত চোখ রাখা দরকার। কারণ হরমোন, শরীরবৃত্তীয় এবং জিন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষনা ধীরে ধীরে কাটাতে সাহায্য করেছে ধোঁয়াশার অস্বচ্ছ মেঘ। আগামী অধ্যায়গুলোতে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার ফলাফলে চোখ রাখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব সমকামিতার কতটুকু জেনেটিক, আর কতটুকুই বা পরিবেশগত।

[19] LGBT (or GLBT) is an acronym referring collectively to lesbian, gay, bisexual, and transgender people.

ষষ্ঠ অধ্যায়

গে মস্তিস্ক এবং গে জিনের খোঁজে

সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি আমাদের পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষমকামী লোকজনের থেকে আলাদা, এটা আমরা জানি। কারণ তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আকর্ষণ অনুভব করে সমলিঙ্গের প্রতি। যেহেতু বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে প্রতিটি ঘটনার পেছনে যুক্তিনিষ্ঠ কারণ অনুসন্ধান, তাই বৈজ্ঞানিক পেশায় নিয়োজত অনেক গবেষকই অনুমান করলেন সমকামিতার পেছনেও নিশ্চয় কোন বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে হবে। কিন্তু কারণের উৎসটা কোথায়? তাদের মস্তিস্কের আকার, আকৃতি বা গঠন কি সাধারণদের থেকে একটু আলাদা? এ ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে পুরোমাত্রায়। ভাবনার কারণ আছে। কারণ যৌন- প্রবৃত্তির কেন্দ্রীয় উৎস হল মস্তিস্ক। মস্তিস্কই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের নানা পছন্দ, অপছন্দ, ঘৃণা, অভিরুচি আর ফ্যান্টাসি। মস্তিস্কই জীবনের বিভিন্ন চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে সিদ্ধান্তে আসে আমাদের ঐশ্বরিয়াকে ভাল লাগতে হবে, নাকি শাহরুখকে। মস্তিস্কই সিদ্ধান্ত নেয় এই মুহূর্তে আমাদের ভুতের গল্প ভাল লাগবে, নাকি আবেগময় রোমান্টিক উপন্যাস। কাজেই যৌনপ্রবৃত্তি তৈরীতে মস্তিস্কের ভূমিকাটা কি সেটা বিজ্ঞানীদের জন্য খুব ভাল করে বোঝা চাই। কিন্তু সমকামী মস্তিস্ক বিশ্লেষণের আগে বিজ্ঞানীরা আরেকটি জিনিস খুব গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। সেটা হচ্ছে নারী পুরুষের মস্তিস্ক আর অর্জিত ব্যবহারে পার্থক্য।

মস্তিস্কের যৌনতা : নারী বনাম পুরুষ

বিজ্ঞানীরা প্রথম এধরণের গবেষণা শুরু করেছিলেন ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে। ১৯৭৮ সালে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন ছেলে ইঁদুরের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাস (hypothalamus) নামের প্রত্যঙ্গটি মেয়ে ইঁদুরের থেকে তিনগুন বড়। ঠিক একই ধরণের পার্থক্য বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে পেলেন মানুষের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করেও। পুরুষ মস্তিস্কের সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াসের (suprachiasmatic nucleus) আকার মেয়েদের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুন বড় হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে কর্পাস কালোসাম (corpus callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের (anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের

প্রত্যঙ্গগুলোর তুলনায় বিবর্ধিত পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলোর কোন প্রভাব কি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় আছে? এক কথায় জবাব দেয়া মুশকিল। জীববিজ্ঞানীরা যেমন পুরুষ-নারীর মস্তিস্কের আকার আয়তন আর গঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেমনি তাদের অর্জিত ব্যবহার নিয়ে নানা ধরণের কৌতুহলোদ্দীপক কাজ করে চলেছেন বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা[1]। তারা বলেন, ডারউইনের 'যৌনতার নির্বাচন' (Sexual selection) বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রেখে থাকে তবে এর একটি প্রভাব আমাদের দীর্ঘদিনের মানসপট তৈরিতেও পড়বে। যৌনতার উদ্ভবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী-পুরুষ একই মানব প্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়ছে এক ধরণের মনোদৈহিক পার্থক্য – জৈববৈজ্ঞানিক পথেই। মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে, ছেলে মেয়েদের পারস্পরিক চাহিদা পছন্দ, অপছন্দে যেমন মিল আছে, তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে আছে চোখে পড়ার মতই পার্থক্য। এটা হবার কথাই। নারী পুরুষ উভয়কেই সভ্যতার সূচনার প্রথম থেকেই ডারউইন বর্নিত 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' নামক বন্ধুর পথে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে হয়েছে, শুধু দৈহিকভাবে নয় মন মানসিকতাতেও। দেখা গেছে, ছেলেরা আচরণগত দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে অনেক প্রতিযোগিতামূলক (competitive) হয়ে থাকে। ছেলেদের স্বভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়েছে কারণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে বাঁচতে হয়েছে আদি কাল থেকেই। যারা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পেরেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষদের এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতাকে একটু চেষ্টা করলেই ধরা যাবে। একটা মজার উদাহরণ দেয়া যাক। আমেরিকার একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে গাড়ি চালানোর সময় কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে বড়জোর পথ- চিহ্ন বা মানচিত্রের দ্বারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না । আর অন্যদিকে মেয়েরা প্রথমেই গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে পুরুষেরা গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 'আত্মভরি' মানসিতার কারণে ব্যাপারটাকে তারা 'যুদ্ধে পরাজয়' হিসেবে বিবেচনা করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের মানসপটে এত প্রবলভাবে রাজত্ব করে না বলে তারা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে

[1] বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মুলতঃ বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভুত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (evolutionary biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমার একটি ই-বুক মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করা যাবে। ঠিকানা - http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/Manob_prokriti_Avijit.pdf । এ অধ্যায়টির বেশ কিছু অংশ আমার বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপর করা ইবুক থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমাধানে পৌঁছুতে উদগ্রীব থাকে। শুধু গাড়ি চালানোই একমাত্র উদাহরণ নয়; পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অর্থ, বিত্ত আর সামাজিক প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি যে বেশি আকৃষ্ট তা যে কোন সমাজেই প্রযোজ্য। এটাও এসেছে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা থেকে।

মানব ইতিহাসের পাতায় এবারে একটু চোখ রাখি। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিলো হান্টার বা শিকারী, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক। প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরী বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হত। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে, আর সম্পত্তি এবং নারীর দখল নিতে। এখনো এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়ছেন ভেনিজুয়ালার আদিম গোষ্ঠী ইয়ানোমামো (Yąnomamö)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই আদিম গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ্য করেন,

> ‘এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করেনা, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও’।

দেখা গেল গোষ্ঠীতে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর-দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

চিত্রঃ ইয়ানোমামো গোত্রের পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম আক্রমনের আগে এভাবেই সমরশিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রদর্শন করে থাকে। (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, প্রাককৃষিপূর্ব সমাজে যে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এটা নিঠুর বাস্তবতা। পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনো চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে - প্রতিটি যুদ্ধেই অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরান সহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধাণ শিকার।

এদিকে পুরুষেরা যখন হানাহানি মারামারি করে তাদের ‘পুরুষতান্ত্রিক’ জিঘাংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্য দিকে, মেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছে সংসার গোছানোর। গৃহস্থালীর পরিচর্যা মেয়েরা বেশি অংশগ্রগণ করায় তাদের বাচনিক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ধিত হয়েছে। একটি ছেলের আর একটি মেয়ের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত যে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাতে বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক প্রমাণিত হয় । ছেলেদের ব্রেনের আকার গড়পরতা মেয়েদের মস্তিস্কের

চেয়ে অন্ততঃ ১০০ গ্রাম বড় হয়[2], কিন্তু ওদিকে মেয়েদের মস্তিস্ক ছেলেদের চেয়ে অনেক ঘন থাকে। মেয়েদের মস্তিস্কে কর্পাস ক্যালোসাম এবং এন্টেরিয়র কমিসুর নামক প্রত্যঙ্গ সহ টেম্পোরাল কর্টেক্সের যে এলাকাগুলো ভাষা এবং বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেগুলো ছেলেদের চেয়ে অন্ততঃ ২৯ ভাগ বিবর্ধিত থাকে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মস্তিস্কে রক্তসঞ্চালনের হার ছেলেদের ব্রেনের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি বলে জানা গেছে।

আরো কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যাক। ছেলেদের মস্তিস্কের প্যারিয়েটাল কর্টেক্সের আকার মেয়েদের মস্তিস্কের চেয়ে অনেক বড় হয়। বড় হয় অ্যামাগদালা (amygdala) নামের বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গের আকারও । এর ফলে দেখা গেছে ছেলেরা জ্যামিতিক আকার নিয়ে নিজেদের মনে নাড়াচাড়ায় মেয়েদের চেয়ে অনেক দক্ষ হয়[3]। তারা একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে সামনে থেকে দেখেই নিজেদের মনের আয়নায় নড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে বুঝে নিতে পারে বস্তুটি, পেছন থেকে, নীচ থেকে বা উপর থেকে কিরকম দেখাতে পারে। জরিপ থেকে দেখা গেছে, ছেলেরা গড়পরতা বিমূর্ত এবং ‘স্পেশাল’ কাজের ব্যাপারে বেশী সাবলীল, আর মেয়েরা অনেক বেশী বাচনিক এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে।

মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের প্রভাব পড়ে তাদের অর্জিত ব্যবহারে, আর সেই ব্যবহারের প্রভাব আবার পড়ে সমাজে। অভিভাবকেরা সবাই লক্ষ্য করেছেন, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক আগে কথা বলা শিখে যায় - একই রকম পরিবেশ দেয়া সত্ত্বেও। ছেলেদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো গড়পড়তা মেয়েদের মত উন্নত না হওয়ায় ডাক্তাররা লক্ষ্য করেন পরিণত বয়সে ছেলেরা সেরিব্রাল পালসি, ডাইলেক্সিয়া, অটিজম এবং মনোযোগ- স্বল্পতা সহ বিভিন্ন মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের আরো পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ছেলেরা যখন কাজ করে অধিকাংশ সময়ে শুধু একটি কাজে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, এক সাথে দু- তিনটা কাজ করতে পারে না, প্রায়শই গুবলেট করে ফেলে। আর অন্যদিকে মেয়েরা অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে ছয় সাতটা কাজ একই সাথে করে ফেলে। এটাও হয়েছে সেই শিকারী –সংগ্রাহক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই। শিকারী হবার ফলে পুরুষদের স্বভাবতই শিকারের

[2] একটি ব্যাপার এখানে পরিস্কার করা প্রয়োজন। বইয়ের এই অংশে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে নারী- পুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটি কোন লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। ছেলেদের মস্তিস্কের আকার বড় হবার অর্থ এই নয় যে, ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের থেকে বেশি কিংবা ছেলেরা যে কোন কাজে মেয়েদের থেকে অধিকতর দক্ষ। অতীতে পুরুষতান্ত্রিক প্রথা টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের ভুল স্টেরিওটাইপিং এর চেষ্টা করা হয়েছিলো। ছেলে আর মেয়েদের মস্তিস্কের গঠনে জৈববৈজ্ঞানিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, যার কারণ বিবিধ। এইটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরাই মূল উপজীব্য।

[3] Linn, M. C., & Peterson, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56(6), 1479-1498.;

প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হত, ফলে তাদের মানসজগত একটিমাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল, আর মেয়েদের যেহেতু ঘরদোর সামলাতে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাজারটা কাজ করে ফেলতে হত, তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল একাধিক কাজ একসাথে করাতে। 'মাল্টি টাস্কিং' এই মজ্জাগত দক্ষতার কারণেই বোধ হয় আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক 'কর্পোরেট জগতে'ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেয়েরা ভাল করছে, এবং তাদের অধিক হারে সে সব জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়। একটা জিনিস এখানে পরিস্কার করে বলা দরকার। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পরতা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণতঃ) বেশি দক্ষ হয়, আর মেয়েরা সামগ্রিকভাবে বহুমাত্রিক কাজে (multitasking)। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রন। এখানে সফল হতে 'স্পেসিফিক' দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে 'মাল্টিটাসকিং'ও। কাজেই, কেউ যদি নারীদের গৃহবন্দী করার অভিপ্রায়ে সেই পুরাতণ 'ব্যাক টু দ্য কিচেন' আর্গুমেন্ট নিয়ে আসতে চান সেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় শিকারী ছিলো, আর মেয়েরা সংগ্রাহক, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় সংগ্রাহক ছিলো, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না, বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না এমন দিব্যি তো কেউ দিয়ে দেয়নি। সেজন্যই আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে মেয়েরা অফিস আদালতে তো বটেই, ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়েই কাজ করে চলেছে মাইনিং ফিল্ড থেকে শুরু করে একেবারে নাসার বহির্জাগতিক গবেষণাগার সহ মোটামুটি সব জায়গাতেই।

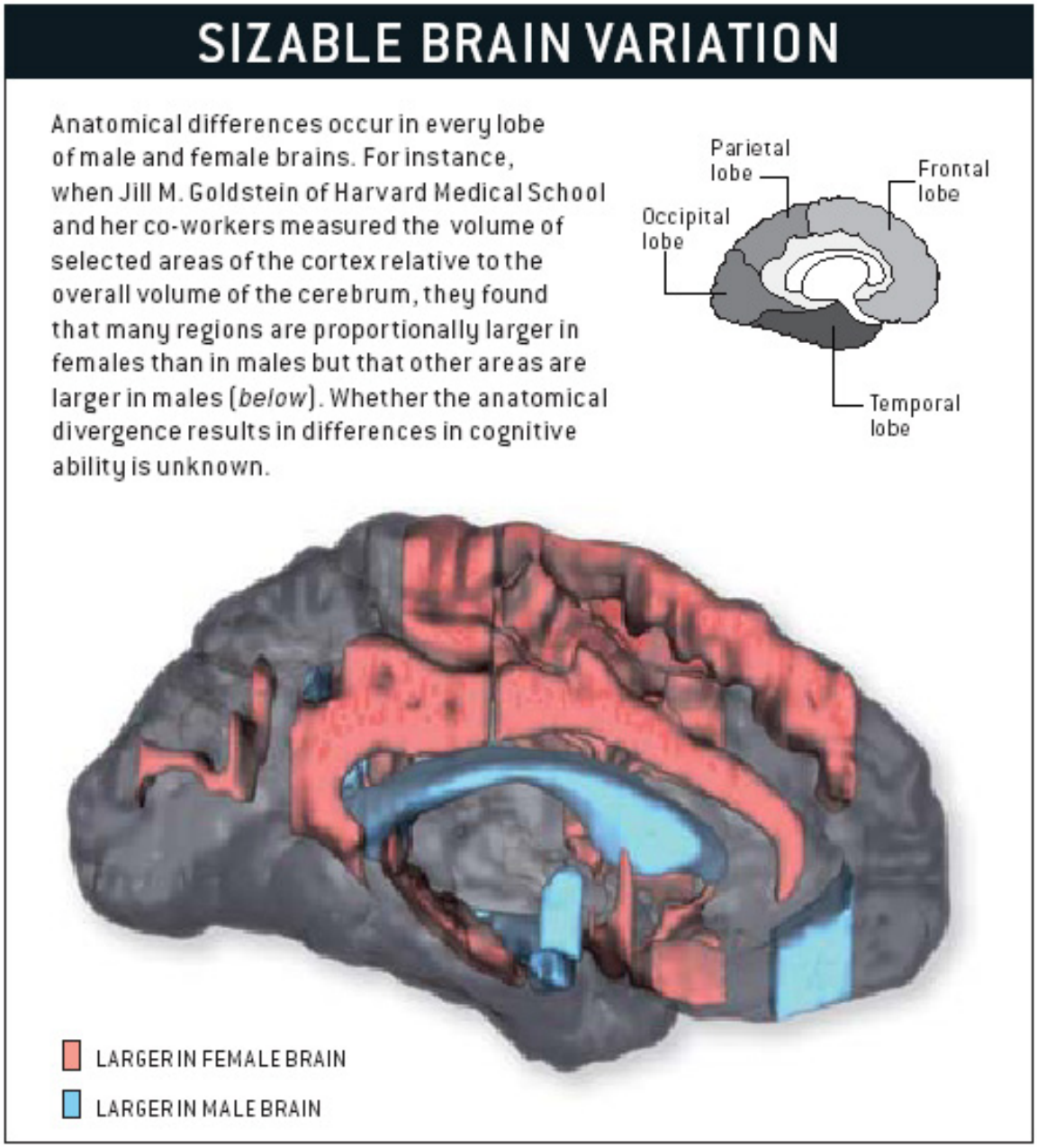

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

কিন্তু তারপরেও ছেলে- মেয়েদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ছেলেরা গড়পরতা সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ কাজের ব্যাপারে দক্ষ বলেই সম্ভবতঃ অধিক হারে স্থাপত্যবিদ্যা, গণিত কিংবা প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে উৎসুক হয়, আর মেয়েরা যায় শিক্ষকতা, নার্সিং, ডাক্তারী কিংবা সমাজবিদ্যায়। এই ঝোঁক সংস্কৃতি এবং সমাজ নির্বিশেষে একই রকম দেখা গেছে। এই রকম সুযোগ দেয়ার পরও

বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা বড় হয়ে বুয়েটের চেয়ে মেডিকেলে পড়তেই উদগ্রীব থাকে। কোন সংস্কৃতিতেই ছেলেরা খুব একটা যেতে চায় না নার্সিং-এ, মেয়েরা যেমনিভাবে কখনোই 'গ্যারেজ মেকানিক' হতে চায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ।

শুধু তাই নয়, মস্তিস্ক কিভাবে সমন্বিত হবে সেই প্রক্রিয়াতেও আছে নারী- পুরুষে পার্থক্য। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (fMRI) বিশ্লেষণ করে। একটি পরীক্ষায় এক দল মেয়ে এবং ছেলেদের আলাদা করে বসিয়ে তাদের 'লেট্', 'জেট্' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে দেয়া হয়েছিলো। শব্দগুলো উচ্চারণের সময় fMRI ব্যবহার করে তাদের মস্তিস্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলোর ছবি তুলে নেয়া হল। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা সত্যই বিস্ময়কর। দেখা গেল একই কাজ করতে গিয়ে ছেলেদের মাথা আর মেয়েদের মাথা কাজ করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। ছেলেরা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে মস্তিষ্কের কেবল একটি অংশের (বাম ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) উপর নির্ভরশীল থাকে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে মস্তিস্কের দুই অংশই (বাম এবং ডান ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) সমান ভাবে আন্দোলিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের মস্তিস্ক ছেলেদের তুলনায় অনেক সুষমভাবে বিন্যস্ত হয়ে কাজ করে। fMRI র মাধ্যমে তোলা ছবিগুলো সত্যই নাটকীয় – বিজ্ঞানীরা দেখেছেন শব্দোচ্চারণের সাথে সাথে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ আলোকিত হয়ে উঠে, এবং নারী পুরুষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়[4]।

নারীপুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের ছাপ আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদায়। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বাস ছয়টি মহাদেশ এবং পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের ৩৭ টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা ১০০৪৭ জন লোকের উপর সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা গড়পরতা দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে, কিন্তু পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুন্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়েরাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস[5]। এ ধরণের চাহিদার পার্থক্য আরো প্রকট হয়েছে নারী- পুরুষদের মধ্যকার যৌনতা নিয়ে 'ফ্যান্টাসি' কেন্দ্রিক গবেষনাগুলোতেও। ব্রুস এলিস এবং ডন সিমন্সের করা ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে যে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যকার যৌনতার ব্যাপারে ফ্যান্টাসিগুলো যদি

[4] Shaywitz BA, Shaywitz SE, Pugh KR, Constable RT, Skudlarski P, Fulbright RK, Bronen RA, Fletcher JM, Shankweiler DP, Katz L, et al., Sex differences in the functional organization of the brain for language, Nature. 1995 Feb 16;373(6515):561-2.

[5] Buss, D.M., 1989. Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49.

সততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে যৌনতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে, এমনকি সারা জীবনে তাদের পার্টনারের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কল্পনা করে তারা আমোদিত হয়ে উঠে- আর মেয়েদের মধ্যে সে সংখ্যাটা মাত্র ৮ ভাগ। এলিস এবং সিমন্সের সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অর্ধেক সংখ্যক নারীরা অভিমত দিয়েছে, যৌনতা নিয়ে কল্পনার উন্মাতাল সময়গুলোতেও তারা কখনো সঙ্গী বদল করে না, অন্য দিকে পুরুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা মাত্র ১২ ভাগ। মেয়েদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো তার নিজের পরিচিত যৌনসঙ্গীকে কেন্দ্র করেই সবসময় আবর্তিত হয়, আর অন্যদিকে পুরুষদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো সময় সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েকে নিয়েও উথলে ওঠে । একারণেই গবেষক এলিস এবং সিমন্স তাদের গবেষণাপত্রে এই বলে উপসংহার টেনেছেন [6] –

> ‘পুরুষদের যৌনতার বাঁধন-হারা কল্পনাগুলো হয়ে থাকে সর্বব্যাপী, স্বতঃস্ফুর্ত, দৃষ্টিনির্ভর, বিশেষভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক, নির্বিচারী, বহুগামী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে মেয়েদের যৌন অভিলাস অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক, আবেগময়, অন্তরংগ এবং অক্রিয়।’

ছেলে মেয়েদের যৌন-অভিলাসের পার্থক্যসূচক এই প্রবণতার প্রভাব পড়েছে আজকের দিনের বানিজ্যে এবং পন্য-দ্রব্যে। এমনি একটি দ্রব্য হচ্ছে ‘পর্নগ্রাফি’ অন্যটি হল ‘রোমান্স নভেল’। পর্নগ্রাফির মুল ক্রেতা নিঃসন্দেহে পুরুষ। পুরুষদের উদগ্র এবং নির্বিচারী সেক্স ক্রেজের চাহিদা পূর্ণ করতে বাজার আর ইন্টার্নেট সয়লাব হয়ে আছে সফট পর্ন, হার্ড পর্ন, থ্রি সাম, গ্রুপ সেক্স সহ হাজার ধরণের বারোয়ারি জিনিসপত্রে। এগুলো পুরুষেরাই কিনে, পুরুষেরাই দেখে। মেয়েরা সে তুলনায় কম। কারণ, মেশিনের মত হার্ডকোর পর্ন পুরুষদের তৃপ্তি দিলেও মেয়েদের মানসিক চাহিদাকে তেমন পূর্ণ করতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর নগ্ন দেহ দেখে পুরুষেরা যেমন সহজেই আমোদিত হয়, মেয়েরা তেমনি হয় না। কারণ - মেয়েদের অবারিত সেক্স জাগ্রত করতে দরকার অবারিত ইমোশন!

আর মেয়েদের এই অবারিত আবেগ জাগ্রত করতে বাজারে আছে ‘রোমান্স নভেল’। এই সমস্ত প্রেমোপন্যাসের মূল ক্রেতাই নারী। দেদারসে প্রেম-পীরিতি-বিচ্ছেদের পসরা

---

[6] B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary Psychological Approach", *Journal of Sex Research*, Vol. 27 pp.527 - 555.

সাজিয়ে শ'য়ে শ'ইয়ে বই সাড়া দুনিয়া জুড়ে বের করা হয় – আর সেগুলো দেদারসে বিক্রি হতে থাকে সাড়া বছর জুড়ে, মূলতঃ মেয়েদের হাত দিয়ে। বাংলাদেশে যেমন আছে ইমদাদুল হক মিলন, তেমনি আমেরিকায় সুসান এলিজাবেদ ফিলিপ্স, ভারতে তেমনি সুবোধ ঘোষ কিংবা নীহারঞ্জন গুপ্ত । প্রেম কত প্রকার ও কি কি তা বুঝতে হলে এদের উপন্যাস ছাড়া গতি নেই। আমি শুনেছি, রোমান্স নভেলের জন্য প্রকাশকেরা ইদানিংকালে বিশেষতঃ উঠতি লেখকদের নাকি বলেই দেয় – কিভাবে তার উপন্যাস 'সাজাতে' হবে, আর কি কি থাকতে হবে। একটু প্রেম, অনুরাগ, কমিটমেন্ট, মান – অভিমান, বিচ্ছেদ, ক্লাইম্যাক্স তারপর মিলন। আবেগের পশরা বেশি থাকতে হবে, সে তুলনায় সেক্সের বাসনা কম। বইয়ের নায়িকার সেক্সের সাথে আবার আবেগ মিলিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি। এভাবে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে রোমান্স নভেলের ম্যানুফ্যাকচারিং। মেয়েরা দেদারসে কিনছে, আবেগে ভাসছে, হাসছে, কখনো বা চোখের পানি ফেলছে। আর বই উঠে যাচ্ছে বেস্ট সেলার তালিকায়।

আরো কিছু আনুষঙ্গিক মজার বিষয় আলোচনায় আনা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে এক সময় 'প্লে বয়'- এর পাশাপাশি একসময় প্লে গার্ল' চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। চলেনি। মেয়েরা এ ধরণের পত্রিকা কেনেনি, বরং কিনেছে সমকামী পুরুষেরা ঢের বেশি। ছেলেরা শুধু কেন বল খেলবে আর মেয়েরা পুতুল - এই শিকল ভাঙ্গার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ধরণের খেলনা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিলো - চলেনি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, আমরা যত আড়াল করার চেষ্টাই করি না কেন, ছেলে মেয়েদের মানসিকতায় পার্থক্য আছে - আর সেটা দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় ছাপ থাকার কারণেই। এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্টে এক মায়ের আর্তিতে। সেই মা পত্রিকায় (নভেম্বর ২, ১৯৯২) তার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন –

> 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার পত্রিকার বিজ্ঞ পাঠকেরা কি বলতে পারবেন কেন একই রকমভাবে বড় করা সত্ত্বেও যতই সময় গড়াচ্ছে আমার দুই জমজ বাচ্চাদের মধ্যকার নারী- পুরুষজনিত পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠছে? কার্পেটের উপর যখন তাদের খেলনাগুলো একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন দেখা যায় ছেলেটা ঠিকি ট্রাক বা বাস হাতে তুলে নিচ্ছে, আর মেয়েটা পুতুল বা টেডি বিয়ার'।

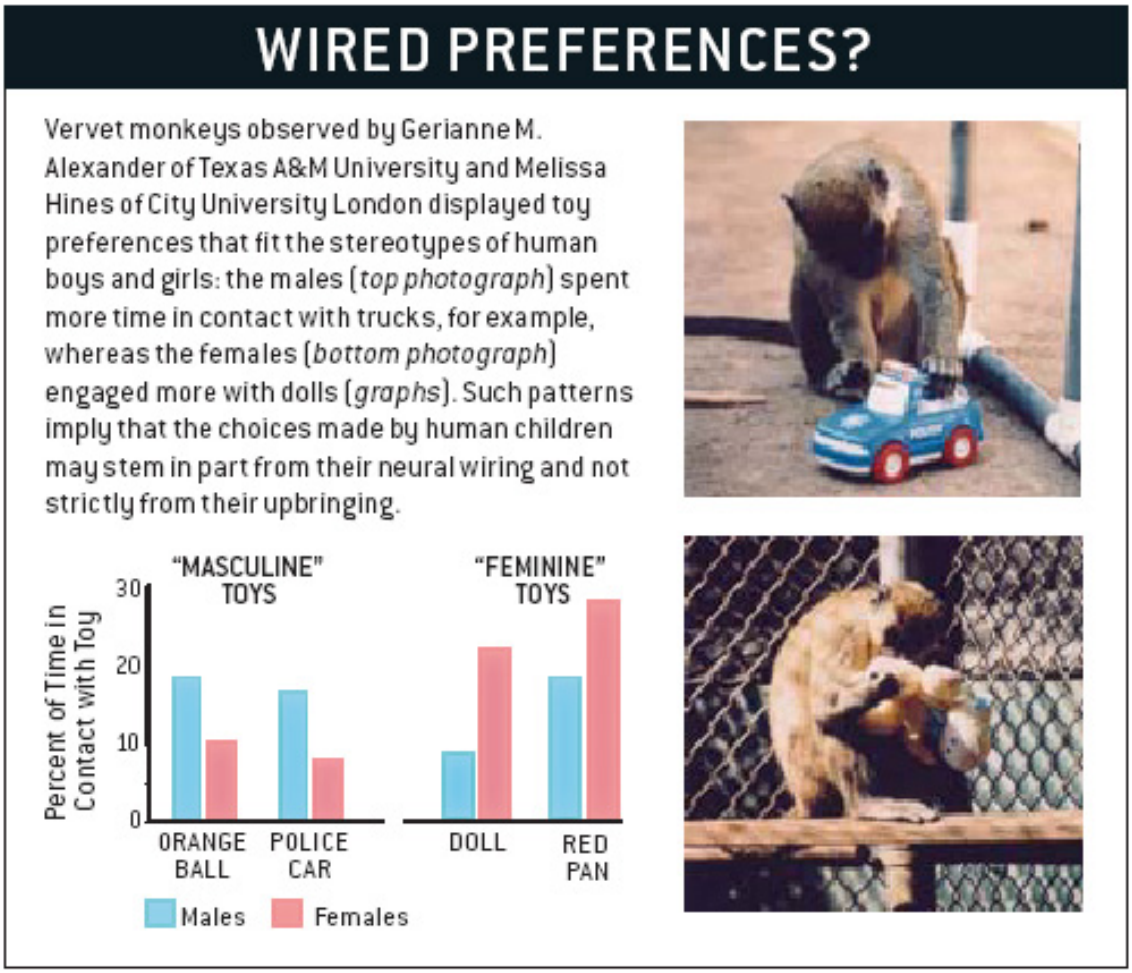

চিত্রঃ – বিজ্ঞানীরা ভার্ভেট বানর নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে খেলনার প্রতি পছন্দের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, যা আমাদের মানব সমাজের ছেলে- মেয়েদের খেলনা নিয়ে 'স্টেরিওটাইপিং'-এর সাথে মিলে যায় (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু মানব শিশু নয়, মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি ভার্ভেট বানর (vervet monkeys) নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাদের হাতে যদি খেলনা তুলে দেয়া হয়, ছেলে বানরেরা ট্রাক বাস গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বেশি সময় কাটায় আর মেয়ে বানরেরা পুতুল কোলে নিয়ে। মানব সমাজে দেখা গেছে খুব অল্প বয়সেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে খেলনা নিয়ে এক ধরণের পছন্দ তৈরি হয়ে যায়, বাবা মারা সেটা চাপিয়ে দিক বা না দিক। দোকানে নিয়ে গেলে ছেলেরা খেলনা- গাড়ি কিংবা বলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে, আর মেয়েরা পুতুলের প্রতি। এই মানসিকতার পার্থক্যজনিত প্রভাব পড়েছে খেলনার প্রযুক্তি, বাজার এবং বিপননে। যে কেউ আমেরিকার টয়েস আর আসের(toys r us) মত দোকানে গেলেই ছেলে- মেয়েদের জন্য খেলনার হরেক রকম সম্ভার দেখতে পাবেন।

কিন্তু খেলনা গুলো দেখলেই বোঝা যাবে – এগুলো যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বানানো।

গে মস্তিষ্কের খোঁজে

বিজ্ঞানীরা ইঁদুর আর বানর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে হাইপোথ্যালমাসের মধ্যে 'মেডিয়াল প্রিঅপ্টিক' বলে যে এলাকাটা (medial preoptic area) আছে, সেটা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যৌনতার পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ছেলে ইঁদুরেরা মেয়ে ইঁদুরের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। বানর নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা একই ধরণের ফল পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হাইপোথ্যালমাস- বিশিষ্ট বানরদের আচরণ হয়ে থাকে অনেকটা 'যৌন- প্রতিবন্ধী'র মত। মেয়ে বানরদের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই থাকে না। এ থেকে যৌনপ্রবৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালমাসের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রেও হাইপোথ্যালমাস নামের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গটির সাথে যৌনপ্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তারা হাইপোথ্যালমাসের এলাকাকে অভিহিত করেন *ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস* (INAH) নামের এক বিদঘুটে নাম দিয়ে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে আবার তারা বিভিন্ন নম্বর দিয়ে – $INAH_1$, $INAH_2$, $INAH_3$, $INAH_4$,। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি এবং তার এক ছাত্রী লরা এলেন আশির দশকে মানুষের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ছেলেদের মস্তিষ্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$)এর আকার মেয়েদের থেকে অন্ততঃ তিনগুন বড় পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৯০ সালে সিমন লেভি নামের এক আমেরিকান প্রখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী চিন্তা করলেন নারী পুরুষের হাইপোথ্যালমাস নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সমকামী ব্যক্তিদের হাইপোথ্যালমাসের কি অবস্থা সেটা একটু মেপে জোখে দেখা দরকার। তিনি ১৬ জন সমকামী পুরুষের এবং ছয় জন সমকামী মহিলার হাইপোথ্যালমাসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালালেন। তিনি দেখলেন, গোর্কির মতই তিনিও ছেলেদের $INAH_3$- এর আকার মেয়েদের চেয়ে আকারে দু'গুন বড় পাচ্ছেন। কিন্তু সেই সাথে আরো একটা জিনিস পেলেন। সেটা হল - $INAH_3$- এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুন ছোট। অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস এর আকার মেয়েদের $INAH_3$- এর সমান! লেভি পরবর্তীতে একটি হাসপাতালের ৪১ জন রোগীর উপর একই পরীক্ষা করেন। সেখানেও তিনি একই ফলাফল পেয়েছিলেন। লেভির এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি পরবর্তীতে উইলিয়াম

বাইন নামের আরেকজন বিজ্ঞানী করেছিলেন[7]। তিনিও একই ফলাফল পেয়েছেন, অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাসটি আকারে বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে ছোট, এবং অনেকটা মেয়েদের সমান।

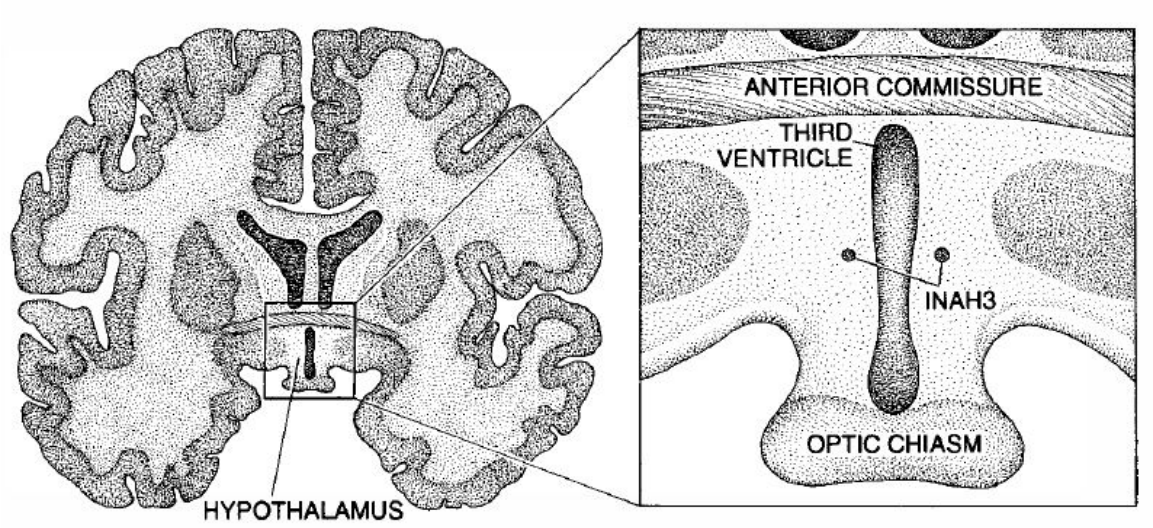

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মস্তিস্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$) এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুন ছোট হয়।

তার মানে কি? এর মানে কি এই যে সমকামী পুরুষদের মস্তিস্ক অনেকটা নারীসুলভ? বলা মুশকিল। বিজ্ঞানীরা এই অনুকল্পটিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন। তারা জানেন, শুধু $INAH_3$- এর আকারেই নয়, মস্তিস্কের আরো অন্যান্য প্রত্যঙ্গের আকারেও পার্থক্য পাওয়া গেছে। যেমন, মেয়েদের ভাষগত দক্ষতা যেহেতু ছেলেদের চেয়ে বেশি এবং একটু ভিন্নভাবে কাজ করে, তাদের কর্পাস কালোসাম (corpus callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুর (anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের তুলনায় বড়। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে কি অবস্থা? হ্যা, আপনি যা সন্দেহ করেছেন তাই – সমকামী ব্যক্তিদের কর্পাস কালোসাম এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের আকার বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে আকারে বড় হয়, এবং মেয়েদের আকারের সাথে মিলে যায়। ১৯৯২ সালে লরা এলেন এবং রজার গোর্কি এন্টিরিয়র কমিসুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সমকামীদের ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের চেয়ে

[7] Byne W, Tobet S, Mattiace LA, et al. (September 2001). "The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status". Horm Behav 40 (2): 86–92.

বড়[8]। আবার কর্পাস কালোসাম নিয়ে পরীক্ষা করে আরেকদল বিজ্ঞানী দেখেছেন, সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের থেকে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশী[9]।

তাহলে কি দাঁড়ালো? একসময় উলরিচস (পঞ্চম অধ্যায় দ্রঃ) যেমনটি ভেবেছিলেন – 'সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ' – সেটাই কি তবে ঠিক?। অনেক বিজ্ঞানী পূর্বেকার সীমিত পরীক্ষা থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তে তাই ভেবে নিয়েছিলেন। ঢালাও ভাবে ভেবে নেয়া হয়েছিল- সমকামিতার প্রকাশ মানে 'A female spirit in a male body'। সামাজিক ভাবেও আমরা দেখি সমকামী ছেলেদের 'মেয়েলী' বলে খোঁটা দেয়া হয়। তা হলে সত্যিই কি এই 'স্টেরিওটাইপিং' গুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? কিন্তু এখানে এসেই দাবার ছক আবারো উলটে গেলো। মানুষের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাসে সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াস (VIP SCN nucleus) নামের যে এলাকাটি আছে, যেটার আকার ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে বড় থাকে। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার কিরকম হবার কথা? নিশ্চয় ছোট এবং মেয়েদেরটার সমান তাই না? না, মোটেই তা নয় – সমকামীদের ক্ষেত্রে VIP SCN nucleus এর আকার পাওয়া গেল অনেক বড়, ছেলে মেয়ে দু দলের চেয়েই[10]। সে জন্যই জোয়ান রাফগার্ডেন তার 'ইভল্যুশন রেইনবো' বইয়ে শ্লেষের সাথে লিখেছেন –' So much for the belief that gay man have female brains!' তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি, হয়তো ভবিষ্যৎ গবেষণা এ ব্যাপারে আরো ভালভাবে পথ দেখাবে। আরো একটি ব্যাপারও এই সাথে লক্ষ্যনীয়। নারী সমকামীদের মস্তিস্কে এ ধরণের কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সমকামী পারিবারিক ধারার খোঁজে

আমার বাবা ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। আমিও ছোটবেলায় তাই খেলতাম। এ ধরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই আমরা ঐতিহ্য হিসেবে বয়ে নিয়ে যাই, পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিখে নিয়ে। মা ভাল রান্না করলে মেয়েকেও সেই গুণ পেতে সাহায্য করেন। আবার কিছু জিনিস না চাইলেও আমাদের বহন করতে হয় জেনেটিক তথ্য হিসেবে বংশ

[8] Allen LS, Gorski RA (1992). "Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89 (15): 7199–202. doi:10.1073/pnas.89.15.7199.
[9] Scamvougeras, A., Witelson, S.F., Bronskill, M., Stanchev, P., Black, S., Cheung, G., Steiner, M., Buck, B. Sexual orientation and anatomy of the corpus callosum. Society for Neuroscience Abstracts, 1994, p 1425.
[10] Swaab DF, Zhou JN, Ehlhart T, Hofman MA (1994). "Development of vasoactive intestinal polypeptide neurons in the human suprachiasmatic nucleus in relation to birth and sex". Brain Res. Dev. Brain Res. 79 (2): 249–59.

পরম্পরায়। চোখের এবং চুলের রঙ, নাকের গঠন, শরীর স্বাস্থ্য, হৃদরোগের ঝুঁকি সহ অনেক কিছুই। সমকামিতার ব্যাপারটিও আমরা পরিবারে বাহিত হতে দেখি। কিন্তু এটা কি জেনেটিক তথ্য হিসেবে পরিবারের ধারায় বয়ে চলে, নাকি পরিবেশ থেকে শেখা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ?

বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজতে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। তারা ইতোমধ্যেই দেখেছেন একটি জনসমষ্টিতে কোন ভাই বিষমকামী হলেও অন্ততঃ শতকরা ৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে তার পরবর্তী ভাইয়ের সমকামী হয়ে জন্মাবার। কিন্তু পরিবারের একভাই সমকামী হলে অন্ততঃ ২২ ভাগ সম্ভাবনা তৈরী হয় অপর ভাইও সমকামী হবার। অর্থাৎ পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে পরিবারে সমকামী ধারা তৈরী হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ চারগুন বেড়ে যায়। কিন্তু ভাই সমকামী হলে বোন লেসবিয়ান নাকি স্ট্রেট হবে কিনা – এ সংক্রান্ত কোন সম্ভাবনার ঝোঁক পাওয়া যায়নি[11]। কোন পরিবারে বোন সমকামী (লেসবিয়ান) হলে, অপর বোনেরও সমকামী হবার প্রবণতা দ্বিগুন বেড়ে যায়, কিন্তু ভাইয়ের উপর এর কোন সম্ভাব্যতার প্রভাব জানা যায়নি[12]।

যমজদের নিয়ে পরীক্ষা করেও কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে রিচার্ড সি পিল্লার্ড এবং জেমস ডি ওয়েইনরিচ তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন সমকামিতার ধারাটি সম্ভবতঃ জেনেটিক তথ্য হিসেবে প্রবাহিত হয়। তারা দেখালেন যে, সদৃশ যমজদের (identical twins) ক্ষেত্রে এক ভাই সমকামী হলে অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অপর ভাইও সমকামী হবার। আর অসদৃশ যমজদের (fraternal twins) ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা থাকে চব্বিশ ভাগের মত। এরপর থেকে অন্ততঃ পাঁচটি যমজদের নিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার খবর লিপিবদ্ধ হয়েছে[13]। ১৯৯১ সালে তাদের একটি গবেষণা থেকে জানা যায় সমকামী প্রবণতা সদৃশ যমজ দের মধ্যে ৫৭ ভাগ, অসদৃশ যমজ দের মধ্যে ২৪ ভাগ, এবং অযমজদের মধ্যে ১৩ ভাগ সমকামীভাবাপন্ন হয়ে থাকে[14]। একইভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারী সমকামিতার প্রবণতা সদৃশ যমজে থাকে শতকরা ৫০ ভাগ, অসদৃশ যমজে থাকে ১৬ ভাগ, এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে থাকে ১৩ ভাগ। ১৯৯৩ সালে এ ধরণের আরেকটি গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, ছেলেদের সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে আর অসদৃশ

[11] Pillard RC, Weinrich JD., Evidence of familial nature of male homosexuality, Arch Gen Psychiatry. 1986 Aug;43(8):808-12.
[12] Bailey JM and Benishay DS, Familial aggregation of female sexual orientation, Am J Psychiatry 1993; 150:272-277
[13] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.
[14] Bailey JM, Pillard RC, A genetic study of male sexual orientation., Arch Gen Psychiatry. 1991 Dec; 48 (12) pp1089-96..

যমজদের ক্ষেত্রে সেটা ২৯ ভাগ[15]। একইভাবে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সদৃশ যমজের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮ ভাগ সমকামী হয়, আর অসদৃশ যমজের ক্ষেত্রে সেটা মাত্র ৬ ভাগ[16]।

উপরের জরিপ গুলো সবই ছিল আমেরিকার। ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডে এই ধরণের একটি জরিপ চালানো হয়। সেখানকার জরিপেও প্রায় একই ধরণের ফলাফল বেরিয়ে আসে, যদিও সংখ্যাটা অনেক কম। সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.৫ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে[17]। অস্ট্রেলিয়ায় একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে জরিপ চালানো হয়েছে। সেখানে অন্যান্য পদ্ধতির মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যমজ সহোদর বাছাই করা হয়নি, বরং বাছাই করা হয়েছে নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাদের জরিপ থেকে যে ফলাফল এসেছে তা হল – সেখানে সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ০ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে; সদৃশ মেয়ে যমজদের শতকরা ২৪ ভাগ লেসবিয়ান হয় এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে সেটা প্রায় ১১ ভাগ[18]।

উপরের পরীক্ষাগুলোর শানে নজুল কি দাঁড়ালো তা হলে? পরীক্ষাগুলো থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট ; সদৃশ যমজে দুই ভাইই সমকামী হবার সম্ভাবনা অসদৃশ যমজের দ্বিগুন পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে সদৃশ যমজে দুই ভাইয়ের দুজনেই সমকামী হবার সম্ভাবনা শতকরা ২৫ থেকে ৫০, এই ফলাফল নির্ভর করে কিভাবে বা কোথায় পরীক্ষা করা হচ্ছে তার উপর। তার মানে জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি আমরা ২৫ থেকে ৫০ বলে রায় দেই, তবে পরিবেশ এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরের প্রভাব ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ থেকেই যাচ্ছে।

এমনকি সদৃশ যমজদের দুই ভাইয়ের মধ্যেই সমকামিতা পাওয়ার যে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি ‘জেনেটিক’ বলে ভাবা হচ্ছে, সেই দাবীও কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটাও খোলা মনে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। দুই সদৃশ যমজ ভাই সাধারণতঃ একই পরিবেশে একই ভাবে বড় হয়, এবং একজনের পছন্দ, অপছন্দ অভিরুচি অনেক সময় অপরজনকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই, যে কেউ দাবী করতেই পারে যে, সদৃশ যমজে অসদৃশ যমজদের চেয়ে অধিক হারে সমকামী ভাতৃযুগল পাওয়া যাচ্ছে, এর কারণ ‘অভিন্ন জিন’ নয়, বরং তাদের বেড়ে উঠার ‘অভিন্ন পরিবেশ’। থিওডোর লিজ নামে এক

[15] Frederick L. Whitam, Milton Diamond and James Martin, Homosexual orientation in twins: A report on 61 pairs and three triplet sets, Archives of Sexual Behavior, 22(3), 1993, pp 187-206.
[16] Bailey J M; Pillard R C; Neale M C; Agyei Y Heritable factors influence sexual orientation in women. Archives of general psychiatry 1993;50(3):217-23
[17] M King and E McDonald, Homosexuals who are twins. A study of 46 probands, The British Journal of Psychiatry 1993, 160: 407-409.
[18] Bailey, J. M., & Martin, N. G. A twin registry study of sexual orientation. Paper presented at the twenty-first annual meeting of the International Academy of Sex Research, Provincetown, MA, 1995.

মনোবিজ্ঞানী এই ব্যাপারটি উল্লেখ করে তার প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিলেন একটি জার্নালে[19]। এ উদাহরণটি আমাদের সামনে এ ধরণের পরীক্ষার জটিলতা স্পষ্ট করে তুলে। ফ্রয়েড যে কথাটা অনেক আগেই বলেছিলেন একটু অন্য ভাবে, সে কথাটাই হয়ত সত্য হয়ে ফিরে আসছে –

> 'সমকামিতার ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো গভীর। ... কারণ [সদৃশ] যমজেরা যেন আয়নার প্রতিবিম্ব হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যকার স্বকাম (narcissism) আরো বিবর্ধিত করে তুলে' ।

তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আরেক ধরণের পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি কোন সদৃশ যমজ জন্মের সময়েই আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়, এবং সেই উপাত্ত যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে হয়ত 'অভিন্ন' পরিবেশের ফ্যাক্টরটি বাদ দিয়ে শুধু জেনেটিক ফ্যাক্টর আলোচনায় আনতে পারব, এবং বলতে পারবো সমকামী প্রবৃত্তি সত্যই জেনেটিক কিনা।

১৯৮৬ সালে এ ধরণের একটি পরীক্ষার কথা জানা যায়[20]। ছয়টি সদৃশ যুগলের (চারটি ভগ্নি যুগল, এবং দুটি ভাতৃযুগল) সন্ধান পাওয়া যায় যারা আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলো, এবং যুগলদের মধ্যে একজন অন্ততঃ সমকামী। চারটি ভগ্নি যুগলের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন সদস্য ছিলেন বিষমকামী, এবং অন্যজন সমকামী। একটি ভাতৃযুগলের ক্ষেত্রে দুই ভাইই ছিলেন সমকামী। একটি 'গে বার' এ পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত এমনকি তারা একে অপরকে চিনতেনও না। আরেকটি ভাতৃযুগলের ক্ষেত্রে, দুই ভাই জন্মের পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। এক ভাই ১৯ বছর পর্যন্ত উভকামী হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন, এবং তারপর পরিপূর্ণ সমকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আর অন্য ভাই পনের থেকে আঠারো বয়স পর্যন্ত সমকামী ছিলেন, তারপর বিয়ে করে নিজেকে বিষমকামী হিসেবে সমাজে পরিচিত করেন। এই ক্ষেত্রে, অন্ততঃ সীমিত সময়ের জন্য হলেও উভয় সদস্যই সমকামিতার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেছিলো।

---

[19] Theodore Lidz, Md, Reply to 'A Genetic Study of Male Sexual Orientation', Arch Gen Psychiatry. 1993;50(3):240.

[20] ED Eckert, TJ Bouchard, J Bohlen and LL Heston , Homosexuality in monozygotic twins reared apart, The British Journal of Psychiatry, 1986, 148: 421-425

কাজেই উপরের পরীক্ষা থেকে একটি জিনিস বুঝা যাচ্ছে যে, জন্মের সময় বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া ভাতৃযুগলে সমকামিতার উন্মেষের পেছনে জেনেটিক উপাদান থাকতে পারে, কিন্তু এই জেনেটিক প্রভাব ভগ্নিযুগলে পাওয়া গেছে অনেক কম।

কিন্তু এই পরীক্ষাই শেষ কথা নয়। সমকামিতার উপর পরিবেশের প্রভাব আদৌ আছে কিনা, আর থাকলে কতটুকু – সেটা জানার জন্য আরেক ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বেইলি এবং পিল্লার্ডের ১৯৯১ সালের সেই পরীক্ষায় (আগে উল্লিখিত) দত্তক নেয়া সদৃশ যমজ সন্তানদের উপর জরিপ চালানো হয়। দেখা গেছে কোন সমকামী পরিবার বা ব্যক্তি দত্তক নিলে সেই ভাইয়ের সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠার সম্ভাবনা (১১%) অনেক বেশি থাকে বিষমকামী পরিবার দত্তক নেয়ের চেয়ে (৫%)। কাজেই এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জেনেটিক ফ্যাকটরের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবটিও থেকে যাচ্ছে পুরোমাত্রায়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে মুখ্য কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা এই মুহূর্তে আসলে সরলীকরণই হবে ।

গে জিনের খোঁজে

১৯৯৩ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের সমকামী বিজ্ঞানী ডিন হ্যামার এবং এঙ্গেলা প্যাতাউচির একটি যৌথ গবেষনাপত্র বিজ্ঞানের সম্ভ্রান্ত জার্নাল ‘সায়েন্স’- এ প্রকাশিত হয়[21]। ডিন হ্যামারের সেই গবেষণাপত্রে শুধু সমকামী ধারাই নয়, সেই সাথে সমকামিতার উৎস হিসেবে ক্রোমোজমের মধ্যকার জেনেটিক একটি মার্কারের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারটিকে পরবর্তীতে কিছু পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়া ‘গে জিন’ বলে প্রচার শুরু করে, এবং এর ফলশ্রুতিতে পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়। এই গবেষণাপত্রটি তাই খুব সতর্কভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে।

ডিন হ্যামেরের আলোচিত গবেষণাতেও আগের অন্যান্য গবেষকদের মতই পরিবারের মধ্যে সমকামী ধারা খোঁজার একটি চেষ্টা করা হয়েছে; এবং এ গবেষণা থেকেও সেই একই উপসংহার বেরিয়ে আসে – পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে সমকামী ধারা তৈরি হবার প্রবণতা বেড়ে যায় । হ্যামার তার গবেষণা থেকে যে ফলাফল পেলেন তা হল – যদি এক ভাই সমকামী হয়, তাহলে ১৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অন্য ভাইয়েরও সমকামী

[21] Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). "A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation". Science, 261 (5119): 321–7

হবার, আর ভাই সমকামী না হলে সমকামী হবার সম্ভাবনা থাকে শতকরা মাত্র ২ ভাগ। কিন্তু হ্যামার এ পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেলেন না। তিনি সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারাও বিশ্লেষণে আনলেন। আর এটা করতে গিয়েই বেরিয়ে এলো অজানা এক নতুন একটি দিক। তিনি দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাবার দিকে অর্থাৎ চাচা কিংবা চাচাতো ভাইদের মধ্যে সেরকম কোন প্যাটার্ণ পাওয়া গেল না।

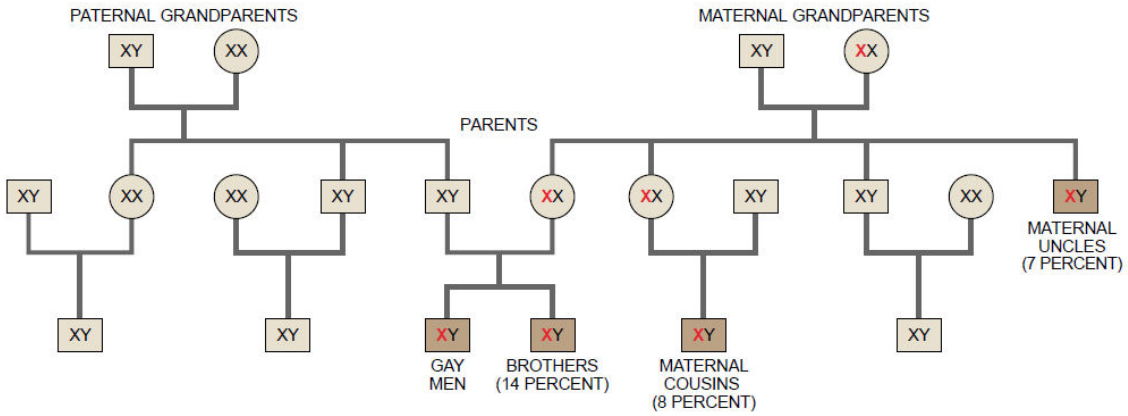

চিত্রঃ সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারা বিশ্লেষণ করে ডিন হ্যামার দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ধারণা করলেন সমকামী প্রবণতা মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়।

তাহলে এর ব্যাখ্যা কি? সমকামী প্রবণতা কি তাহলে মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়? ডিন হ্যামারের গবেষণা সে দিকেই ইঙ্গিত করে। আমরা জানি একটি ছেলের দেহে দু ধরণের ক্রোমোজম থাকে। একটি হল Y যা সে বাবার কাছ থেকে সরাসরি পায়, আর অন্যটি X ক্রোমোজম - যা সে পায় মায়ের দিক থেকে। কাজেই জেনেটিক প্রবণতা মায়ের দিক থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হবার অর্থ হচ্ছে X ক্রোমোজমে তার ছাপ থাকা। হ্যামার এবং তার গবেষক- দল জানালেন X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এটাই সমকামী প্রবণতা তৈরির জন্য দায়ী। হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে দেখলেন তাদের মধ্যে ৩৩ টি যুগলের মধ্যে এই Xq28 মার্কারের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। ৭ টিতে পাওয়া যায় নি (বিষমকামীদের ক্ষেত্রে এই মার্কারটি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে)। বলা হল যদিও নমুনাক্ষেত্র খুব একটা বড় ছিলো না, তদুপরি ৪০ জনের মধ্যে

৩৩ জনে মার্কার খুঁজে পাওয়াটা আসলেই 'স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট'[22]। এইটাই হল ডিনহ্যামারের সমকামিতা নিয়ে মাইলফলক গবেষনার সারসংক্ষেপ। তার পরীক্ষায় পাওয়া এই Xq28 মার্কারটি 'গে জিন' হিসেবে 'প্রচারের আলোয় উঠে আসে। আর অনেকেই ডিন হ্যামারের কাজকে এভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, 'ক্রোমোজমের Xq28 এলাকায় একটি জিন পাওয়া গেছে যা সমকামিতাকে ত্বরান্বিত করে'।

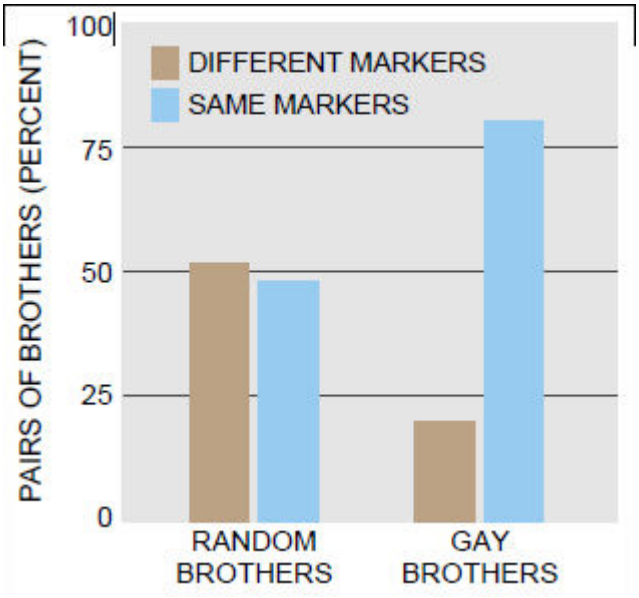

চিত্রঃ ডিন হ্যামারের হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমকামী প্রবণতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এত সহজ সরল নয়। এই ফলাফল খুব নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রথম কথা হল ৪০ টি যুগলের মধ্যে ৭ টি যুগলে এই Xq28 মার্কারটি

[22] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

পাওয়া যায়নি। সমকামিতার প্রবৃত্তি তৈরিতে যদি Xq28 মার্কার থাকা 'অত্যাবশকীয় নিয়ামক' হতো, তাহলে ৪০ টি যুগলের স্যাম্পলের সবগুলোতেই এটি পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেটা হয়নি। যদি ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে মোটামুটি ২০টিতে পাওয়া যেত, আর বাকি ২০ টিতে না পাওয়া যেত, তবে আমরা বলতে পারতাম সমকামিতার প্রবৃত্তির সাথে এই মার্কারের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেটাও হয়নি। মার্কার পাওয়া গেছে চার- পঞ্চমাংশ ক্ষেত্রে। ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে ৩৩টিতে মার্কার পাওয়ার ক্ষেত্রটি নিঃসন্দেহে ফলাফলের পারিসাংখ্যিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। ডিন হ্যামার হিসাব করে দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সম্ভাবনার নিরিখে হিসেব করলে এমনি এমনি (নির্বিচারে) এটা ঘটার সম্ভাবনা ২০০ ভাগের মধ্যে ১ ভাগেরও কম। সে হিসেবে জেনেটিক প্রভাব থাকার প্রবণতাটাকে অস্বীকার করা হয়তো যাচ্ছে না, কিন্তু এটা কখনোই শেষ কথা বলার নিশ্চয়তাও দিয়ে দিচ্ছে না। মোটা দাগে বললে, যেহেতু যমজ ভাতৃযুগলের দুজনই সব সময় সমকামী ভাবাপন্ন হয় না, সেহেতু মার্কার থাকলেই সমকামী হবে – এটা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, কোন মার্কার না থাকা সত্ত্বেও ৭ টি ভাতৃযুগলে সমকামী প্রভাব পাওয়া গেছে। তার মানে, মার্কারের সাথে কিংবা জিনের সাথে সমকামী প্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই মার্কারের সাথে জেনেটিক একটা প্রভাব আছেই, তবুও সেটি একটিমাত্র জিনের সাথে কখনোই নয়। ডিন হ্যামার নিজেই সে কথা বলেছেন এভাবে[23] –

> 'কোন একটি জিনকে (এ পরীক্ষায়) পৃথক করা যায়নি। পরীক্ষার মাধ্যমে যা করা হয়েছে তা হল - ক্রোমোজমের একটি অংশ সনাক্ত করা, যে অংশটি দৈর্ঘ্যে চার মিলিয়ন বেস যুগলের সমান। এই অংশটি সমগ্র মানব জিনোমের শতকরা ০.২ ভাগেরও ছোট, কিন্তু তারপরেও এই অংশটিতে অবলীলায় কয়েকশত জিন এঁটে যেতে পারে। এই এলাকায় নিয়ামক জিনটি খুঁজে বের করা অনেকটা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতই। সূঁচ পেতে হলে হয় আমাদের হয় আরো অনেক বেশী পরিবার দরকার হবে, অথবা সম্ভ্যাব্য সকল এলাকার ডি.এন.এ-র অনুক্রমের সম্পূর্ণ তথ্য জানা চাই'।

[23] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

হ্যামার নিজে ১৯৯৫ সালে পরীক্ষাটি পুনর্বার পরিচালনা করেন হু, পাত্তাউচি এবং অন্যান্যদের সাথে মিলে। এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয় ৩২ টি স্যাম্পল নিয়ে, এবং এর মধ্যে ২২ টি ক্ষেত্রে তিনি আগের পরীক্ষার মতই Xq28 মার্কার খুঁজে পেলেন[24]। অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারলেন যে, মার্কারের সাথে সমকামিতার একটা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া স্যান্ডার এবং প্রমুখের ১৯৯৮ সালের গবেষনায়ও ৫৪টি স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এবং এর মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে সমকামিতার সাথে Xq28 মার্কারের সম্পর্ক পাওয়া যায়[25]।

১৯৯৯ সালে ক্যানাডায় জর্জ রাইসের নেতৃত্বে গবেষকের একটি দল ডিন হ্যামারের পরীক্ষাটিই করার চেষ্টা করলেন নমুনা ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে দিয়ে। এই পরীক্ষায় সমকামী ভাতৃযুগল সংগ্রহ করার জন্য কানাডার গে ম্যাগাজিন *Xtra*তে বিশাল বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত ৪৬ টি যুগল নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। এই যুগলগুলো নির্বাচিত হয় ‘সমকামী সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী’ (gay interviewer) দের মাধ্যমে।

এই পরীক্ষায় ৪৬ টি যুগলের মধ্যে মাত্র ২০টি যুগলে মার্কার পাওয়া গেল[26], পারিসাংখ্যিক হিসেবে যা অর্ধেকেরও কম। যদি সমকামিতার সাথে মার্কারের নিশ্চিত সম্পর্ক থাকতো তবে ৪৬টির মধ্যে ৪৬টিতেই মার্কার পাওয়া যেত। তা তো হয়ইনি, বরং যদি হ্যামারের মত ‘স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট’ ৬৮% ফলাফলেরও পুনরাবৃত্তির কথা বিবেচনা করি, তবে মার্কার পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো অন্তত ৩২ টি। যদি এলোপাথাড়ি ভাবে ঘটা সম্ভাবনার হার শতকরা পঞ্চাশভাগের কথাও চিন্তা করি, তাহলেও মার্কারের সংখ্যা আসা উচিৎ ছিলো ২৩টি। কিন্তু ২০টি মাত্র মার্কার পাওয়াকে কোনভাবেই কোন ধরণের সম্পর্কে ফেলা যায় না। কাজেই অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এই পরীক্ষাটি Xq28 মার্কারের সাথে ‘গে জিন’ পাওয়ার আগের দাবীগুলোকে ভুল প্রমাণ করে দেয়[27]। ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা তার ফলাফল সম্বন্ধে উপসংহার টেনে বলেন,

> আমাদের ফলাফল হ্যামারের মূল পরীক্ষার ফলের সাথে এত পাথর্ক্য কেন তৈরি করলো তা পরিস্কার নয়। ... সে যাই হোক, আমাদের এই পরীক্ষার উপাত্ত যৌনপ্রবৃত্তির উপর Xq28 এলাকায় অবস্থিত একটি জিনের প্রভাব

[24] Hu S, Pattatucci AM, Patterson C, et al. (November 1995). "Linkage between sexual orientation and chromosome Xq28 in males but not in females". Nat. Genet. 11 (3): 248–56.
[25] Wilson, G.D., & Rahman, Q. (2005). Born Gay: The Biology of Sex Orientation. London: Peter Owen Publishers.
[26] Rice, Anderson, Risch and Ebers (1999) Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28. Science 23(5414): pp. 665-667.
[27] ‘The result demonstrates that there is no gay gene in Xq28’ (ref. Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004)।

> থাকার দাবীকে সমর্থন করে না। ... (যদিও) এই ফলাফল জিনোমের অন্য কোন জায়গায় সমকামিতার উপর জিনের প্রভাবকে বাতিল করে দেয় না।

এই 'গে জিন' পাওয়ার সাম্প্রতিক এই পরীক্ষাগত ব্যর্থতা অবশ্যই একটি ময়নাতদন্ত দাবী করে। সারা মিডিয়া জুড়ে 'গে জিন' নিয়ে এত হৈ চৈ হল, অথচ দুইটি বড় পরীক্ষায় দুই রকম ফলাফল বেরিয়ে এলো কেন? তবে কি হ্যামার পরীক্ষায় কোন বড় ভুল করেছিলেন, কিংবা ভাল ফলাফল পেতে ডেটা পরিবর্তন করেছিলেন? নাকি ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা সমকামী যুগল নির্বাচনের সময় সনাক্তকরণে ভুল করেছিলেন? এই শেষ বিচারের ফয়সলা এখনো হয়নি। হ্যামার অবশ্য ক্যানাডিয়ীয় গবেষকদের ফলাফল প্রত্যাখান করেছেন এই বলে[28] –

> 'তারা (ক্যানাডীয় গবেষকেরা) প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন গে জিন বলে কিছু নেই, এবং তাদের পরীক্ষা ছিলো পক্ষপাত দুষ্ট, কারণ পরীক্ষকের একজন প্রথম থেকেই 'গে জিন বলে কিছু নেই' - সেটা প্রমাণেই তৎপর ছিলেন। তাদের সেই (সমকামবিদ্বেষী) মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাদের পরীক্ষায়'।

তবে হ্যামার যাই বলুক না কেন গে- জিন নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছে সাধারণ মানুষ এবং নিরপেক্ষ গবেষকদের কাছে। তাদের কাছে বিষয়টি এখনো 'অমীমাংসিত মামলা'ই।

তবে 'অমীমাংসিত' বলে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এ সংক্রান্ত গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। জিনের পথ ধরে সমাধানের পথ খুঁজতে এবারে এগিয়ে এসেছে এপিজেনেটিক্স[29]। এই এপিজেনেটিক্স উপরের সমস্যার একটা আকর্ষণীয় সমাধান হাজির করছে, যা ক্রমশঃ বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তারা দেখেছেন, জিন কেবল একা একা কাজ করতে পারে না, কাজ করে পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের মিথস্ক্রিয়ায়। বৈদ্যুতিক বাতির সুইচের যেমন টার্ণ অন বা অফ করা যায়, ঠিক তেমনি পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের প্রভাবে জিনের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটে । বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মিথাইলেশন। দেখা গেছে আমাদের চারপাশের বহু কিছুই - পরিবেশ, খাদ্যাভাস, পানীয় বা ধূমপানে আসক্তি, মানসিক পীড়নসহ বহুকিছুতেই এই প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয়। এই মিথাইলেশন হয় বলেই সদৃশ যমজ ভাতৃযুগলে

[28] Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

[29] এপিজেনেটিক্স নিয়ে বিস্তারিত জানতে এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত 'মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?' অংশটি দ্রষ্টব্য।

জেনেটিক কোডে শতভাগ মিল থাকলেও তাদের আচরণে, মন মানসিকতায় কিংবা কাজকর্মে বিস্তর পার্থক্য থাকে অনেক সময়ই। মিথাইলেশনের প্রভাবে জেনেটিক কোডের একাংশ বা একাধিক অংশ টার্ণ অফ হয়ে যেতে পারে। কাজেই একই জেনেটিক কোড থাকা সত্ত্বেও জেনেটিক সুইচের টার্ণ অন বা অফের কারণে একভাই বিষমকামী, আরেকভাই হয়ত সমকামী ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এ শুধু তত্ত্ব কথা নয়, এই ধারণার স্বপক্ষে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে সভেন বকল্যান্ডের গবেষণায়। তিনি যমজ ভাইয়ের ঠিক কোন জায়গায় জিন টার্ণ অন বা অফের কারণে প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে তার হদিস এখনো না পেলেও সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, সমকামী ছেলের জন্ম দেয়া মায়ের এক্স ক্রোমোজমের সক্রিয়তা অন্য মায়েদের চেয়ে ভিন্ন হয়। [30]

কিন্তু কিভাবে একটি জিন পরিবেশের প্রভাবে সক্রিয় বা অক্রিয় হয়ে যায়? একটি ভাল উদাহরণ হতে পারে স্ট্রেস হরমোন করটিসোল। ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কর্টিসোল স্থায়ীভাবে জিনের একাংশকে নিষ্ক্রিয় (turn off) করে দিতে পারে, এবং এর ফলে ইঁদুরের স্বভাবে পরিবর্তন ঘটে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা একই রকম ফলাফল লক্ষ্য করেছেন। তারা দেখেছেন, মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানবদেহে এই হরমোনের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। চাপময় পরিবেশে বেশি দিন কাটালে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায় – ফলে দেহ সহজেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় সে সময়। কিন্তু 'ধান ভানতে শীবের গীতের মত' এই কর্টিসোল নিয়ে পড়ে যাওয়া হল কেন? এই স্ট্রেস হরমোনের সাথে সমকামিতার কি কোন সরাসরি সম্পর্ক আছে? বিজ্ঞানীরা বলেন, থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জার্মান ডাক্তার গান্টার ডর্নারের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপময় পরিবেশে যে সমস্ত মা গর্ভবতী হয়েছিলেন, তাদের সন্তানদের একটা বড় অংশ নাকি সমকামী হিসেবে গড়ে উঠেছিলো ইতিহাসের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি[31]। এমনকি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যে সমস্ত ইঁদুরেরা গর্ভের সময় চাপময় পরিবেশে দিন কাটায়, তাদের সন্তানের মধ্যে পরবর্তীতে সমকামিতার আধিক্য তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। অনেক সময় আবার বিভিন্ন এলার্জিক প্রতিক্রিয়ায় দেহে টেস্টোসটেরোন হরমোনের (পুরুষ হরমোন) প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যায়। যে সমস্ত মায়েরা সারা জীবনে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের ক্ষেত্রে শেষের দিককার সন্তানদের জন্মের সময় এ ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে জানা গেছে। রে ব্ল্যানচার্ডের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কোন পরিবারে বড় ভাই থাকলে তার পরের ভাইদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি তৈরী করার সম্ভাবনাকে শতকরা ২৮ থেকে ৪৮ ভাগ

[30] Bocklandt S, Horvath S, Vilain E, Hamer DH (February 2006). "Extreme skewing of X chromosome inactivation in mothers of homosexual men". Hum. Genet. 118 (6): 691–4.
[31] Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Harper Perennial, 2003.

বাড়িয়ে দেয়[32]। অর্থাৎ, একটি পরিবারে বড় ভাইদের সংখ্যা যত বেশী হবে, তত বেশি হবে পরবর্তী সন্তানের সমকামী হবার সম্ভাবনা (একে জনপ্রিয়ভাবে 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়)। কারণ দেখা গেছে, যত বেশি সন্তানের জন্ম হয়, তত বেশি মায়ের টেস্টোসটেরোন হরমোনের প্রতি এলার্জিক প্রতিক্রিয়াও বাড়তে থাকে। হরমোন নিয়ে এই সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোন কিছুই আসলে নিশ্চিত নয়। বহু মহিলাই আসলে বিভিন্ন সময়ে চাপযুক্ত পরিবেশে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের সবার সন্তান বড় হয়ে সমকামী হয়। আমার নিজের জন্মও হয়েছিলো একাত্তরের দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে, আমার বাবা যখন দেশের সীমান্তে ছিলেন যুদ্ধরত। এমন পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়েও কিন্তু আমি সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠিনি। কিংবা আমার জন্মের কারণে কোন 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' আমার ছোট ভাইয়ের উপরও পড়েনি । এমন উদাহরণ চারপাশে অজস্রই আছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় সমকামী সন্তানের জন্মদেয়া মায়েদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিষমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার তুলনায় সমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার সময়টিতে কি তারা অধিক চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে ছিলেন কিনা। তাদের মতামত থেকে এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি যে, সমকামী সন্তানের জন্মের সময় কোন চাপময় পরিস্থিতি তারা অতিবাহিত করেছিলেন[33]। কাজেই মায়ের মানসিক চাপের সাথে সন্তানের সমকামিতার কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আসলে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। এ ছাড়া, গান্টার ডর্নারের মূল পরীক্ষার ' উদ্দেশ্য' ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মহলে। গান্টার তার গবেষণাপত্রে সমকামিতাকে ' মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব' (psychic disability) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ' অদূরভবিষ্যতে সমকামিতার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে' । তার এই মনোভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলেই তুমুল প্রতিবাদ হয়েছে, তার সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনমানসিকতাকে ইতিহাসের কলঙ্কজনক ইউজিনিক্সের (eugenics) সাথেও তুলনা করা হয়েছে।

গে জিন নিয়ে মিডিয়ায় এত ঔতসুক্যই বা কেন?

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও রাজনৈতিক একটা মতাদর্শগত লড়াই যে চলছে তার প্রভাব কিছুটা হলেও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতেও পড়ছে। রক্ষণশীল সমাজের চাপে সাড়া দুনিয়া জুড়েই সমকামীদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়তে হচ্ছে। এই সমকামী অধিকার

[32] Blanchard, R. (1997). Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males and females. Annual Review of Sex Research, 8, 27-67.
[33] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press, 1996

কর্মীদের অনেকেই ভাবেন, যদি কখনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে সমকামী প্রবণতা জৈবিকভাবে অঙ্কুরিত হয় –সেটা সমকামীদের দাবী আদায়ের জন্য অনেক উপকারে আসবে। কারণ, তারা তখন আরো বলিষ্ঠভাবে মানুষজনকে বোঝাতে পারবেন যে, ‘সমকামীরা জন্মগতভাবেই সমকামীপ্রবণতা নিয়ে জন্মায়’, এতে তাদের কোন ‘দোষ’ নেই। ‘এডভোকেট’ নামে একটি মার্কিন গে এবং লেসবিয়নদের পত্রিকায় এ নিয়ে ১৯৯৬ সালে একটি জরিপ চালান হয়, সেখানকার শতকরা ৬১ ভাগ পাঠক মত দিয়েছিলো যে, ‘যদি সমকামিতার পেছনে কোন জেনেটিক কারণ আছে বলে জানা যায়, সেটা তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে’[34]।

তবে এই দলের মধ্যে বিপরীত মতও আছে। যদি সমকামী প্রবণতা ‘জেনেটিক’ বলে প্রমাণিত হয়, তবে একে ‘জেনেটিক রোগ’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেবার প্রবণতাও হয়তো বৃদ্ধি পাবে। এ ধরণের ভয় থেকে অনেকে আবার জিনের সাথে সম্পর্ক না পাওয়া গেলেই বরং ভাল বলে মনে করেন। তারা আশঙ্কা করেন আগে ডাক্তারেরা যেভাবে সমকামিতাকে ‘মানসিক ব্যাধি’ হিসেবে চিহ্নিত করে নানা উপায়ে রোগমুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন, সেরমকম প্রবণতা হয়তো জেনেটিস্টদের মধ্যেও ভবিষ্যতে দেখা যাবে; তারা হয়ত হান্টিংটন ডিজিজ, আলসাইমার্স, মাইগ্রেন, সিকেল সেল এনিমিয়ার মত সমকামিতাকেও জেনেটিক রোগ হিসেবে দেখিয়ে তার চিকিৎসার দাওয়াই তখন বাৎলে দিতে চাইবেন। Xq28 এলাকার ঠিক পাশেই ক্রোমোজমের ভিন্নতার কারণে *অকুলার এলবেনিজম* এবং *মেনকিস ডিজিস* নামে দুটি দুর্লভ জেনেটিক রোগ তৈরি হয় বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন। সমকামিতাও কি সে ধরণের কোন জেনেটিক রোগ? এর জবাব আমরা খুঁজতে চেষ্টা করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

[34] "it would mostly help gay and lesbian rights if homosexuality were found to be biologically determined"; The Advocate (1996, February 6). Advocate Poll Results. p. 8.

দশম অধ্যায়

সমকামিতা ও মানবাধিকার

বিজ্ঞানমনস্ক প্রগতিশীল মননই পারে সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে। ইতিহাসের পাতা থেকে আমরা দেখেছি অধিকার- বঞ্চিত অসহায় মানুষেরা কিভাবে দাবী আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে। একটা সময় নারীদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। তাদের ছিলো না কোন ভোটাধিকার। একইভাবে পাশ্চিমে একটা সময় কালো মানুষদের অধিকার ছিলো না সাদা চামড়ার মানুষদের সাথে এক যানবাহনে উঠবার, কিংবা একই ভোজনসভায় যোগদানের। সাদা কালো বিয়ে তো ছিলো চিন্তারও বাইরে। কিন্তু মানুষই পেরেছে এই সমস্ত পুরোনো নিয়মগুলো উপড়ে ফেলে মানবিকতা প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতবর্ষেও একটা সময় দলিত এবং শূদ্রদের একঘরে করে রাখা হতো বর্ণাশ্রমের নামে। তাদের হাতের ছোঁয়া লাগলেই গঙ্গাজলে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। চাকরী বাকরী সহ নানা জায়গায় তো হেনস্তা আর বঞ্চনা ছিলোই। এখনো যে পরস্থিতি পুরোপুরি বদলেছে তা নয়, কিন্তু তারপরও আগের মত আর নির্বিচারে অত্যাচার করা অনেকক্ষেত্রেই আর সম্ভব হয়না। আসলে সারা বিশ্ব জুড়ে সংখ্যালঘুরা তাদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সমকামীরা আজকের বিশ্বে সংখ্যালঘু, খুব প্রকটভাবেই সংখ্যালঘু। আমাদের মত দেশ গুলোতে তো বটেই, সাড়া বিশ্বেই মোটামুটি তাদের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাদের গায়ে ‘বিকৃত রুচির’ তকমা এঁটে দেয়া তো হচ্ছেই, অনেক দেশেই তাদের দাঁড়াতে হচ্ছে আদালতে। অভিযুক্তদের ওপর ক্রমাগত এবং যত্রতত্র চলছে নির্যাতন। কখনোবা রাষ্ট্রীয়ভাবেই দেয়া হচ্ছে মৃত্যুদন্ড কিংবা নির্বাসন। সমকামীদের একটা বড় অংশকেই সেজন্য লুকিয়ে থাকতে হয়, তাদেরকে শিখে নিতে হয় বিষমকামী হিসেবে জীবন যাপনের অভিনয়ের, কিংবা সামাজিকভাবে অভ্যস্ত হতে হয়ে ‘বিবাহিত জীবন যাপনে’। ১৯৫১ সালে ডোনাল্ড ওয়েবস্টার কোরি ‘দা হোমোসেক্সুয়াল ইন আমেরিকা’ নামের ইতিহাস- প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রথমবারের জন্য যে কথাগুলো বলেছিলেন, সেগুলো এমনকি আজকের দিনের সমাজের জন্যও খুবই প্রাসঙ্গিক [1] –

[1] Donald Webster Cory, The Homosexual in America: A Subjective Approach, Ayer Co Pub.

> ‘We who are homosexuals are a minority, not only numerically, but also as a result like status in society… Our minority status is similar, in variety of respects, to that of national, religious and other ethnic groups: in the denial of civil liberties; in the legal, extra-legal and quasi-legal discrimination; in the assignment of an inferior social position; in the exclusion from the mainstream of life and culture’

যদিও প্রেক্ষাপট বিচারে ১৯৫১ সালের সাথে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক, তারপরেও সংখ্যালঘুর তকমা সমকামীদের গায়ে কিন্তু রয়েই গেছে – কি পূবে, কি পশ্চিমে। আর রক্ষণশীল সমাজে তো সমকামীদের অস্তিত্ব স্বীকারই করা হয়না একেবারে। খোদ ইরানেই ১৯৭৯ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ৪০০০ ব্যক্তিকে সমকামিতার অযুহাতে হত্যা করে হয়েছে[2]। পশ্চিমা 'উন্নত বিশ্বে' মানবাধিকার হয়তো এরকম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের পর্যায়ে আর নেই, কিন্তু তারপরেও সমকামী এবং রূপান্তরকামীরা যে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তিতে বসবাস করতে পারছে তা বলা যাবে না। আমেরিকার প্রায় চল্লিশটি রাজ্যে সমকামীদের কোন কারণ না দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালের একটি জরিপে পাওয়া গিয়েছে যে, কর্মচারীদের মধ্যে কোন সমকামী থাকলে শতকরা প্রায় ১৮ শতাংশ ম্যানেজার তাকে চাকুরি থেকে বহিস্কার করবেন, শতকরা প্রায় ২৭ শতাংশ ম্যানেজার চাকুরীতেই তাকে নেবেন না, আর শতকরা ২৬ ভাগ তাকে কোন রকম প্রমোশন দেবেন না[3]। ১৯৮৪ সালে আমেরিকার একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিলো যে সমকামীপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীরা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অন্ততঃ পাঁচগুন বেশি স্কুল থেকে ঝরে পড়ে, কারণ তারা সবসময়ই নিরাপত্তাজনিত আতঙ্কে ভোগে[4]। ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় এখনো প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ লোক মনে করে সমকামিতা হচ্ছে ‘পাপ’, এবং ৫৯ ভাগ মনে করে এটি নৈতিক দিক দিয়ে অপরাধ, ৪৪ ভাগ মনে করে সমকামী সম্পর্ককে অবৈধ ঘোষণা করা উচিৎ[5]। আর এ সবের বাইরে তো নিগ্রহ, নির্যাতন এবং ক্ষেত্র বিশেষে হত্যার উদাহরণ তো কমবেশি আছেই। ২০০৩ সালের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় শুধু সেই বছরেই ছয় জন পুরুষ এবং নারীকে সমকামিতার অযুহাতে মেরে ফেলা হয়েছিলো।

তবে সাম্প্রতিক কালে বিশ্বকে সবচেয়ে আলোড়িত করেছে আমেরিকায় ম্যাথু শেফার্ড নামের ২১ বছর বয়সী এক ছাত্রকে হত্যার ঘটনা। ওয়াইমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্র

---

[2] Violence against LGBT people, From Wikipedia, the free encyclopedia,
[3] A survey of 191 employers revealed that 18% would fire, 27% would refuse to hire and 26% would refuse to promote a person they perceived to be lesbian, gay or bisexual. --Schatz and O'Hanlan, "Anti-Gay Discrimination in Medicine: Results of a National Survey of Lesbian, Gay and Bisexual Physicians," San Francisco, 1994.
[4] National Gay and Lesbian Task Force, "Anti-Gay/Lesbian Victimization," New York, 1984.
[5] The Advocate, Feb 4, 1997.

১৯৯৮ সালের ৭ই অক্টোবর রাতে বার থেকে ফেরার পথে পরিচয় ঘটে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র জেমস ম্যাককিনি এবং রাসেল হ্যান্ডারসনের। ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন তাদের গাড়ীতে করে ম্যাথু শেফার্ডকে ছাত্রাবাসে পৌঁছে দেবার নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের গাড়ীতে উঠায়। গাড়ীতে উঠার পর যখন ম্যাককিনি এবং হ্যান্ডারসন জানতে পারে যে ম্যাথু শেফার্ড সমকামী, তখন তারা ম্যাথুর উপর চড়াও হয়, পিস্তলের বাট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে, মারধোর করে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রাস্তায় অচেতন অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। তারপর তারা অচেতন ম্যাথু শেফার্ডের কাগজপত্র থেকে পাওয়া ঠিকানা দেখে গাড়ী নিয়ে ম্যাথু শেফার্ডের বাড়ী লুট করে। প্রায় আঠারো ঘন্টা পরে ম্যাথুকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী হাসপাতালে নেয়া হয়। ম্যাথু তখনো মারা যননি, কিন্তু অচেতন ছিলেন। ডাক্তারের রিপোর্টে দেখা গেলো তার মস্তিস্কের একটা বড় অংশ (ব্রেন স্টেম) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার হৃৎপিন্ডের সঞ্চালন, তাপমাত্রা ইত্যাদিও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। তাকে কৃত্রিম জীবন সঞ্চালন যন্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হল। কিন্তু ম্যাথুর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৮ সালের ১২ই অক্টোবর ম্যাথুকে ডাক্তাররা মৃত ঘোষণা করলেন। ম্যাথুর এই ঘটনার প্রভাব পড়ে সারা আমেরিকা জুড়ে। প্রতিবাদের ঝড় উঠে সমকামী অধিকার সংগঠন গুলোর তরফ থেকে। এই একবিংশ শতকেও কেবল সমকামী হবার কারণেই ম্যাথু শেফার্ডকে যেভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে, সেটি আসলে কল্পণাকেও হার মানায়।

আর আমাদের দেশে তো সমস্যা আরো ভয়াবহ। যদিও নিরপেক্ষ গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে সারা দেশে ৬ থেকে ১২ মিলিয়ন সমকামীর অস্তিত্ব রয়েছে[6], তারপরেও সেখানে বলতে গেলে সমকামীদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়। কারণ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় আইনে এটাকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য করা হয়, এই অপরাধের শাস্তি ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড[7] - যদিও এই আইনের ব্যাপক প্রয়োগ দেশে খুব একটা লক্ষ্যনীয় নয়। এর কারণ, সমকামীরা নিজেদের যৌনপ্রবৃত্তিকে সাধারণতঃ প্রকাশিত হতে দেয় না। সামাজিক বাধার কারণেই এটি ঘটে। একটা উদাহরণ দেই। আমার খুব কাছের এক পরিচিত বন্ধু ছিলো সমকামী। কিন্তু কখনোই আমি তা জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম অস্ট্রেলিয়া চলে গেছে। এখন থাকছে এক সমকামী পার্টনারের সাথে। তার এই সমকামী প্রবৃত্তির কথা আমি দেশে থাকতে জানতেও পারিনি। আমি নিঃসন্দেহ অনেকেই এ ধরণের কম বেশী ঘটনার সাথে সম্যক পরিচিত। দেশে অধিকাংশ সমকামীদের আসলে লুকিয়ে থাকতে হয়, কিংবা অন্য সবার মত বিবাহিত জীবন- যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। যারা এটা পারেন না, তারা

[6] Afsan Chowdhury's report in Himal Magazine, May 2004; republished in Mukto-Mona : http://www.mukto-mona.com/Articles/tapan_rabi/gay_bangla210106.htm

[7] According to Article 377（Section 377 of the Penal Code） private, adult homosexual sex acts are illegal and will be punished with deportation, fines and/or up to 10 years, sometimes life imprisonment.

অনেকে অবিবাহিতই থেকে যান। আমাদের মুক্তমনা সাইটে বছর কয়েক আগে পিঙ্কু নামে এক ভদ্রলোক তার নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি বিশ্লেষণধর্মী লেখা লিখেছিলেন, তার প্রবন্ধের শিরোনাম ছিলো 'Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh'। তার সেই প্রবন্ধটির উপসংহার ছিলো এরকম[8] –

> আমি বহু সমকামী লোকজনদের জানি যারা বিয়ে করে স্ত্রী- পুত্র- কন্যা নিয়ে সংসার করে চলেছেন। অধিকাংশ সময়েই তারা জীবনভর গোপনীয়তা অবলম্বন করে কাটান। তারা এমনকি তাদের খুব ঘনিষ্ট জন – স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, অভিভাবক, সন্তান – সবার থেকেই নিজের প্রবৃত্তি সারাটা জীবন ধরে গোপন করে চলতে বাধ্য হন। আসলে তারা বেড়ে উঠেন একদম একাকী হয়ে। তাদেরকে কেউ জানে না, যদিও চেনে তাদের সবাই। অন্ততঃ এভাবেই আমাদের সমাজ তাদেরকে চিনতে চায়।

হিমেল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত আফসান চৌধুরীর রিপোর্টে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়[9] –

> Being gay in Bangladesh isn't easy because society responds differently to sexuality in public and in private … People involved with gay issues say that between 5 to 10 percent of the population is homosexual. That would mean at least 6 to 12 million Bangladeshis, more than the total population of many countries, prefer the same sex. Even if that estimate is considered to be on the higher side and is reduced by half, the number left would still be significant … One of the reasons that homosexuality is treated so gingerly is that the country's Criminal Code decrees sodomy (homosexuality or advocacy of the same) a crime which is punishable with a jail sentence … Demonstration of homosexual tendencies for short periods is quite common in Bangladeshi society. Those practising it are not ostracised, although if caught, are ridiculed …

'নিভৃত সমকামী'দের বেদনাময় জীবন কাহিনী অনেকসময় কেবল ব্যঙ্গ- বিদ্রুপে সীমাবদ্ধ থাকে না। সমকামী প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়লে অনেক সময় পরিবারের পক্ষ

[8] Pinku, Dhaka Diary: Gays and Lesbians: the hidden minorities of Bangladesh; http://www.mukto-mona.com/Articles/pinku/gay_bd.htm

[9] Afsan Chowdhury's report in Himal Magazine, পূর্বোক্ত।

থেকেই নেমে আসে নির্যাতন এবং নিপীড়ন। যেমন, ইন্টারনেটে গে- বাংলা ইয়াহুগ্রপের কো- মডারেটর জন এশলের - এর একটি মর্মন্তুদ ইমেল প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে[10] । ইমেইলটি এরকম -

প্রিয় বন্ধুরা,

আশা করি তোমরা ভাল আছ, কিংবা অন্ততঃ ভাল থাকার অভিনয় করে যেতে পারছ। আমি জন, বাংলাদেশের *ব্যাগ* (বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গে' স) - এর কো- মডারেটর। আমি সমকামী এবং এজন্য আমি গর্বিত। কিন্তু আমি মোটেই সুখি নই। কারণ আমার বাসার সবাই আমার সমকামী প্রবৃত্তির ব্যাপারটা জেনে গেছে। তারা প্রথমে এ ব্যাপারটিতে তেমন গা করেনি। কিন্তু ধীরে ধীরে তাদের মুখোশ খুলে গেছে। আমি তোমাদের গ্রুপে বেশ অনেকদিন হল লিখতে পারছি না। কারণ আমাকে আমার পরিবার থেকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়েছে। আমি আহত হয়েছি। নিরূপায় হয়ে আমি একদিন পুলিশ স্টেশনে গেলাম। কিন্তু পুলিশ কোন কেস ফাইল করতে কিংবা জিডি করতে দেয়নি। আমাকে উলটো বলল - ' তুমি তো দেখছি একটু মেয়েলী ধরণের। ঠিক করে বল - তুমি কি কোতি[11], ড্রাগসেবী নাকি বেশ্যা? আমরা তোমাকে কোন ফাইল- টইল কিংবা জিডি করতে দেব না। এগুলো তোমাদের মামুলী পারিবারিক ব্যাপার। এ সমস্ত ফালতু বিষয়াদি নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনা। ' তারপর তারা আমার বাবাকে ফোন করে বলল আমাকে বাসায় (মানে নরকে) নিয়ে যেতে। বাসায় নিয়ে যাওয়ার পথেই আমার বাবা, মা বোন এমনকি আমার ছোটভাই পর্যন্ত আমাকে মারতে শুরু করে। আমি হয়তো মরেই যেতাম যদি না আমার পাশের বাসার এক বন্ধু এসে বাঁচাতো। এখন আমার অবস্থা একটু ভালর দিকে। তারা আমাকে এখন বলছে বাসা ছেড়ে চলে যেতে। আমাকে সাত দিন সময় দিয়েছে বাসা ছাড়ার। আমার পার্টনার এ দেশে থাকে না। সুতরাং সে এ ব্যাপারে একেবারেই নিরূপায়। এখন আমাকে তোমরা বল - সমকামী মানে কি সুখি নাকি অসুখি? তোমাদের মধ্যে কি কেউ বলতে পারে, কবে এই গৃহস্থালীর অত্যাচার আর নিপীড়ন বন্ধ হবে? কখন আমরা সোনার বাংলা আর গে- বাংলা পাব, বলতো? বন্ধুরা, আমাদের অনেক পথ যেতে হবে। আমাদের যাত্রা কিন্তু শেষ হয়নি বরং কেবল

[10] Ashok DEB, A text book case how sexuality is enforced upon in Bangladeshi society,
[11] ভারতে এবং বাংলাদেশে পুরুষ রূপান্তরকামীদের চলতি ভাষায় বলা হয় কোতি।

> শুরু, এবং আমরা এখনো আমাদের গন্তব্য কোথায় তা জানি না। বন্ধুরা তোমরা নিজেদের যত্ন নিও, আর ভাল থাকার অভিনয় করে যেও এমনকি তোমার নিজের পরিবার, সমাজ, ধর্ম এবং রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হবার শেষ সময়গুলোতেও। এখন যাই। তোমাদের পিঙ্ক স্যালুট,
>
> সলিডারিটি
> জন, কোমডারেটর।

এই একটি মাত্র ইমেইল থেকেই সমকামী হবার যন্ত্রণাটুকু অনুভব করা যায়। এ ধরনের বহু ঘটনা যে আমাদের অগোচরেই থেকে যায়, তা বোধ হয় না বলে দিলেও চলবে।

বিচ্ছিন্নতা এবং আত্মহনন

সামাজিক নির্যাতন এবং নিপীড়নের পাশাপাশি কয়েকটি বিষয় সমকামীদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা হল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা, বিষন্নতা এবং আত্মহনন। ব্যাপারটি সব দেশের জন্যই কমবেশী প্রযোজ্য। আমাদের মত দেশগুলোতে এটি আরো বেশি। সমকামিতা, রূপান্তরকামিতা এবং সর্বোপরি জেন্ডার ইস্যু নিয়ে আমাদের সমাজে কোন স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় সমকামীদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। কৈশরের গোড়া থেকেই সমস্যা শুরু হয়। এ সময় সে লক্ষ্য করে যে, সমবয়সী অন্যান্য বন্ধুদের মত সে নারীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে না, করে ছেলেদের প্রতি। অপরদিকে একজন রূপান্তরকামী ছেলের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের আচরণ অনুকরণ করার তীব্র স্পৃহা জাগে। ছেলের আচরণ ও পোষাকপরিচ্ছদের মধ্যে বিপরীতলিঙ্গের ভাব ফুটে ওঠায় মা- বাবা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েন, নানা ভাবে তাকে বিরত রাখতে চান। সমগ্র আচরণের মধ্যে মেয়েলীভাব প্রকট হয়ে উঠায় সহপাঠী এবং সহযোগীদের কাছ থেকে ক্রমান্বয়ে আসতে থাকে নানারকমের ব্যংগ- বিদ্রুপ এবং লাঞ্ছনা। পরবর্তীকালে এর থেকে তৈরী হয় নানা ধরণের ট্রমা। এই ট্রমাই তৈরী করে নানা ধরণের মানসিক সংকটের বীজ। ধীরে ধীরে তারা অন্তর্মুখী হতে থাকে। তারপর একটা সময় যখন শরীরে এবং মনে যৌনতার উন্মেষ ঘটতে থাকে তখন মানসিক পরিস্থিতি হয় আরো ভয়াবহ। এই সময় তার সমলিঙ্গের মানুষের সাথে মিলিত হবার বাসনা জাগে। সংখ্যাগরিষ্টরা যেখানে বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি দেদারসে আসক্ত এবং আকর্ষিত হয়ে চলেছে, সেখানে নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে দেখে মুষড়ে পড়ে। ভাবে, তার নিশ্চয় শরীরে বড় কোন অসুখ আছে,

ফলে তার যৌন চাহিদা আর দশটা মানুষের মত নয়। জন্ম হয়ে সংশয়ের তারপরে হীনমন্যতার। মূলস্রোতের বিষমকামী জীবনে অভ্যস্ত সকলের থেকে অনেক সময়ই কথা চেপে যেতে বাধ্য হয়।

ধরা যাক, কলেজের সামনে অন্যান্য বন্ধুদের সাথে মিলে চায়ের স্টলে বসে আড্ডা মারছে। এমনি সময় স্টলের সামনে দিয়ে কোন সুন্দরী মেয়ে হেটে গেলো। আর সাথে সাথেই শুরু হল মেয়েটিকে নিয়ে দলের মধ্যে তুমুল আলোচনা। কিন্তু সমকামী ছেলেটি ওই দলের মধ্যে থেকেও আলোচনায় অংশ নিতে অক্ষম । সে অন্য সবার মত পারে না ওই চলে যাওয়া তন্বী তরুনীর দেহ- যৌষ্ঠব নিয়ে বাকী সদস্যদের মতো আমোদিত হতে। হয়তো সে আমোদিত হয় দলেরই অন্য একটি ছেলেকে দেখে। কিন্তু নিজের এই ' অস্বাভাবিক' ভাল লাগার কথাটি সে কখনোই বলে উঠতে পারে না। আর এই না-পারা থেকে তৈরী হয় ভয়াবহ অন্তর্দ্বন্দ্বের। সৃষ্টি হয় নানা রকম মানসিক সংকট। ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বোধ জেগে উঠে। মানসিকভাবে সে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে আসে বিষন্নতা। নিজের যৌনপরিচয়ের তীব্র সংকট তাকে বিষন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এর উপর মড়ার উপর খারার ঘা হয়ে নেমে আসে পারিবারিক বঞ্চনা, উপেক্ষা, অবহেলা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে নির্যাতন।

নিজের যৌনপরিচয়ের সংকট এবং তার পাশাপাশি কাছের মানুষ এবং সমাজের নেতিবাচক মনোভাব এবং অবমাননাকর পরিস্থিতি তাকে নিদারুণ বিষন্নতার মধ্যে ডুবিয়ে দেয়। আর এই বিষণ্নতার পথ ধরে শেষ পর্যন্ত আসে আত্মহননের চিন্তা, অন্ততঃ অনেকের মধ্যেই। প্রতিবছর আমেরিকাতে গড়ে পাঁচ হাজার লোক আত্মহত্যা করে, আর এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ শতাংশই সমান্তরাল যৌনতার মানুষ। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এ রিপোর্টে[12] এর উল্লেখ পাওয়া যায়। সমান্তরাল যৌনতার মানুষেরা সামাজিক অবহেলার কারণে বিষন্ন এবং উদ্বিগ্ন থাকে তা এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। রিপোর্টে আরো উল্লেখ হয় যে, কৈশোর এবং যৌবনেই সমকামীরা সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করে। এর কারণ সহজেই অনুমেয় এবং উপরের আলোচনাতেও এ নিয়ে বেশ কিছু ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য এ রিপোর্টটি সহজে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়নি। মার্কিন আইনসভার রিপাবলিকান দলের সদস্যরা এই রিপোর্টটি যাতে প্রাকাশিত না হয়, তার জন্য নানা রকমের চেষ্টা করেছিলেন। সে সময় চাপে পড়ে তৎকালীন বুশ প্রশাসন এই রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়[13]। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সমালোচনামূলক লেখা

[12] Report of the Secretary's Task Force on Youth Suicide, 1989

[13] In 1989, the U.S. Department of Health and Human Services issued a stunning report on youth suicide, with a chapter on gay and lesbian youth suicide. Pressure from anti-gay forces within the Bush/Quayle administration led to suppression, not only of the controversial chapter, but also of the entire report; www.leaderu.com/jhs/labarbera.html

প্রকাশিত হতে থাকে। তাই একসময় সরকার রিপোর্ট প্রকাশে বাধ্য হয়। এ ছাড়া গ্রে রেমাফেডির ১৯৯১ সালে লেখা 'Death by Denial: Studies of Preventing Suicide in Gay and Lesbian Teenagers' বইয়ে ১৫০ জন স্ত্রী ও পুরুষ সমকামীর উপর সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এ থেকে জানা যায়, এদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ কৈশোরের কোন না কোন সময় আত্মহননের প্রবণতা প্রদর্শন করে।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি প্রাসঙ্গিক গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। সানফ্রান্সিস্কোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর এইডস প্রিজারভেশন স্টাডিস' এর গবেষকেরা ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে লস এঞ্জেলেস, সানফ্রান্সিসকো, শিকাগো এবং নিউইয়র্ক শহরের ২৮৮১ জন সমকামীর উপর সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমকামীদের মধ্যে যাদের বার্ষিক আয় ২০,০০০ ডলারের কম, তাদের শতকরা ৩৩ ভাগের মধ্যে কোন না কোন সময়ে আত্মহননের প্রবণতা জাগে। আর শতকরা ২২ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করে। অন্যদিকে যাদের বাৎসরিক আয় ৮০,০০০ ডলারের বেশী, তাদের মধ্যে শতকরা ১৯ ভাগ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে উঠলেও শতকরা ৯ ভাগ আত্মহননের চেষ্টা করেও বেঁচে যায়।

এ ছাড়া ১৯৯৮ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকার 'সেন্টারস ফর ডিজিস কন্ট্রোল' (সিডিসি) আমেরিকার কয়েকটি বড় শহরে কিশোর কিশোরীদের উপর একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখে যে, প্রতি বছর যে সব কম বয়সীরা আত্মহত্যার চেষ্টা করে বেঁচে যায় তাদের মধ্যে শতকরা ত্রিশ ভাগই সমকামী। ২০০৭ সালের সাম্প্রতিক একটি গবেষণাতেও সমামিতার সাথে উচ্চহারে আত্মহননের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে[14]।

বিষন্নতা এবং আত্মহনন সমকামীদের জন্য সমস্যা হলেও এগুলো মোটেই বিভীষিকা নয়। সামাজিক পরিবেশের মানোন্নয়ন করে এগুলো থেকে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মুক্ত করা সম্ভব। দেখা গেছে, সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তির মানুষেরা যে পরিবেশে নিজেদের 'স্বাভাবিক মানুষ' হিসেবে ভাবতে পারে, সে পরিবেশে এমনিতেই আত্মহননের প্রবণতা অনেক কমে আসে। এটি নিঃসন্দেহ যে, সমকামীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিদারুণ বৈরী পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আমাদের মতো দেশগুলোতে যেখানে সমকামিতাকে সামজিকভাবে হেয় করা হয়, আর আইনগতভাবে অন্যায় হিসেবে দেখা হয়, সেখানে আত্মহননের প্রবণতাকে প্রতিহত করা দূরূহ ব্যাপার। আমাদের স্কুলে ছোটবেলায় একটা ছেলে পড়তো আমাদের

[14] Kathyrn H. Don and Yezzennya Castro. "The assessment, diagnosis, and treatment of psychiatric disorders in lesbian, gay, and bisexual clients," in Julia D. Buckner, Yezzennya Castro, Jill M Holm-Denoma, and Thomas E Joiner Jr. (eds), Mental Health Care for People of Diverse Backgrounds. Radcliffe Publishing, 2007, p. 52

সাথে মাসুদ রানা নামে। পরে ক্যাডেট কলেজে চলে যায়। তার ঘনিষ্ট বন্ধুদের কাছ থেকে শুনতাম মাসুদ নাকি সমকামী। এর কিছুদিন পরেই মাসুদের আত্মহত্যার খবর পাই। আমি ছেলেবেলায় যে এলাকাতে বড় হয়েছি, সেখানেও একটি ছেলে ছিলো, আমার চেয়ে দু চার বছরের বড়। ছেলেটিকে এলাকায় 'একটু মেয়েলী' বলে খোঁটা দেয়া হতো। ছেলেটি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের সাথে থাকতে এবং তাদের সাথে খেলাধূলা করতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতো। আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি ছেলেটি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এ ধরণের বহু ঘটনাই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়। ২০০৪ সালে আমি ভারতের একটি পত্রিকায় একটি আত্মহত্যার খবর দেখেছিলাম, পরে আরেকটি বইয়ে এর উল্লেখ পাই [15] -

২৬ শে নভেম্বর ২০০৪ তারিখে সকাল ১০ টা নাগাদ উত্তর ২৪ পরগণার বনঁগা স্টেশনের কিছু দূরে অপর্ণা বিশ্বাস (২০) এবং কাজলী ঘোষ (১৮) নামে দুই তরুণী একসঙ্গে ট্রেনের নীচে মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেন। এই দুই তরুণী ছিলেন সমপ্রেমী। এরা একে অপরকে ভালবাসতেন গভীরভাবে। তাদের লেখা সুইসাইড নোট থেকে সমপ্রেমের মর্মান্তিক পরিণতির কথা জানা যায় –

মা আমার তুমি ক্ষমা করো।
আমি কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেলাম। কিন্তু কি করবো মা, আমি যে কাজুলীকে খুব ভালবাসি, ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। এমনকি ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না; তাই আমরা দুইজনে মৃত্যুপথ বেছে নিলাম। আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

ইতি
অপর্ণা ও কাজলী

আমাদের একটাই অনুরোধ আমাদের ভালবাসার দাবী হিসেবে একটাই অনুরোধ আমাদের দু'জনকে একই শশ্মানে দাহ করবে, এই আমাদের শেষ ইচ্ছা।

[15] অজয় মজুমদার, নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।

সমকামিতা এবং এইডস

আত্মহত্যা ছাড়াও আরো একটি স্বাস্থ্যগত মিথ্যা প্রচারণার বিষয়ে সমকামীদের প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়। সেটি হল এইডসের সাথে সমকামিতার অনুমিত সম্পর্ক। অনেকেই ভুল ভাবে মনে করেন, সমকামিতার মত বিকৃত যৌনতার কারনেই বোধ হয় এইডস হয়ে থাকে। আমার এই বইয়ের কিছু অংশ যখন ধারাবাহিকভাবে মুক্তমনা এবং সচলায়তন ব্লগে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন দু এক জন পাঠক তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছিলেন সমকামিতার মাধ্যমে যেহেতু এইডস ছড়ায়, তো আমি এ ব্যাপারটা কিভাবে দেখি। এর প্রেক্ষিতে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম তা এখানেও ব্যক্ত করা প্রয়োজনবোধ করছি।

এইডস ছড়ায় এইচ আইভি (এইডস ভাইরাস হিসেবে প্রচলিত) থেকে। বাহক এবং তার যৌনসংগীর দেহে এইডস ভাইরাস না থাকলে বাহক সমকামী হোক আর বিষমকামী হোক, এইডস ছড়াবে না। সমকামিতার কারণে, কারো দেহে 'এইডস'- এর জীবানু গজায় না। কাজেই সমকামিতাকে আলাদাভাবে অহেতুক দোষারোপ করার কোন কারণ নেই। আর সুরক্ষিত যৌন জীবন না থাকলে সমকামী এবং বিষমকামী - যে কেউই এইডসে আক্রান্ত হতে পারে। সেজন্যই আমরা দেখি পতিতাপল্লিতে এইডসের সংক্রমণ বেশী, যদিও সেখানে খুব কম বাহকই সমকামী।

সমকামিতার সাথে এইডসের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও এইডসকে সমকামিতার সাথে ট্যাগ করে দেওয়ার একটি ইতিহাস আছে। আশির দশকের প্রথম দিকে যখন এইডসের কথা প্রাথমিক ভাবে মিডিয়ায় প্রকাশিত হতে শুরু করলো, তখন, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি চিকিৎসক এবং গবেষকরাও এই রোগের মূল কারণ সম্বন্ধে বলতে গেলে অজ্ঞই ছিলেন। আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী লক্ষ্য করে 'বিশেষজ্ঞ'রা ধরে নিয়েছিলেন এটা বোধ হয় 'সমকামিতা সংক্রান্ত' কোন রোগ হবে। রোগটির নামও তারা ঠিক করে রেখেছিলেন – Gay-related immune disorder (GRID)। প্রচলিত নাম ছিলো 'Gay plague'[16]। তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের এই অবিশেষজ্ঞীয় এবং অবিবেচনাসুলভ অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সে সময় সাধারণ মানুষদের মনে সমকামীদের সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা তৈরী হয়। এমনিতেই তো সমকামীদের উপরে 'বিকৃত যৌনাচরণের' তকমা লাগানোই ছিল, তখন এইডসের সাথে সমকামিতার সম্পর্ক 'খুঁজে পাওয়ার' ফলে সমকামী সহ সকল সমন্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর নেমে আসতে থাকে অবর্ণনীয় নির্যাতন। বিশেষ মহল থেকে সমকামীদের একঘরে করে ফেলার প্রচেষ্টাও চলে। কিন্তু পরবর্তীতে গবেষণার অগ্রগতির

[16] Randy Shilts, And the Band Played On: Politics, People, and the AIDS Epidemic, Stonewall Inn Editions, 2000

সাথে সাথে চিকিৎসকেরা জানতে পারেন যে, এইডস নামক মরণব্যাধিটির পেছনে কারণ হল একটি ভাইরাস - Human immunodeficiency virus বা সংক্ষেপে '*এইচ. আই. ভি*'। এই এইচ আইভি ছড়ায় রক্ত, বীর্য (semen), যোনী প্রবহ (vaginal fluid), এমনকি বুকের স্তন্যপানেও। দেখা গেছে, বাহকের দেহে *এইচ. আই. ভি*'র জীবাণু থাকলে সমকামী যৌনসংসর্গে রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ঠিক ততটুকুই যা বিষমকামী যৌনসংসর্গেও ঘটতে পারে।

এটা ঠিক আমেরিকায় সমকামীদের মধ্যে এইডস রোগের হার বেশী, এখনো[17]। কিন্তু এর পেছনে সমকামিতা যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশী দায়ী আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট[18]। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশেই সমকামীদের চেয়ে বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের হার বেশী। আফ্রিকা মহাদেশটির কথা ভাবা যাক। হত দরিদ্র মহাদেশ - অথচ এইডসের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। ওখানে সমকামিতার জন্য এইডস ছড়ায়নি। বতসোয়ানার শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ যুবক-যুবতী এখন এইডস আক্রান্ত। সাউথ আফ্রিকায় শতকরা প্রায় ১৯ ভাগ। তাঞ্জানিয়ায় এমন গ্রাম-ও আছে যেখানে গ্রামের প্রায় সবাই এইডস-এ আক্রান্ত। সেই হতভাগ্য শিশুটির কথা ভাবুন, যে কিনা এইচ আই ভি জীবানু নিয়ে জন্মেছে, স্রেফ তার বাবা মায়ের এইডস সংক্রমণের কারণে। আমি কি সেই শিশুগুলোর ভাগ্যহীনতার জন্য বাবা-মা'র বিষমকামকে দায়ী করব? সেই এইডস আক্রান্ত হতভাগ্য শিশুগুলোর বাবা মা তো আর সমকামী ছিলো না। তাহলে গ্রাম কে গ্রাম এইডসে উজার হয়ে যাচ্ছে কেন? যুক্তি মানতে গেলে আফ্রিকার এইডসের বিস্তারের পেছনে তাহলে বিষমকামকে দায়ী করা উচিৎ। কারণ, আফ্রিকায় বিষমকামীদের মধ্যেই এইডস সংক্রমণ অনেক বেশি। শুধু আফ্রিকা নয়, সাড়া বিশ্ব জুড়েই বিষমকামীদের মধ্যে এইডসের প্রকোপ সমকামীদের থেকে অনেক বেশি দেখা যায়। সত্যি বলতে কি - এইডস আসলে সমকামিতা-বিষমকামিতায় কোন বাছ বিচার করে না। আগেই বলা হয়েছে, এইডস সংক্রমণের কারন *এইচ. আই. ভি* ভাইরাস। আপনার বা যৌনসংগীর দেহে এই জীবাণু না থাকলে এইডস আপনার মাধ্যমে ছড়াবে না, তা আপনি সমকামীই হোন, আর বিষমকামীই হোন। সেজন্যই এরিক মার্কোস তার 'ইস ইট এ চয়েস' গ্রন্থে বলেন –

[17] As of 1998, fifty-four percent of all AIDS cases in the United States were homosexual men, during the year 2003, the Centers for Disease Control (CDC) estimated that about 63% were among men who were infected through sexual contact with other men

[18] পাশাপাশি সমকামীদের সম্পর্কের বৈধতা এবং আইনী অধিকার অনেক জায়গাতেই না থাকায়, তাদের অনেককেই নির্বিচারী এবং বহুগামী জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হয়। পরিস্থিতির কারণেই তাদের অনেকেরই যৌনজীবন অধিকাংশ বিষমকামীদের মতো সুরক্ষিত থাকে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে এইডসের হার তুলনামূলকভাবে বেশী থাকতে পারে। এর জন্য সমকামিতা দায়ী নয়, দায়ী সমকামিতাকে কেন্দ্র করে মানবসৃষ্ট সামাজিক পরিবেশের জটিলতা।

> Worldwide, the majority of people who have contracted HIV have been – and are – heterosexual. HIV/AIDS does not discriminate. It's an equal opportunity disease that infects people who fail to use the well-understood methods to prevent its spread.

স্টোন ওয়াল রায়ট

সমকামিতার ইতিহাসে স্টোন ওয়াল রায়ট একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এই রায়টের কথা না জানলে কিংবা না উল্লেখ করলে সমকামিতার ইতিহাস অপূর্ণই থেকে যাবে। নিউইয়র্ক সিটির গ্রীনউইচ গ্রামের ক্রিস্টপার রোডের ৫১- ৫৩ নাম্বারে "স্টোনওয়াল ইন" নামে একটা রেস্তরা সমকামীদের বার ও আড্ডা দেয়ার তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত ছিলো বহুদিন ধরেই। ষাট- সত্তুরের দশকে এ ধরণের 'গে বার' গুলো ছিলো পুলিশি হামলা এবং ধরপাকরের পয়লা নম্বর লক্ষ্যবস্তু। বলা নাই, কওয়া নাই হঠাৎ করেই পুলিশ এ ধরনের বারে এসে সমকামীদের উপর চড়াও হয়ে গণহারে এ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত আর ফাটকে ঢুকিয়ে দিয়ে নিপীড়ন নির্যাতনে মেতে উঠত। আর সে সময় যাবতীয় আইন- কানুন সবই ছিলো সমকামীদের বিপক্ষে।

চিত্র: ১৯৬৯ সালের স্টোনওয়াল ইন রেস্তরা

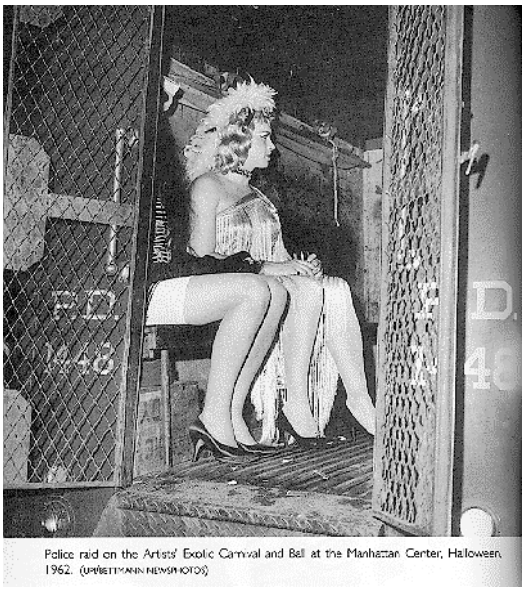

চিত্র: ১৯৬৯ সালের স্টোনওয়াল ইন রেস্তরায় গণবিক্ষোভের কিছু ঐতিহাসিক মুহূর্ত

দিনটা ছিলো ১৯৬৯ সালের ২৮ শে জুন। পুলিশ খুব স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীন উইচের গ্রামের গে- বারটিতে হানা দেয়। সাধারণতঃ ধরপাকরের ব্যাপারটা যেটা ঘটতো – খুবই গতানুগতিক এবং নিয়ম মাফিক। বারে হানা দিয়ে বারের সবাইকে বাইরে নিয়ে এসে গাড়ীতে তুলে নিয়ে চলে যেত। সালের ২৮ শে জুন দিনটা বোধ হয় অন্যরকম ছিলো। পুলিশ বারটিতে হানা দিলে সেখানকার লোকেরা পিছু না হটে সরাসরি পুলিশের সাথে সম্মুখ- লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। থালা বাসন, গ্লাস, বোতল – যার সামনে যা কিছু ছিলো তাই নিয়েই পুলিশের মোকাবেলা করে। একটা পর্যায়ে সব পুলিশদের রেস্তরার ভিতরে আবদ্ধ করে ফেলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। সেই পুলিশদের উদ্ধার করতে আরো নিরাপত্তারক্ষীদের পাঠানো হয়। কিন্তু তারা আবদ্ধ সহকর্মীদের দুরাবস্থা দেখা ছাড়া খুব একটা সুবিধা করতে পারেলেননা না। জনগণ ততক্ষণে রেস্তরার আশে পাশের রাস্তাগুলো দখল করে নিয়েছে। পুলিশদের ওভাবেই আবদ্ধ করে রেখে দিনভর আর রাত জুড়ে রায়ট চলতে থাকে। এ ধরণের পরিস্থিতি ছিলো পুলিশের চিন্তারও বাইরে।

এর পরদিন সমকামীদের সমর্থনে গ্রীনউইচ গ্রামের আশে পাশ থেকে আরো বহু লোক এবং সংগঠন এগিয়ে আসে। পুলিশদের উদ্দেশ্য পাথর ছোঁড়া থেকে আগুন জ্বালানো, পোড়ানো – কোন কিছুই বাদ যায় নি। প্রায় চারশ পুলিশএর সাথে যুদ্ধ করছিলো প্রায় দু হাজার সমকামী। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য। যে সমকামীদের এতদিন কেবল মেয়েলী, ফ্যাগ প্রভৃতি খোঁটা হজম করে লুকিয়ে ছাপিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হত, তারা একজোট হয়ে সূচনা করলেন নতুন এক আন্দোলনের – জন্ম হল সমকামিতা মুক্তির বা 'গে লিবারেশন' (Gay Liberation) - এর। বস্তুতঃ স্টোনওয়াল ইন এর এই আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিলো ভবিষ্যতের আন্দোলনের শক্তি এবং সাহস। কবি এলেন গিন্সবার্গ পরে 'ভিলেজ ভয়েস' ইস্যুতে লিখেছিলেন –

> You know, the guys there were so beautiful. They've lost that wounded look that fags all had ten years ago.

স্টোনওয়াল ইন- এর প্রভাব পরবর্তী কালের আমেরিকান রাজনীতিতে ব্যাপক। নিউইইয়র্কের মেয়র জন লিন্ডসের প্রেসিডেন্টশিয়াল ক্যম্পেইনের সামনে সমকামীরা দল বেঁধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তাদের আন্দোলনের মুখে মেয়র পুলিশকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হন – সমকামী বারে হানা দিয়ে লোকজনকে গ্রেপ্তার এবং হেনস্তা না করতে। সংখ্যালঘু যৌনপ্রবৃত্তির কারণে সমকামীরা রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিপীড়নের স্বীকার হচ্ছিলেন, তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পেলেন তারা।

সমকামী অধিকার কর্মীরা এ সময় নজর দিলেন মনোবিজ্ঞানীদের দিকে, যারা বহুদিন ধরেই সমকামিতাকে এক ধরণের 'রোগ' হিসেবে চিহ্নিত করে এসেছিলেন। এ সময় ডঃ এভেলিন হুকার এবং কিন্সের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হতে থাকে। তাদের এই গবেষণা থেকে চিকিৎসকেরা বুঝতে পারেন যে, যৌনতার ক্যানভাস আসলে সুবিশাল। মানবজীবনের যোউনতার এই ক্যানভাসে বিষমকামীতা যেমন পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি সমকামিতাও। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের মতো সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের ব্যাপারটাও কার কারো মধ্যে খুবই স্বাভাবিক। সমকামী হয়েও বহু লোকই সুখী জীবন যাপন করেছে – এ ধরণের বহু উদাহরণ সমকামী অধিকার কর্মীরা সামনে নিয়ে আসেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার মাধ্যমে একমত হন যে সমকামিতা কোন মানসিক ব্যধি নয়, বরং এটি যৌনতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তারা রোগের তালিকা থেকে সমকামিতাকে বাদ দিয়ে দেন। এটি যে সমকামিতার আইনী অধিকার এবং সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের লড়াইয়ে এক বিরাট মাইলফলক, এক ঐতিহাসিক বিজয় তা এ বইয়ে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (সপ্তম অধ্যায় দ্রঃ)।

মানবাধিকার সংগঠন এবং সাপোর্ট গ্রুপ

স্টোনওয়াল রায়টের প্রভাব শুধু আমেরিকাতেই পড়েনি, এর প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্ব জুড়েই। আমেরিকার মতই ইউরোপ এবং এশিয়ার সমকামী প্রবৃত্তির লোকেরা নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সারা দুনিয়া জুড়েই আনাচে কানাচে জায়গায় তৈরি হতে থাকে সমকামীদের নানা ধরণের সংগঠণ। সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীদের মানবাধিকার রক্ষায় আজ এগিয়ে এসেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো খ্যাতনামা সংগঠন। বিশ্বের নিপীড়িত, বঞ্চিত, অসহায় মানুষদের সেবায় ও পুনর্বাসনে অ্যামনেস্টি তার কার্যক্রমের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে পুরোমাত্রায়। মানবাধিকার বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদানের কারণে অ্যামনেস্টিকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৯৭ সালে। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রে যখন সমকামিতা তথা সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের উপর বহু নিয়ম নিষেধ শাস্তির বেড়াজালে ছিন্ন ভিন্ন হতে হচ্ছে সেখানে পুরো ব্যাপারটাকে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখবার পক্ষপাতী অ্যামনেস্টি। তারা সমকামিতার কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সংগঠিত নির্যাতন এবং নিপীড়নের কড়া প্রতিবাদ জানায়। সমকামিতা নৈতিক নাকি অনৈতিক - সেটা তাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় নয়, তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হল - সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি থাকার কারণে কেন কিছু মানুষ নিগ্রহ এবং নিপীড়নের স্বীকার হবে। ১৯৯১ সালের সভায় তাদের আন্তর্জাতিক কাউন্সিলের

মিটিং- এ তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সমকামিতার কারণে যাদের কারাবরণ করতে হয়েছে, তাদের মুক্তির দাবীতে অ্যামনেস্টি সোচ্চার হবে। তারা আরো মত প্রকাশ করে যে, স্টোনওয়াল ইন- এ যে মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয়েছিলো ১৯৬৯ সালে, তার বলিষ্ঠ কোন প্রতিবাদ তখন জানানো সম্ভব হয়নি। তার প্রতিদান দেবার সময় হয়েছে আজ, আর সেই লক্ষ্যেই অ্যামনেস্টি কাজ করে যাবে। ১৯৯৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অ্যামনেস্টি ইন্টারনেশনালের কার্যনিবাহী কমিটির সভার আয়োজন করা হয়েছিলো। সেখানেও সমকামিতার জন্য যারা সারা পৃথিবী জুড়ে নিগৃহীত হচ্ছে, তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্প নেয়া হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে, ওই সময় ব্রাজিলে দুজন আইনজীবী এক রূপান্তরকামী মানুষের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, এ কারণে তাদের জীবননাশের হুমকি দেয়া হয়। অপর একটি ঘটনায় জিম্বাবুয়ের একজন স্ত্রী সমকামী এক্টিভিস্ট একই ধরণের নিগ্রহের স্বীকার হয়েছিলেন। অ্যামনেস্টি সাংগঠনিকভাবে এই ঘটনাগুলোর সোচ্চার প্রতিবাদ জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রভাব ধীরে ধীরে মার্কিন মুল্লুকেও পড়তে শুরু করে। আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমকামী, উভকামী এবং রূপান্তরকামীরা অত্যাচারিত এবং নির্যাতিত হলে সে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। এ সংক্রান্ত আইন মার্কিন সিনেটে পাশ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও এর ধরণের বিষয়ে আশ্রইয়গ্রহণ করার জন্য আবেদনকারীকে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়, কখনো বা হতে হয় সরকারী কর্মচারী কিংবা কর্তাব্যক্তিদের দ্বারা হেনস্তা। এ ছাড়া এ ধরণের মামলায় জড়িত আইনজীবীদের রয়েছে প্রশিক্ষণের অভাব। এ ব্যাপারে সামনে এগিয়ে এসেছেন দুই প্রখ্যাত আইনজীবী রজার ডটি (Roger Doughty) এবং স্যারো ডালবেরী (Sarrow Dulberry)। যে সব আইনজীবীরা সমকামীদের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে সাওয়াল করতে চান, তাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে বলে ডটি এবং ডালবেরী মনে করেন। তারা বিগত কয়েক বছর ধরে শতাধিক আইনজীবীকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আইনজীবীরা অসংখ্য গে এবং লেসবিয়নদের আমেরিকায় আশ্রয় গ্রহণের আইনগত স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু আমেরিকায় নয় - ভারতেও আছে 'ইন্ডিয়া সেন্টার ফর হিউম্যান রাইটস ল' (India Center for Human Rights and Law) নামের একটি সংগঠন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও তৈরী হয়েছে বিভিন্ন আইনী সংগঠন। তারা সমকামীদের আইনী অধিকারের লড়াইয়ে কাজ করে যাচ্ছে নিরলস ভাবে।

একটা সময় পশ্চিমে সমকামিতাকে অপরাধ হিসেবে গন্য করা হতো। অস্কার ওয়াল্ড- এর মত খ্যাতনামা সাহিত্যিক কিংবা এবং অ্যালেন টুরিনের মত খ্যাতনামা বিজ্ঞানীকে সমকামিতার জন্য দন্ড পোহাতে হয় একটা সময়। ১৮৯৫ সালে সমকামিতার দায়ে অস্কার ওয়াল্ডের বিচার ও দন্ডপ্রদান পাশ্চাত্য সমকামিতার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ

মাইলফলক। লর্ড আলফ্রেডের সাথে ওয়াইল্ডের সমকামী সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ডগলাসের বাবা মার্কুয়েস অব কুইন্সবেরী ওয়াইল্ডের বিরুদ্ধে পায়ুকাম বা 'সডোমি'র অভিযোগ আনেন। তিন তিনবার মামলা আদালতে ওঠে। ওয়াইল্ড আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলেন -

> "The Love that dare not speak its name" in this century is such a great affection of an elder for a younger man as there was between David and Jonathan, such as Plato made the very basis of his philosophy, and such as you find in the sonnets of Michelangelo and Shakespeare. It is that deep, spiritual affection that is as pure as it is perfect. It dictates and pervades great works of art like those of Shakespeare and Michelangelo, and those two letters of mine, such as they are. It is in this century misunderstood, so much misunderstood that it may be described as the "Love that dare not speak its name," and on account of it I am placed where I am now. It is beautiful, it is fine, it is the noblest form of affection. There is nothing unnatural about it. It is intellectual, and it repeatedly exists between an elder and a younger man, when the elder man has intellect, and the younger man has all the joy, hope and glamour of life before him. That it should be so, the world does not understand. The world mocks at it and sometimes puts one in the pillory for it."

এহেন বগ্মীতা সত্ত্বেও ওয়াইল্ড সেসময় দন্ড এড়াতে পারেননি। ওয়াইল্ডের অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাকে দু' বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়।

অ্যালেন টুরিন (Alan Turing) ছিলেন আঠারো শতকের বিখ্যাত গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী। তার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের 'টুরিন টেস্টের' জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, তাকে সমকামীতার জন্য দোষী প্রমাণ করে সায়ানাইড খাইয়ে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয়া হয়। তখন তার বয়স ছিলো মাত্র চল্লিশ। তার অসামান্য প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেয়া হয় এভাবেই! এবং তা করা হয় রাষ্ট্রীয় ভাবেই। বোঝাই যায়, কী দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সমকামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন মানুষদের একটা সময় যেতে হয়েছে। যে দন্ডধারায় সে সময় ওয়াইল্ড বা টুরিনকে দন্ড পোহাতে হয়েছিলো তা পরিচিত ছিলো 'ক্রিমিনাল ল এমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' নামে। এই আইন অনুযায়ী দুই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিলো। এই নিষেধাজ্ঞা ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে বলবৎ ছিল।

সে হিসেবে আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের অবস্থা অনেকটাই পাল্টেছে। টুরিনের উপর সে সময়কার অমানুষিক অত্যাচারের জন্য এতোদিন পর ২০০৯ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছে[19]। আজকের দিনে পশ্চিমা বিশ্বের সমকামী এবং রূপান্তরকামী মানবাধিকার সংগঠনগুলো যে সমস্ত লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে সেগুলো হল –

১। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়ের অধিকার,
২। সাংস্কৃতিক লিঙ্গ পরিচয়কে প্রকাশের অধিকার,
৩। সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী মনোবৃত্তির জন্য নিগৃহীত না হবার অধিকার,
৪। সাংস্কৃতিক লিঙ্গানুযায়ী সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের অধিকার,
৫। নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করার অধিকার,
৬। লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রয়োজনে উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার,
৭। মানসিক রোগী হিসেবে পরিচিত না হবার অধিকার,
৮। যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যৌন প্রকৃতিকে প্রকাশ করার অধিকার,
৯। বিবাহের অধিকার,
১০। দত্তক গ্রহণ এবং পিতা- মাতা হিসেবে শিশু পালনের অধিকার ইত্যাদি।

শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদের উপমহাদেশেও সমকামী সহ সমান্তরাল যৌনতার মানুষগুলোর অধিকার সংরক্ষণের জন্য গড়ে উঠেছে নানা সংগঠন। পত্রিকা প্রকাশ, সম্মেলন আয়োজন এবং জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের কর্মকান্ডের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে নানা দিকে। গড়ে উঠছে মানবাধিকারের স্বপক্ষে বলিষ্ঠ আন্দোলনের রূপরেখা। রয়েছে উভলিঙ্গ মানবদেরও নানা সংগঠন। ১৯৯০ সালের জুন মাসে মুম্বই থেকে ভারত সমপ্রেমীদের প্রথম পত্রিকা ‘বোম্বে দোস্ত’ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক অশোক রাও কবি। তিনি ১৯৮৫ সালেই *স্যাভি* (Savvy) পত্রিকায় নিজেকে সমকামী হিসেবে ঘোষণা করেন। পরে ১৯৯৩ সালে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন - যা জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অশোক রাও কবির এই সাক্ষাৎকার সমকামীদের অধিকারের বিষয়টিকে সামনে এগিয়ে নেয়। এদিকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডনে তৈরী হয় নাজ ফাউন্ডেশনের (Naz Foundation International)। এই সংস্থার উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন শহরে সমকামীদের স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য নানা প্রকল্প চালু হয়। ঐ একই বছর দিল্লীর ‘এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন’ (ABVA) নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ভারতের সমপ্রেমীদের জীবন ও সমস্যার ওপর ‘Less than Gay’ নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই গ্রন্থটি সমকামীদের সমানাধিকারের পাশাপাশি সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের জন্য আন্দোলনের

[19] PM apology after Turing petition, BBC coverage of Gordon Brown's apology for Turing's mistreatment by the British Government; http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8249792.stm

মজবুদ তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে। ১৯৯১ সালেই বোম্বে দোস্ত পত্রিকার অনুসরণে কলকাতায় প্রকাশিত হয় 'প্রবর্তক' এবং ১৯৯৩ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয় 'আরম্ভ'। এর পর কলকাতা থেকে রূপান্তরকামীদের (কোতিদের) জন্য প্রকাশিত হয় 'প্রত্যয়'। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সমপ্রেমীদের অসংখ্য পত্রিকা। প্রবাশ থেকে প্রকাশিত 'ত্রিকোন' নামে একটি পত্রিকা উপমহাদেশের সমকামী মানুষের আর্তি, বেদনা এবং সমস্যা তুলে ধরে, এবং সেই সাথে সংখ্যালঘু সমান্তরাল যৌনতার মানুষদের প্রতি সামাজিক সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রিন্টেড মিডিয়ায় সমকামীদের অধিকার নিয়ে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও ম্যাগাজিন প্রকাশিত হলেও ইন্টারনেটে বাংলায় ভাল রিসোর্স তেমনি ভাবে ছিলো না। একবিংশ শতকে সচলায়তন এবং মুক্তমনা সহ বাংলা ইউনিকোড ভিত্তিক ব্লগ সাইটগুলো জনপ্রিয়তা পাওয়ার ফলে ইউনিকোডে বাংলায় এ ধরণের লেখা প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সময় ২০০৬ সালে সিরিজ আকারে প্রকাশিত হতে থাকে আমার 'সমকামিতা কি প্রকৃতি বিরুদ্ধ?' নামের সিরিজটি। এই সিরিজটির মাধ্যমে সমকামিতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ তৈরি হয়। প্রানীজগতের মধ্যে সমকামিতা, উভকামিতা এবং রূপান্তরকামীতার অজস্র উদাহরণ প্রদানের পাশাপাশি আধুনিক গবেষণার আকর্ষনীয় ফলাফলগুলো প্রথমবারের মতো হাজির করা হয় বাঙ্গালী পাঠকদের সামনে। বহু পাঠক সিরিজটি পড়তে পড়তেই মত দিয়েছিলেন যে, প্রবন্ধটি সমকামিতা সম্বন্ধে তাদের সনাতন মনোভাব বদলে দিচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য ব্লগ সাইটগুলোতেও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু সচেতন লেখকদের অংশগ্রহণ স্পর্শকাতর এই বিষয়টিকে নিয়ে তৈরি করে আলোচনা এবং বিতর্কের নতুন পরিবেশ। যে বিষয়টিকে এতদিন অজ্ঞতার অপশাসনে দীর্ণ করে রাখা হয়েছিলো, ব্লগস্ফিয়ারের বিভিন্ন লেখকদের সাহসী লেখালেখিগুলো তার বস্তুনিষ্ঠ উন্মোচন ঘটালো।

এর মধ্যে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে উপমহাদেশের মানবাধিকার আন্দলন এক নতুন দিকে বাঁক নেয়। এ বছরের জুন মাসে ভারতীয় দন্ডবিধি ৩৭৭ নং ধারা - যা সমকামকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌন আচরণ' হিসেবে অভিহিত করেছে - 'এইডস ভেদভাব বিরোধী আন্দোলন' (ABVA) নামের সংগঠনটি এই ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা করে। ABVA এর পক্ষে রাজেশ তালওয়ার এবং শোভা আগারওয়াল সাওয়াল করেন। এই মামলার তখন নিষ্পত্তি না হলেও এর প্রভাব পড়ে সারা দেশ জুড়ে। ১৯৯৪ সালের ২৭-৩১ ডিসেম্বরে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়ার সমপ্রেমীদের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুভাষ সালুঙ্কি। তিনি বলেন -

> Indian is an old and proud culture and hypocrisy is ingrained in our character. We do not wish to accept that we are like any other culture on

> earth and that numerous kinds of sexualities exist apart from mainstream heterosexual societies.

সালুঙ্কির এই সাহসী বক্তব্য সমকামিতার আইনী স্বীকৃতি অর্জনের আন্দোলনকে ঋদ্ধ করেছিলো। যা হোক বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ২০০৯ সালের জুলাই মাসে ভারতের হাইকোর্ট সমকামিতা অপরাধ নয় বলে এক যুগান্তকারী রায় দেয়, এবং এর ফলে প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো ঔপনিবেশিক আইনে সমকামিতাকে যেভাবে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে গণ্য করে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো - এ রায়ের মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটে। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টও সম্প্রতি উভলিঙ্গ মানবদের জন্য সমানাধিকারের আইন পাশ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও সমকামিতার আইনী অধিকার খুব একটা আশাপ্রদ নয়। দেশের সংবিধানের পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনে সমকামিতাকে 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনতা' হিসেবে অভিহিত করে উল্লেখ করা হয়েছে -

> "Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may be extend to ten years, and shall also be liable to fine".

এই পেনাল কোড ৩৭৭ নং সেকশনের অংশটি সংবিধানের মূলনীতি - '*সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার*' (Part II Article 19) এবং '*সকল নাগরিকের জন্য সমান আইন*' (Part III Article 27) এর পরিস্কার লঙ্ঘন। শুধু তাই নয় আজকের পৃথিবীর বিশ্বমানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকেও এটি চরম অন্যায়। সারা পৃথিবী আজ পুরো বিষয়টিকে যে ভাবে দেখছে, তার ছিটেফোঁটাও রাষ্ট্রপরিচালনার কর্ণধরেরা অনুধাবণ করেনি। বাংলাদেশের এক মন্ত্রী সম্প্রতি মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আইন সংশোধন করার কোন আগ্রহ আপাততঃ তাদের নেই। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব প্রথম থেকেই ছিলো। তারপরেও পচাত্তর পর্যন্ত কাগজে কলমে যাও বা ধর্মনিরপেক্ষতা ছিলো, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' মুলনীতি হিসেবে স্থাপিত হল - ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সংযুক্ত হয় 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস'কে। উচ্ছেদ ঘটে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ- এর; ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। এরশাদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে 'ইসলাম'কে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর সমস্যা আরো ঘোরালো হয়েছে। তার পরবর্তী বছরগুলোতে অবস্থা কেবল খারাপই হয়েছে বলা যায়। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্ম এবং মৌলবাদকে মাত্রাতিরিক্ত তোষণ করার ফলশ্রুতি স্বরূপ কিভাবে বাংলা ভাইয়ের উত্থান হয়েছিল, কিভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর

পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কিভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচির অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি। সে সময় দেশে মৌলবাদ এবং জঙ্গিবাদের উত্থান এবং বিকাশ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে অবলোকন করেছে সবাই। একই ধারায় 'ইসলামী আইন বাস্তবায়ন সমিতি' এবং 'ইসলামী ঐক্যজোট'- এর মতো চরম রক্ষণশীল কিছু গোষ্ঠি দেশে শারিয়া আইন বাস্তবায়নের পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। জামাতে ইসলামীর মত দলগুলোও শারিয়ার নিরবিচ্ছিন্ন সমর্থক। এদের পেছনে আছে মধ্যপ্রাচ্য এবং আরবদেশের প্রচ্ছন্ন মদদ এবং অর্থশক্তি। শারিয়াকেন্দ্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সমকামিতার শাস্তি মৃত্যুদন্ড। সৌদি আরব, ইরান, বাহারাইন, মাউরিতানিয়া, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিওন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কাজেই, ওই সমস্ত দেশের মতো শারিয়া আইন দেশে কখনো বাস্তবায়িত হলে সৌদী আরব এবং ইরানের মত প্রকাশ্য রাস্তায় সমকামীদের হত্যা করার কুৎসিৎ রীতি দেখতে হবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদশে সমকামী আন্দোলনের কর্মীরা নানা ঘাত- প্রতিঘাত এবং সংকটের মুখোমুখি। তারপরেও আশার কথা এই যে, বয়েস অব বাংলাদেশ (বব), বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর গেস (ব্যাগ) নামে দুটি গ্রুপ বাংলাদেশে সমকামিতার উপর মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সখিনী এবং সপ্রভা নামের দুটি সংগঠন কাজ করছে নারী সমকামিতার উপর। বাঁধন হিজড়া সংগঠন কাজ করছে উভলিংগ মানবদের পশ্চিম বঙ্গে স্যাফো, প্রত্যয়, প্লাস, পাম, কোমল গান্ধার, প্রান্তিক বনগাঁ সহ বহু সংগঠন সমকামীদের অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে LGBTI Bangladesh, Global Gayz Bangladesh, bengayliz.com, প্রভৃতি সাইট বাংলাদেশী সমকামীদের অধিকার নিপীড়ন, ব্যথা বেদনা নিয়ে লিখছে। তবে আমরা মনে করি সমপ্রেমীদের মানবাধিকার অর্জনের লড়াই, শুধু তাদের একারই নয়, এ লড়াইয়ে বিষমকামীদেরও সামিল হওয়া প্রয়োজন। আসলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষদের এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন পূর্ণতা পাবে না। সে জন্যই মুক্তমনার মত মানবতাবাদী সংগঠনগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের জন্য সহমর্মিতার হাত, গড়ে দিতে চাইছে আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তি। আমরা আশা করব এই বইটির মাধ্যমে বাংলাদেশের সমপ্রেমীদের মানবাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্র অনেকদূর প্রসারিত হবে। হাওয়ার প্রতিকূলে দাঁড় বাইতে থাকা সংখ্যালঘু যৌন- প্রবৃত্তির মানুষেরা তখন লর্ড বাইরনের মত উচ্চারণ করবে -

Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,
streams like the thunderstorm against the wind.

সমাপ্ত

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণার রুদ্ধ দুয়ার খুললেন যারা

যৌনতা মানব- সমাজের অত্যন্ত গোপনীয় দিক। মানুষের 'প্রাইভেট- লাইফ'- এর সাথে এর নিবিড় সম্পর্ক। ফলে প্রকাশ্যে যৌনতা নিয়ে আমরা আলোচনা করি না। নানাভাবে ব্যাপারটা এড়িয়ে চলি। কখনো বোধ করি অস্বস্তি। সে সজন্য যৌনতা নিয়ে ভাল কোন গবেষণা আঠারো শতকের আগে শুরুই হয়নি, যদিও রগরগে 'সেক্স ম্যানুয়াল'- এর অভাব সমাজে কখনোই ছিল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের কথা তো আমরা সবাই জানি। এটি লেখা হয়েছিল বোধ হয় সেই দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে। তারও আগে ছিল রোমান কবি অভিডের (Ovid) লেখা 'আরস আমাতোরিয়া' বা 'Arts of Love'। এছাড়া ১১৭২ খ্রীষ্টাব্দে লেখা ভারতীয় লাভ ম্যানুয়াল 'অনঙ্গ রাঙ্গা' কিঙ্গা গ্রীক 'এলিফান্তিস'- এর কথাও হয়ত অনেকে জানেন। এগুলোতে নানাপদের আশন- কুশন আর 'ক্যামনে স্ত্রীকে বশে রাখা যায়' – এ নিয়ে রগরগে উপাদান আছে ঢের, কিন্তু এগুলোর কোনটিতেই যৌনতা বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়নি।

যৌনতার উপর প্রাথমিক গবেষণা বলতে আমরা অনেকে ফ্রয়েডের গবেষণাই বুঝে থাকি, যদিও ফ্রয়েডেরও আগে রিচার্ড ফ্রেইহার ভন ক্রাফট ইবিং এ নিয়ে বেশ কিছু কাজ করেছিলেন। রিচার্ড ফ্রেইহার মানবজীবনে যৌনতার বিভিন্নরূপকে লিপিবদ্ধ করে ১৮৮৬ সালে 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' (Psychopathia Sexualis) নামে ল্যাটিন ভাষায় একটি যুগান্তকারী বই লিখেছিলেন । বইটিতে তিনি সমকামী প্রবণতাকে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' বলে আখ্যায়িত করেন। সমকামিতা ছিলো তার চোখে উত্তরাধিকারের অধঃপতন[1]। তিনি আরো মনে করতেন হস্তমৈথুনের কারণে মানব জীবনে সমকামিতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বইটি সে সময় শুধু চিকিৎসক কিংবা সার্জনদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি,

[1] অধঃপতন তত্ত্বের ("Degeneracy" theory) মূল উদ্ভব ঘটেছিলো আঠারো শতকে, কিন্তু উনিশ শতকে এটি পূর্ণতা পায়। মানুষের যে কোন অস্বাভাবিকতা - তা সে নির্বুদ্ধিতাই হোক, কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব কিংবা হোক না খুন খারাবির মতো কোন অপরাধ - সবই এই ' অধঃপতন' তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা হত । চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে এই তত্ত্ব প্রবেশ করে ১৮৫৭ সালে বি. এ মোরেল নামে এক ' বিশেষজ্ঞের' হাত দিয়ে। তিনি কিছু বিশেষ শারীরিক অবস্থা - যেমন ক্ষয়রোগ (যক্ষা) এবং ক্রেটিনিজম (এক ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধীত্ব) সহ বিভিন্ন রোগের উৎস হিসেবে এই অধঃপতন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটান। তখন যেহেতু চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান এত উন্নত পর্যায়ের ছিলো না, ডাক্তাররা এই অদ্ভুতুরে তত্ত্বটিকে গুরুত্ব দিয়েই গ্রহণ করেছিলো বলা যায়। রিচার্ড ভন ক্রাফট ইবিং মোরেলের এই তত্ত্ব তার যৌনতার তত্ত্ব ব্যাখ্যার কাজে ব্যবহার করেন এবং সমকামিতাকে এক ধরণের ' অধঃপতনের প্রকাশ' হিসেবে ব্যাখ্যা করেন।

সাধারণ মানুষদের মাঝেও এটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। রিচার্ড ফ্রেইহারের জীবদ্দশাতেই এই বইটির প্রায় ডজন খানেক মুদ্রণ প্রকাশিত হয়, অনুদিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। এই বইটি লেখার আগে বিশ্বে ইবিং- এর তেমন কোন পরিচিতি ছিল না। কিন্তু এই একটি বইই তাকে নিয়ে আসে একেবারে খ্যাতির উজ্জ্বল আলোয়। অখ্যাত এক জার্মান নিউরোলজিস্ট রাতারাতি পরিণত হন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধানে। আর তার বই 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' দেশ বিদেশে মুড়ি মুরকির মতই বিক্রি হতে থাকে। এই বইটিই মুলতঃ প্রথম বারের মত 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন' থেকে সমকামিতাকে সর্বসাধারণের কাছে এক ধরনের 'মানসিক রোগ' এবং 'অসুস্থতা' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলো, যার প্রভাব বজায় ছিলো পরবর্তী একশ বছর পর্যন্ত[2]। আর তার বইয়ের সূত্রেই বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেলেন 'পাগল সারাবার' নানা চিকিৎসা; অন্য দিকে ধর্মের ধ্বজাধারী চার্চ খুঁজে পেল সমকামীদের হেনস্থা করার সুদৃঢ় 'বৈজ্ঞানিক ভিত্তি'। যদিও সেসময়ের জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমকামিতার কোন জৈববৈজ্ঞানিক ভিত্তি রিচার্ড ইবিং- এর জানা ছিলো না, কিন্তু 'নিঃসংশয়ী এবং প্রত্যয়ী' ইবিং ঢালাওভাবে তার বইয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমকামীরা বিকৃত মনোভাবাপন্ন, কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে অক্ষম এবং তারা মনোরোগী[3]। বলা বাহুল্য, সমকামী প্রবৃত্তি নিয়ে ইবিং- এর গৎবাঁধা বুলিগুলো আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে অনেক আগেই[4]। কিন্তু তিনি প্রথম অপ্রচলিত 'হোমোসেক্সুয়ালিটি' শব্দটিকে (যা কার্ল মারিয়া কার্টবেরি অনেক আগে ১৮৬৯ সালে একটি প্যাম্ফ্লেটে ব্যবহার করেছিলেন) একাডেমিয়ায় শুধু নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলেন এবং এ সংক্রান্ত গবেষণার দুয়ার উন্মোচন করেন। ইবিং- এর এ ধরণের গবেষণায় অনুপ্রাণিত হন আরেক বিখ্যাত যৌনগবেষক – যার নাম আমরা সবাই জানি - বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড এস. ফ্রয়েড।

বিশ শতকের প্রথম দিকে সিগমুন্ড ফ্রয়েড তার বিভিন্ন মক্কেলদের সাথে কথোপকথোন এবং তাদের যৌন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা অধ্যয়নের ভিত্তিতে যৌনতার যে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন তার প্রভাব পরবর্তী কয়েক দশক ধরে বজায় ছিল। তবে পরবর্তীতে ফ্রয়েডের অনেক গবেষণাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। যেমন, কোন আবদ্ধ পরিবারে বাবার দূরে থাকার কারণে কোন ছেলে কেন সমকামীমনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, ছেলেটি 'ইডিপাস কম্পলেক্স' থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছে। আবার

[2] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996

[3] Krafft-Ebing, R. [1886] 1999. Psychopathia Sexualis. Reprinted by Bloat Books.

[4] Today, most contemporary psychiatrists no longer consider homosexual practices as pathological (as Krafft-Ebing did in his first studies): partly due to new conceptions, and partly due to Krafft-Ebing's own self-correction. From Wikipedia.
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Richard_Freiherr_von_Krafft-Ebing

একই পরিস্থিতিতে একটি মেয়েশিশু কেন সমকামী হয়ে উঠতে পারে তা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হল, এতে থাকে তার প্রতি তার মার অবচেতন ঘৃণা (unconscious hatred of their mothers) কিংবা তার ভাইয়ের লিঙ্গের প্রতি ঈর্ষা (envy of a brother's penis)। ফ্রয়েডের এ ধরণের ব্যাখ্যাকে 'বৈজ্ঞানিক' না বলে এখন 'ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার' বলাই শ্রেয়। ড. হুমায়ুন আজাদ তার 'নারী' গ্রন্থে এধরণের ফ্রয়েডীয় কুসংস্কার সম্বন্ধে বলেছেন[5],

> '... ফ্রয়েডের সমস্ত সিদ্ধান্ত এখন গন্য হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক বলে; শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীলও : একরাশ পিতৃতান্ত্রিক, গোত্রীয় ও ব্যক্তিগত কুসংস্কার পেশ করেছিলেন মনোবিশ্লেষনরূপে। ফ্রয়েড যখন উদঘাটন ও প্রকাশ করে চলেছিলেন মনের 'অদৃশ্য' সূত্র, শোনাচ্ছিলেন লিবিডো, অহম, অবচেতনা, ইডিপাস- ইলেক্ট্রা গূঢ়ৈষা, শিশ্নাসূয়ার পূরাণ; কামকে করে তুলেছিলেন বিশ শতকের আল্লা ... ফ্রয়েডের মানুষধারনাকেই ভুল মনে হয় আজ; পিতৃতন্ত্রের, গোত্রের ও নিজের দুঃস্বপ্ন মানুষ নামে তিনি উপস্থিত করেছিলেন বিজ্ঞানের মুখোশ পরিয়ে।'

ড. হুমায়ুন আজাদের কথায় আবেগের আতিশয্য থাকলেও অতিশয়োক্তি নেই কোথাও। তবে তারপরও বলতে হয়, ফ্রয়েডর গুরুত্ব এখানেই যে তিনিই প্রথম যৌনতা নিয়ে প্রথাগত গবেষণার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন। আরো একটা ব্যাপার সেই সাথে গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রয়েড তার পূর্বসুরী গবেষক ইবিং এর মত সমকামিতাকে কোন 'রোগ' বলে মনে করতেন না। তিনি ভেনিসের Die Zeit পত্রিকায় সমকামিতা সম্বন্ধে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সরাসরি – 'সমকামী ব্যক্তিরা অসুস্থ নয়'[6]। একবার এক আমেরিকান মহিলা তার ছেলের সমকামিতা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে ফ্রয়েডের সাহায্য কামনা করলে, ফ্রয়েড তাকে চিঠিতে জানান-

> 'আমি আপনার চিঠি থেকে যা বুঝলাম তা হল আপনার সন্তান সমকামী। কিন্তু আপনি সেই কথা আপনার চিঠিতে সরাসরি কোথাও উল্লেখ করেননি। আমি কি জানতে পারি কেন আপনি এটা এড়িয়ে গেলেন? সমকামিতার হয়তো কোন উপকারিতা নেই, কিন্তু এতে লজ্জিত হবারও কিছু নেই। এটি কোন অসুস্থতা নয়, কিংবা নয় কোন ধরণের অধঃপতন। এটাকে কোন রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বরং আমরা একে যৌনতার এক প্রকারণ (variation) হিসেবে দেখি, যা কোন ব্যক্তি সত্ত্বার মধ্যে বিভিন্ন

[5] হুমায়ুন আজাদ, নারী, আগামী প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২

[6] His exact comment was – "Homosexual persons are not sick". (Ref. Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press; 1 edition, 1996)

> কারণে জন্ম নিতে পারে। প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বহু জ্ঞানী গুনী এবং শ্রদ্ধেয় মানুষজন সমকামী ছিলেন (যেমন প্লেটো, মাইকেলএঞ্জেলো, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি প্রমুখ)। সমকামিতাকে অপরাধ হিসবে চিহ্নিত করে এর উপর নিষ্ঠুর হওয়া নিঃসন্দেহে অনৈতিক হবে'।

তবে ফ্রয়েডের এ ধরণের 'প্রথাগত' গবেষনার অনেক আগেই আঠারো শতক থেকেই – কিছু দার্শনিক সমকামিতার ব্যাপারে নিজেদের ব্যক্তিগত অভিমত জানিয়েছিলেন। যেমন দার্শনিক ভলটেয়ারের (১৬৯৪ - ১৭৭৮) কথা বলা যায়। ভলটেয়ার ১৭৬৪ সালে লেখা একটি বইয়ে সমকামিতাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ অনৈতিক প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করেছিলেন; কিন্তু আবার এই আচরণের ব্যাপক প্রসার দেখে বিস্মিতও হয়েছিলেন[7]। তিনি মনে করতেন, এই মানসিকতার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিংবা 'গড়ম বেশী পড়লে' সমকামিতার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় বলে তিনি ভাবতেন। আরেক ফরাসী দার্শনিক রুশো (১৭১২ - ১৭৭৮) মনে করতেন সমকামিতা মুলতঃ এসেছে আরব দেশগুলো থেকে। তবে যেহেতু সারা পৃথিবীর সকল দেশেই সমকামিতা ছড়িয়ে গেছে, তাই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়াই সঙ্গত।

ইবিং এর 'সাইকোপ্যাথিয়া সেক্সুয়ালিস' প্রকাশিত হবার আগে ১৮৬২ সালে জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী কার্ল হেনরিখ উলরিচস 'উরানিসম'[8] নামের একটি ধারণার জন্ম দেন। সমকামিতার ইতিহাসে উলরিচসের নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তিনি ছিলেন সমকামী মানবাধিকারের আদি প্রবক্তাদের অন্যতম এবং একজন বিদ্রোহী লেখক। প্রথম দিকে তিনি Numa Numantius নামের ছদ্মনামে লিখলেও পরবর্তীতে নিজ নামেই আত্মপ্রকাশ করেন, এবং প্রকাশ্যে নিজেকে 'উরানিয়ান' হিসেবে অভিহিত করতেন (তাকে এখন ইতিহাসের প্রথম 'আউট অব ক্লোজেট' বলে মনে করা হয়)। তিনি আইনের যাতাকলে পিষ্ট সমকামী ব্যক্তিদের অধিকার সম্বন্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলেন এবং সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক সমস্ত আইনকানুন লোপ করার আহবান জানান। সমকামিতা তার কাছে কোন 'অপরাধ' ছিলো না, বরং তার চোখে একেবারেই 'প্রাকৃতিক' এবং খুবই 'স্বাভাবিক' একটি প্রবৃত্তি। তিনি তার লেখায় সেজন্যই বলেন, "There is no such thing as unnatural love. Where true love is, there nature is also"

---

[7] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৫।

[8] উরানিজম উনবিংশ শতকের একটি মতবাদ। এই মতবাদে মনে করা হত সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ। এরা উলরিচসের চোখে ছিলো তৃতীয় লিঙ্গ।

সমকামিতা সম্বন্ধে সরাসরি কিছু না বললেও ফরাসী চিন্তাবিদ দিদেরোর (১৭১৩- ১৭৮৪) দৃষ্টিভংগী পরবর্তীতে সমকামীদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভংগি পাল্টাতে সাহায্য করেছিল। তিনি মানুষের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ে অহেতুক নীতি কপচানোর ব্যাপারে চার্চের ভূমিকার সমালোচনা করেন। দিদেরোর মতামতকে গ্রহণ করে নিয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও দার্শনিক চার্চের অসহিষ্ণু মনোভাবের নিন্দা করেছেন। এর মধ্যে ফরাসী সাহিত্যিক মার্কুইস দে সাদ এবং এমিল জোলার কথা আলাদা করে বলা যায়। এরা সমকামী মনোবৃত্তিকে জন্মগত বলে মত দিয়েছেন, এবং এও বলেছেন, এই মানসিকতাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

এখন একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বলা যায় যে, সমকামিতা নিয়ে শরীরবৃত্তীয় এবং মনস্তাত্বিক গবেষণা শুরু হয়েছে অনেকদিন ধরেই। শুধু সমকামিতা নয়, পাশাপাশি রূপান্তরকামিতা, উভকামিতা এবং অপরাপর যৌনপ্রবৃত্তি নিয়েও সামগ্রিকভাবে গবেষণা হচ্ছে ঢের। এর ফলে যে যৌন- প্রবৃত্তিগুলো একসময় নিকষ অন্ধকারের কালো চাঁদরে ঢাকা ছিল, তা ধীরে ধীরে উঠে আসছে দিনের আলোতে। সমকামিতা বিষয়ে লিখতে গিয়ে যাদের কথা না বললেই নয়, তারা হলেন ব্রিটিশ ডাক্তার হেনরি হ্যাভলক এলিস (১৮৫৯- ১৯৩৯), জন এডিংটন সিমন্ডস (১৮৪০- ১৮৯৩) এবং জার্মান মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড (১৮৬৪ - ১৯৩৫)। এরা সকলেই ছিলেন ইবিং এর প্রায় সমসাময়িক কিন্তু ইবিং এর মতামতের সাথে তারা একমত ছিলেন না।

জন এডিংটন সিমন্ডস বিজ্ঞানের কোন গবেষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন উনবিংশ শতকের অন্যতম প্রধান ইংরেজ কবি। সাত খন্ডে প্রকাশিত ‘ইতালির রেনেঁসা’ (Renaissance in Italy) বইটি তার প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন। তিনি শুধু কবিতাই লেখেননি, শেলী এবং সিডনির মত ইংরেজ কবি, নাট্যকার বেন জনসন এবং মাইকেল এঞ্জেলোর মত শিল্পীদের জীবনীও লিখেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক উঁচু মানের সমালোচক।

কিন্তু যত বিখ্যাত মানুষের জীবনীই তিনি লিখুন না কেন নিজের জীবনী কিন্তু তিনি আমৃত্যু প্রকাশিত হতে দেননি। তার মৃত্যুর দু’বছর পরে ১৮৯৫ সালে তার প্রকাশক এইচ. এফ. ব্রাউন তার স্মৃতিকথার ভিত্তিতে সিমন্ডসের একটি জীবনী প্রকাশ করেন, কিন্তু সিমন্ডসের মূল পান্ডুলিপিটি তিনি কাউকে দেখতে দেননি। ব্রাউন সাহেব ‘যক্ষের ধনের’ মত সিমন্ডসের পান্ডুলিপিটি নিজের কাছে আমৃত্যু আগলে রাখেন, শুধু তাই নয় ১৯২৬ সালে মৃত্যুর সময় তিনি পান্ডুলিপিটি লন্ডন লাইব্রেরীকে দান করে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে যান যে মৃত্যুর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেন পান্ডুলিপিটি খোলা না হয় – সেটিকে যেন নিভৃত একটি জায়গায় আবদ্ধ করে রেখে দেয়া হয়।

লন্ডন লাইব্রেরী তাই করলো; ব্রাউন সাহেবের প্যাকেটটিকে একেবারে সিল গালা করে লাইব্রেরীর সিন্দুকে তুলে রাখল। এর ২৩ বছর পরে ১৯৪৯ সালে সিমন্ডসের কন্যা ডেম ক্যাথেরিন তার পিতার পান্ডুলিপিটি পড়তে চাইলে লন্ডন লাইব্রেরী 'বিশেষ বিবেচনায়' ক্যাথেরিনের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ক্যাথেরিনের সামনে উন্মোচিত হল সবুজ এক বাক্সে রাখা ৬ বাই ১২ বাই ১৮ ইঞ্চি এক খাতা, যার উপরের পৃষ্ঠায় লেখা ছিল – 'J A Symond's papers'[9]। কিন্তু ডেম ক্যাথেরিন লাইব্রেরী থেকে ফিরে এসে এ বিষয়ে কাউকে কিছু বললেন না, বাবার পান্ডুলিপি নিয়ে কোন ধরণের উচ্চবাচ্য পর্যন্ত করলেন না। ফলে সিমন্ডসের পান্ডুলিপি রহস্য হয়েই রইলো আম- জনতার কাছে।

১৯৫৪ সালে লাইব্রেরীর উপকমিটি একটি মিটিং করে বাছাই করা কিছু বিশেষজ্ঞকে (বোনাফাইড স্কলার) পান্ডুলিপি পড়বার অনুমতি দিলেন, তাও বিশেষ প্রহরায়। কি ছিলো সেই পান্ডুলিপিতে? কেন এই সতর্কতা? কেনই বা এত লুকোচুরি? লুকোচুরির কারণ বোঝা গেল পান্ডুলিপিটার 'ইমোশোনাল ডেভেলপমেন্ট' নামে একটা অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ পড়েই[10] –

> 'আমি যখন কারো জীবনী লিখি, তখন চেষ্টা করি সততার সাথে আর অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলতে। আমি মনে করিনা আমার নিজের জীবনীর ক্ষেত্রেও সেটা কোন ব্যতিক্রম হবে। কিন্তু বিভিন্ন বোধগম্য কারণে আমার জীবনের সবগুলো ব্যাপার আমার পক্ষে আগে ঠিক মত বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। আমি ভবিষ্যত মনোবিজ্ঞানী এবং সাইকোলজির ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য এমন একটি উপকরণ রেখে যেতে চাইছিলাম যেটা পড়ে তারা বুঝতে পারে, এমন মানুষও আছে যার কোন অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবৈকল্য ছিলো না, আগা- গোড়া একটি সুস্থ্য, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর জীবন উপভোগ করেছে, কিন্তু এমন একটি অনুভূতিময় কামনায় মত্ত ছিল – যা বর্তমান সমাজের চোখে আপত্তিকর। আর সেই অনুভূতির নাম – পুরুষে পুরুষে প্রেম – সমকামিতা!'

জন এডিংটন সিমন্ডস বড় হয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হিসবে। আর দশটা ছাত্রের মতই স্কুলে গিয়েছিলেন, বন্ধু বান্ধবেরও অভাব ছিলো না। কিন্তু তিনি ছোটবেলায় খেলাধূলা তেমন পছন্দ করতেন না, তার চেয়ে ঢের বেশি পছন্দ করতেন বই পড়তে। পরে অক্সফোর্ডে এসে গ্রীক সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে তার। গ্রীক সাহিত্য

[9] John Addington Symonds, The Memoirs of John Addington Symonds, Univ of Chicago Pr, 1986
[10] পূর্বোক্ত।

এবং ইতিহাস পড়েই সিমন্ডস বুঝতে পারেন সমকামিতা পৃথিবীর ইতিহাসে সবসময়ই ছিলো, কখনো প্রকাশ্যে, কখনোবা অপ্রকাশ্যে। বিশেষতঃ হোমারের *ইলিয়াড* পড়ে তিনি অভিভূত হন। গ্রীক দেবতা হার্মেসের কাহিনীও তাকে উদ্দীপ্ত করেছিল দারুনভাবে, উপন্যাসে বর্ণিত হার্মেসের সৌন্দর্য তার গভীরে তৈরি করল 'ফোয়ারার এক অবিনাশী ফল্গুধারা'[11] । সব মিলিয়ে গ্রীক সাহিত্য সিমন্ডসের সামনে খুলে দিলো প্রবৃত্তির এক অজানা দুয়ার।

এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিকালীন একটা সময়ে নিজের বাড়িতে যান অবসর কাটাতে। সেখানে তিনি তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট এক ছেলের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অচিরেই বুঝলেন এই সম্পর্ককে তিনি স্থায়ী করতে পারবেন না। তিনি যতই গ্রীক সাহিত্য পড়ুন না কেন, তিনি জানেন গ্রীক সমাজের সাথে ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের বিস্তর ফারাক। ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডে সমকামিতা শুধু অস্বীকৃত নয়, দন্ডনীয় অপরাধ। তিনি লিখলেন -

> I could not marry him; modern society provided no bond of comradeship whereby we might have been united. So my first love flowed to waste…

১৮৬১ সালে সিমন্ডস আরেকটি সমকামিতার সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, আলফ্রেড ব্রুক নামের একুশ বছরের এক যুবকের সাথে - কিন্তু সে সম্পর্কও স্থায়ী হয়নি। এ সময় বিভিন্ন মানসিক দ্বন্দ্বে তার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে থাকে। যৌন হতাশায় ভুগতে থাকেন সিমন্ডস। এর মধ্যে তিনি বেশ কয়েকজন ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হন। এদের মধ্যে একজন ' রক্ষিতা' রাখারও পরামর্শ দেন, কিন্তু সিমন্ডসের তা মনঃপূত হয়নি।

১৮৮৪ সালে বাবার চাপে পড়ে জ্যানেট ক্যাথেরিন নামের এক মহিলাকে বিয়ে করেন সিমন্ডস। ভাবলেন এর ফলে তিনি ' অস্বাভাবিকতা' থেকে মুক্তি পাবেন। বছর কয়েকের মধ্যেই তিনি চার সন্তানের পিতা হন। কিন্তু ধীরে ধীরে তার উপলব্ধি হতে শুরু করল যে, বিয়ে করাটা ছিলো তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। তিনি তার জীবনীতে লিখলেন - ' Perhaps the great crime of my life was my marriage.' ।

ধীরে ধীরে আবারো একাকী হয়ে উঠলেন সিমন্ডস। রোগ শোক প্রায়শঃই হানা দিতে থাকে আগের মতই। তার ডাক্তার পিতা সিমন্ডসের রোগ সনাক্ত করে বললেন তার টিবি হয়েছে। বায়ু পরিবর্তন করে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বেশীরভাগ সময়ই তিনি ইতালী এবং

[11] জন এডিংটন তার জীবনীতে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন - 'Hermes, in his prime and bloom beauty, unlocked some deeper fountains … in my soul' (source: The Memoirs of John Addington Symonds, পূর্বোক্ত)

সুইজারল্যান্ডে কাটাতে থাকেন। তিনি নিজেকে নিয়ে দুটো স্বতন্ত্র জগৎ তৈরী করে ফেললেন - একটা নিজের স্ত্রী- কন্যাদের জন্য, আর অন্যটি তার বন্ধু জগৎ নিয়ে। তার ফুসফুসের অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে তিনি স্ত্রীকে বলেন যে, তাদের একসাথে আর থাকা উচিৎ নয় - এত রোগ- শোক নিয়ে ঘর সংসার করে বউকে বিপদে ফেলা খুবই অনৈতিক। বলাবাহুল্য সমকামিতার ইতিহাসে সিমন্ডসই প্রথম কিংবা সর্বশেষ ব্যক্তি নন - যাকে ' সংসার' নামক এই দ্বিচারিতার সাথে প্রতিনিয়ত যুঝতে হয়েছে। এখনো সমাজের চাপে বহু সমকামীদেরই ' সংসার ধর্ম' পালন করতে হয়, অভিনয় চলতে হয় সমাজের আর দশটি ' স্বাভাবিক' মানুষের মতই। সমকামীদের জীবনের এ এক নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা।

এ সময় সিমন্ডস আবারো গ্রীক সাহিত্য এবং সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশুনা শুরু করেন। তিনি প্লেটো, অ্যারিস্টোফেন, জেনোফন এবং অন্যান্যদের নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতে থাকেন। এ সময়েই তিনি নীরবে, নিভৃতে রচনা করেন অষ্ট আশি পৃষ্ঠার একটা পুস্তিকা - ' A Problem in Greek Ethics' । ১৮৮৩ সালে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পুস্তিকাটির মাত্র দশ কপি ছাপিয়েছিলেন আর বিতরণ করেছিলেন তার খুব কাছের বন্ধুমহলে। এ বইয়ে তিনি গ্রীক সংস্কৃতির পাইদারেস্তিয়া বা কিশোর প্রেম, ইরোমেনোস - ইরাস্তেস সহ বহু হারিয়ে যাওয়া বিষয় আশয় অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় তুলে আনেন। তিনি তার বইয়ে স্পষ্ট করে লেখেন -

> বহু মেডিকেল ডাক্তার এবং আইনী লেখকেরা মোটেও অবগত নন যে, ইতিহাসের পাতায় বহু মহান এবং উন্নত জাতির অস্তিত্ব আছে যারা সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো না, বরং ছিলো পুরোপুরি সহানুভূতিশীল। এমনকি, তারা সমকামিতার চর্চা করে আত্মিক এবং সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছিলো।

বছর খানেক পরে তিনি আরেকটি বই লেখেন - The problem in Modern Ethics (১৮৯১)। তিনি এ বইয়ে সমকামিতার তৎকালীন ধ্যান ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ- মনস্তাত্বিক কারণ লিপিবদ্ধ করেন। এই বইয়ে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সমকামিতা সম্পর্কে নিবর্তনমূলক ধ্যান ধারণা আর আইন কানুন রহিত করা প্রয়োজন। এই বইটি পঞ্চাশ কপি ছাপিয়েছিলেন সিমন্ডস এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মাঝে বিতরণ করেন। তাদের বলে দেয়া হয় যে, তারা বইটি পড়ার সময় বইয়ের পাশে নোট লিখে যেন লেখককে আবার ফেরৎ দেন। ঠিক এ সময়ই বিখ্যাত ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ডকে সমকামিতার অপরাধে দুই বছরের দন্ড পোহাতে হয়। সম্ভবতঃ সিমন্ডস এ কারণেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

সমকামিতার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ‘এ প্রবলেম অব গ্রীক এথিক্স’ এবং ‘প্রবলেম অব মডার্ণ এথিক্স’ – বই দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম। এ দুটো বইকে বর্তমানে ইংরেজী সাহিত্যের জগতে প্রথম দিককার পুস্তক হিসেবে বিবেচনা করা হয় যেখানে পুরুষে পুরুষে প্রেমের সরাসরি তথ্যসূত্র বিশ্বস্তভাবে সন্নিবেশিত হয়েছিলো। তা সত্ত্বেও সিমন্ডসের মনে হয়েছিলো সমকামিতা সম্বন্ধে মানুষজনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সচেতন করতে হলে চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাপারগুলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু সিমন্ডস নিজে চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন বিশেষজ্ঞ না হওয়ায় এদিক থেকে সন্তুষ্টি পাচ্ছিলেন না। ঠিক এসময়ই ১৮৯০ সালে তার সাথে পরিচয় ঘটে ব্রিটিশ ডাক্তার হ্যাভলক এলিসের সাথে। এ যেন ছিলো সঠিক সময়ে সত্যিকার মনি- কাঞ্চন যোগ।

এ প্রসঙ্গে পাঠকদের জন্য হ্যাভলক এলিস সম্বন্ধেও কিছু বলে নিতে হয়। সে সময় এলিস ছিলেন সিমন্ডসের চেয়ে প্রায় বছর বিশেক ছোট। নিজে সমকামী না হলেও হ্যাভলক এলিসের স্ত্রী ছিলেন সমকামী[12]। ফলে তিনি খুব কাছ থেকে সমকামীদের জীবন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমকামিতার আইনী স্বীকৃতির আগে এই প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়া দরকার । ১৮৯৭ সালে তিনি প্রকাশ করেন ‘Sexual Inversion’ নামের একটি অনন্যসাধারণ গ্রন্থ। গ্রন্থটি এলিসের বলা হলেও আসলে গ্রন্থটি লিখেছিলেন এলিস এবং সিমন্ডস দু’জনে মিলে। হ্যাভলক এলিস লিখেছিলেন বইটির মূল অংশ – চিকিৎসাস্ত্র এবং জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে, আর ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক তথ্য সরবরাহ করেছিলেন জন এডিংটন সিমন্ডস। এ ছাড়াও সিমন্ডস ‘উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গী’ নামে একটি অধ্যায় বইটিতে নিজের নামেই সংযুক্ত করেন এবং তার পুর্বেকার লেখা ‘প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স’ সন্নিবেশিত করেন বইয়ের পরিশিষ্টে। বইটির প্রথম মূদ্রণ দু’জনের নামেই প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৯৭ সালে। কিন্তু বইটি প্রকাশের পর সিমন্ডেসের পরিবারের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হল – প্রকাশকের কাছে দাবী করা হল যেন, বইটি থেকে সিমন্ডসের নাম এবং সমস্ত রেফারেন্স তুলে নেয়া হয়। সিমন্ডসের বইয়ের সম্পাদক হোরাশিও ব্রাউন সব জায়গা খুঁজে খুঁজে বইটির কপি সংগ্রহ করে বাজার থেকে তুলে নেয়ার প্রচেষ্টা চালান, যদিও কিছু কপি তার হাতের ফাঁক গলে ঠিকই পাঠকদের হাতে পৌঁছিয়ে গিয়েছিলো। এই চাপ সামলাতে গিয়ে এলিসকে মহা বিপদে পড়তে হয়। অবশেষে, বইটির দ্বিতীয় মূদ্রণ প্রকাশের সময় এলিস সিমন্ডসের নাম তুলে নেন,

[12] যে কোন বিচারে হ্যাভলক এলিস এবং তার স্ত্রী এডিথ লীজের বিয়ে ছিল সে সময়ের প্রেক্ষাপটে খুবই ব্যতিক্রমী। এলিসের স্ত্রী এডিথ লীজ ছিলেন নারীবাদী কবি (তার অন্য চার বোনেরা ছিলেন আবার সবাই অবিবাহিত)। তারা পারস্পরিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও দু’জনেই সাড়া জীবন মুক্ত সম্পর্কে (Open relationship) আস্থাশীল ছিলেন, এবং একে অন্যের যৌনস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেন না । যৌনতার ব্যাপারে তারা ছিলেন সমস্ত সামাজিক সংস্কারের উর্ধ্বে।

‘প্রবলেম ইন গ্রীক এথিক্স’ অংশটি পরিশিষ্ট থেকে বাদ দেন ‘উলরিচসের দৃষ্টিভঙ্গী’ অধ্যায়টির লেখক হিসেবে অজ্ঞাত ‘Z’ অন্তর্ভুক্ত করেন; এবং সিমন্ডসের দেওয়া তথ্যসূত্রকে ‘বিশ্বস্ত সূত্রে’ পাওয়া বলে উল্লেখ করেন[13]। বইটির এই পরিবর্তিত মূদ্রণটি চিকিৎসকদের মধ্যে যথেষ্টই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল, যেটা ছিলো আসলে তাদের বইটি লেখার পেছনে মূল অনুপ্রেরণা।

এই বইয়েই প্রথম বারের মত ইবিং- এর সমকামিতাকে ‘বিকৃতি’ বা ‘ব্যাধি’ হিসবে প্রচার করার প্রচেষ্টার বিরোধিতা করা হয় – বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে। এলিস বইটিতে ইবিং এর ‘অধঃপতন’ তত্ত্বের বিপক্ষে শক্তিশালী যুক্তি হাজির করেন, তিনি বইটিতে ইবিং- এর হস্তমৈথুনের সাথে সমকামিতার সম্পর্কের ধারণাও বাতিল করে দেন। আর তারপর ১৯১৫ সালে এলিস প্রকাশ করেন আরেকটি গ্রন্থ ‘Psychology of Sex’। এলিস যে সময় এ ধরণের গবেষণা শুরু করেছিলেন সে সময়টায় ইংল্যান্ড ছিল পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল। ফলে গবেষণা করতে গিয়ে এলিসকে দূর্বিসহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তার প্রথম বই প্রকাশের পর বইয়ের সবগুলো কপি পুড়িয়ে ফেলা হয়। প্রকাশককে পেতে হয় কঠিন শাস্তি। পরে তার গবেষণাকাজের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল[14]।

সমকামিতার গবেষনায় আরেকজন গবেষক - যার গুরুত্ব অপরিসীম তিনি হলেন জার্মানীর মনোবিজ্ঞানী ম্যাগনাস হার্চফিল্ড। তিনি সমকামীদের ‘তৃতীয় লিঙ্গ’ নামে অভিহিত করে সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ সংক্রান্ত সনাতন ধারনা খন্ডন করতে প্রয়াসী হন। শুধু গবেষনাই নয়, তিনি সে সময় ‘সায়েন্টিফিক এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান কমিটি’ নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হার্চফিল্ড ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ একজন মানুষ। তিনি যুক্তিনির্ভর কথা বলতেন এবং সব ধরনের বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা এবং বক্তব্যকে স্বাগত জানাতেন। সমকামিতার নানান দিক বিশ্লেষণ করার জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, মনোবিজ্ঞানী, নৃতাত্ত্বিক এবং আইনজ্ঞদের তাঁর সংস্থায় স্থান করে দিয়েছিলেন। তার কমিটির শ্লোগান ছিল – ‘জাস্টিস থ্রু সায়েন্স’।

---

[13] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, পূর্বোক্ত।

[14] কথিত আছে, এক পুলিশের গোয়েন্দা ১৮৯৮ সালের ২৭ শে মে লন্ডনের একটি বইয়ের দোকান থেকে দশ শিলিং দিয়ে ‘সেক্সুয়াল ইনভারশন’ নামে একটি বই ক্রয় করেন। এর চারদিন পরে পুলিশ দোকানে এসে জর্জ বেডব্রাউ নামে দোকানের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করেন দোকানে ‘অশ্লীল’ বইপত্র রাখার অযুহাতে। এলিসকে গ্রেফতার করা না হলেও এলিস এবং প্রকাশকের উপর দিয়ে রীতিমত ঝড় বয়ে যায় সে সময়। পত্র- পত্রিকাতেও নানা রকমের রং- বেরঙের কেচ্ছা কাহিনী লেখা হতে থাকে। বেডব্রাউকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং শাস্তি দেয়া হয়। এলিস সব কিছু দেখে এতই ক্ষুব্ধ হন যে তিনি তার পরবর্তী বই আর ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশ করবেন না বলে মনস্থ করেন।

বস্তুতঃ এই সংস্থার উদ্যোগে জার্মানীতে প্রথমবারের মত বৈজ্ঞানিকভাবে সমকামী মানসিকতার কারণ নির্ণয় করা শুরু হয়। শুধু তাই নয়, সমকামিতার আইনী স্বীকৃতির ব্যাপারে এই সংস্থা সচেষ্ট হয়। তখনকার জার্মান ফৌজদারী দন্ডবিধির ১৭৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সমকামিতা বিষয়ক আইন সংশোধনের জন্য হার্চফিল্ড পাঁচ হাজার বুদ্ধিজীবীর স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত সরকারের কাছে পেশ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে সহযোগী গবেষক ইভান ব্লোচের সাথে মিলে সমকামী মানুষদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং যৌনতা সম্বন্ধে দৃষ্টিভংগী পাল্টানো্র জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেন, এবং এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য 'Institut für Sexualwissenschaft' নামে আরেকটি সংগঠনও গড়ে তুলেন। ১৯৩৩ সালে নাৎসীরা ক্ষমতায় এসে হার্চফিল্ডের কাজ বন্ধ করে দেয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আজকে ইন্টারনেটে নাৎসী বাহিনীর বই- পোড়ানোর যে সমস্ত ছবি পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই আসলে হার্চফিল্ডের বিভিন্ন লাইব্রেরীর[15] ।

চিত্রঃ নাৎসী বাহিনী ১৯৩৩ সালে ক্ষমতা দখলের পর হার্চফিল্ড এবং সমমনা সমস্ত লেখকদের বই পত্র পুড়িয়ে দেয়।

এত কিছু করেও কিন্তু এ সংক্রান্ত গবেষণা থামিয়ে রাখা যায় নি। ফার্ডিন্যান্ড হ্যাক, এডিংটন সায়মন্ডস, ইভান ব্লোচ, ক্লারা থমসন, থিডর হেনরিখ, ইরভিং বেইবার, অটো

[15] 'The press-library pictures & archival newsreel film of Nazi book-burnings seen today are usually pictures of Hirschfeld's library ablaze', wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Hirschfeld

গ্রস, হুকার, মিলার, স্কোফিল্ড, হেনরি বেঞ্জামিন প্রমুখ গবেষকের বহুমুখী গবেষণা গহীন আঁধার থেকে সমকামিতাকে নিয়ে আসল দিনের আলোয়। এদের মত গবেষকদের জন্যই সহমর্মিতা আর সহিষ্ণুতার ঢেউ এসে লাগে সমাজে। একদিন যাদের অচ্ছুৎ বলে গন্য করা হত, দেখা হত সমাজের 'নিকৃষ্টতম জীব' হিসেবে, তাদের প্রতি বাড়িয়ে দেওয়া হল সাহায্যের হাত। সারা পৃথিবী জুড়ে বহুসংগঠন গড়ে উঠল এই সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক মানুষদের সাহায্য করার এবং তাদের মানবিক অধিকার রক্ষার তাগিদে। রক্ষণশীলতা, প্রগতিশীলতা, বিজ্ঞান ও বাস্তবতার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ আর প্রতিসংঘর্ষে একটা সময় যৌনতা সংক্রান্ত সনাতন ধারনাই গেল পালটে। পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তির বিপ্লব, এনলাইটমেন্টের পাশাপাশি হাত ধরে বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করল 'যৌনতার বিপ্লব' – যা মানুষের যৌণতাসংক্রান্ত সামাজিক এবং মনঃস্তাত্বিক ধ্যান ধারণাকেই আমূলভাবে পালটে দিল। আর যে ব্যক্তিটির গবেষণা এই যৌনতার বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন আমেরিকার ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রানীবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আলফ্রেড কিন্সে (১৮৯৪ - ১৯৫৬)।

কথিত আছে, প্রকৃতিপ্রেমিক এই তরুণ প্রফেসর কিন্সে গল ওয়াস্প নামে একধরনের বোলতার উপর ক্লাসে একদিন লেকচার দিচ্ছিলেন। সেখান থেকে আলোচনা কোন একভাবে চলে গেল বোলতাদের যৌনপ্রবৃত্তির দিকে। ক্লাসের অনেক ছাত্র সুযোগ পেয়ে এ সময় নানাধরনের প্রশ্ন করা শুরু করল। কখনও বা তা চলে গেল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তির দিকেও। কিন্সে তার জীববিজ্ঞানের সীমিত জ্ঞানের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের কৌতুহল মেটাতে থাকলেন। পুরো ক্লাস পরিণত হল এক 'সরস' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এমনকি এর জের পুরোমাত্রায় বজায় রইল ক্লাসের বাইরেও। অনেক ছাত্র- ছাত্রী কিন্সের কক্ষে এসে ব্যক্তিগতভাবে যৌনতা বিষয়ে নানা ধরণের পরামর্শ চাওয়া শুরু করল। কিন্সে দেখলেন, এই বিষয়টি নিয়ে ছাত্র- ছাত্রীদের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর, কিন্তু পুরো বিষয়টিকে ঢেকে রাখা হয়েছে নীতি- নৈতিকতার অদৃশ্য কালো চাঁদরে। তিনি বুঝতে পারলেন, 'সেক্স নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা না করার' এই চিরায়ত সনাতনী প্রথাটা যে করেই হোক ভাংতে হবে। তিনি ছাত্রদের ডীনের কাছে ধর্না দিলেন, এবং ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে যৌনশিক্ষার একটি কোর্স চালু করার পক্ষে ওকালতি শুরু করলেন। বললেন, ছাত্র- ছাত্রীরা যে হারে আমাদের দেশের মত 'রসময়গুপ্ত মার্কা' চটি বই পড়ে সেক্স সম্বন্ধে ভুল ভাল ধারণা পাচ্ছে, তার থেকে আমরা একাডেমিকভাবে কিছু পড়াই না কেন! কিন্সে শেষ পর্যন্ত তার আবেদন মঞ্জুর করিয়ে ছাড়লেন। তিনি ফুল হাউজ অডিটোরিয়ামে একাডেমিকভাবে প্রথম 'সেক্স কোর্স' –এর উপর ক্লাশ নিতে শুরু করলেন। তবে সে ক্লাস উন্মুক্ত ছিল কেবল শিক্ষকবৃন্দ, গ্র্যাজুয়েট কিংবা সিনয়র ছাত্র, কিংবা বিবাহিত ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য। কিন্সে আগের মতই ছাত্র- ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের

উত্তর দিয়ে কৌতুহল মিটাতে লাগলেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে খুব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি এবং যৌনজীবনের উপর বিজ্ঞানভিত্তিক কোন ভাল সমীক্ষাই বাজারে নেই। ফলে একটা সময় কিন্সের নিজেকেই যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে গবেষণায় নামতে হল। সম্পূর্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমীক্ষার প্রয়োজনে প্রশ্নাবলী তৈরি করলেন, এবং দীর্ঘ সময় ধরে এ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্মোহভাবে এ গবেষণা চালিয়ে ১৯৪৮ সালে লিখলেন 'Sexual Behavior in the Human Male' নামে একটি যুগান্তকারী বই; এবং এর পাঁচ বছর পর ১৯৫৩ সালে বের করেন 'Sexual Behavior in the Human Female'। গ্রন্থদুটির মধ্য দিয়ে মানব জীবনের এমন কিছু দিক উন্মোচিত হল যা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য নতুন, এবং অনেকের কাছেই খুব 'অস্বস্তিকর'। এমনকি এসব তথ্য দেখে কিন্সে নিজেও খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই কিন্সের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এল, মানুষকে সামাজিকভাবে কেবল বিষমকামী বলা একেবারেই ঠিক নয়, বহু মানুষ আছে যারা যৌনপ্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে সমকামী। শুধু তাই নয়, তিনি বললেন, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল বিষমকাম আর সমকাম – মোটা দাগে এই দু'ভাগ করাটাও বোকামী। যৌনতার সম্পুর্ণ ক্যানভাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিমাপ করার জন্য কিন্সে উদ্ভাবন করলেন তার বিখ্যাত 'কিন্সে স্কেল'। এ স্কেল সমন্ধে কিন্সে তার বইয়ে বলেন[16],

> 'পুরো জনসমষ্টিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই নির্দিষ্ট ভুবনের বাসিন্দা মনে করা ভুল হবে। পৃথিবীটা কেবল – ছাগল আর ভেড়ায় বিভক্ত নয়। প্রকৃতিতে খুব কম ক্ষেত্রেই এ ধরণের চরমসীমার রাজত্ব দেখা যায়, এর চেয়ে বরং এখানে থাকে বিবিধ উপাদানের সুষম বন্টন।'

কিন্সের স্কেলেটি নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। স্কেলের দুই প্রান্তকে '০' এবং '৬' হিসেবে চিহ্নিত হয়। ০ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা পরিপূর্ণভাবে বিষমকামী, আর ৬ দাগে অবস্থিত ব্যক্তিরা সম্পুর্ণভাবে সমকামী। দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী অবস্থা পাঁচটিভাগে বিভক্ত; এবং ওই পাঁচটি অবস্থার মধ্য দিয়ে যৌনতার যে রূপ প্রতিভাত হচ্ছে তাকে উভকামিতা বলাই শ্রেয়, যদিও উভকামিতার রকমফের আছে। নীচের ছকটি দেখলে এ সম্বন্ধে আরেকটু ভাল বোঝা যাবে :

[16] Wardell B. Pomeroy, Clyde E. Martin, Alfred C. Kinsey Paul H. Gebhard , Sexual Behavior in the Human Female, AND Sexual Behavior in the Human Male, W. B. Saunders Company , 1953

রেটিং	বর্ণনা
০	পরিপুর্ণভাবে বিষমকামী
১	মূখ্যত বিষমকামী, কদাচিৎ সমকামী
২	মূখ্যত বিষমকামী, কিন্তু প্রায়শই সমকামী
৩	বিষমকামিতা এবং সমকামিতার প্রভাব সমান
৪	মূখ্যত সমকামী, কিন্তু প্রায়শই বিষমকামী
৫	মূখ্যত সমকামী, কদাচিৎ বিষমকামী
৬	পরিপুর্ণভাবে সমকামী
X	অযৌনপ্রজ (Asexual)

উপরের ছকটি কিন্সের স্কেলের সারমর্ম বলা যেতে পারে, যদিও কিন্সে বইটি লিখার সময় অযৌনপ্রজদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এটি স্কেলে অন্তর্ভুক্ত হয় পরে। আগেই বলা হয়েছে '০' দাগাঙ্কিত কক্ষটি থাকে পরিপুর্ণভাবে বিষমকামীদের দখলে। এই কক্ষে থাকা লোকেরা কখনোই সমকামের সাথে যুক্ত হয় না। '১' চিহ্নিত কক্ষে অবস্থানরত ব্যক্তিরা মূলতঃ বিষমকামী হওয়া সত্ত্বেও কালেভদ্রে সমকামিতার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। এরা পরিবেশ- পরিস্থিতির কারণে কিংবা কৌতুহলবশতঃ হঠাৎ করে সমকামী সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেও এর সাথে কোন গভীর মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে না। '২' চিহ্নিত কক্ষের লোকেরা প্রবৃত্তিগত দিক দিয়ে এদের মতই, কিন্তু এদের সমকামী প্রবণতা আরেকটু বেশি

; কিন্তু তারপরও তা কখনোই বিষমকামীতাকে ছাপিয়ে যায় না। '৩' নম্বর কক্ষের আধিবাসীরা হয়ত সত্যিকার উভকামী। এদের সম্পর্কে কিন্সে বলেন[17], 'তারা সমানভাবে দুই ধরণের সংশ্রবই গ্রহণ এবং উপভোগ করে থাকে। কোনটির উপরেই তাদের কোন নির্দিষ্ট পক্ষপাতিত্ব নেই।' '৪' নং কক্ষের সদস্যরা সমকামী হওয়া সত্ত্বেও প্রায়ই বিষমকামের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। একইভাবে '৫' নং কক্ষে এমন কিছু মানুষের সন্ধান মিলবে যারা সমকামী হয়েও মাঝে মধ্যে কিংবা কদাচিৎ বিষমকামে জড়িয়ে পড়ে।

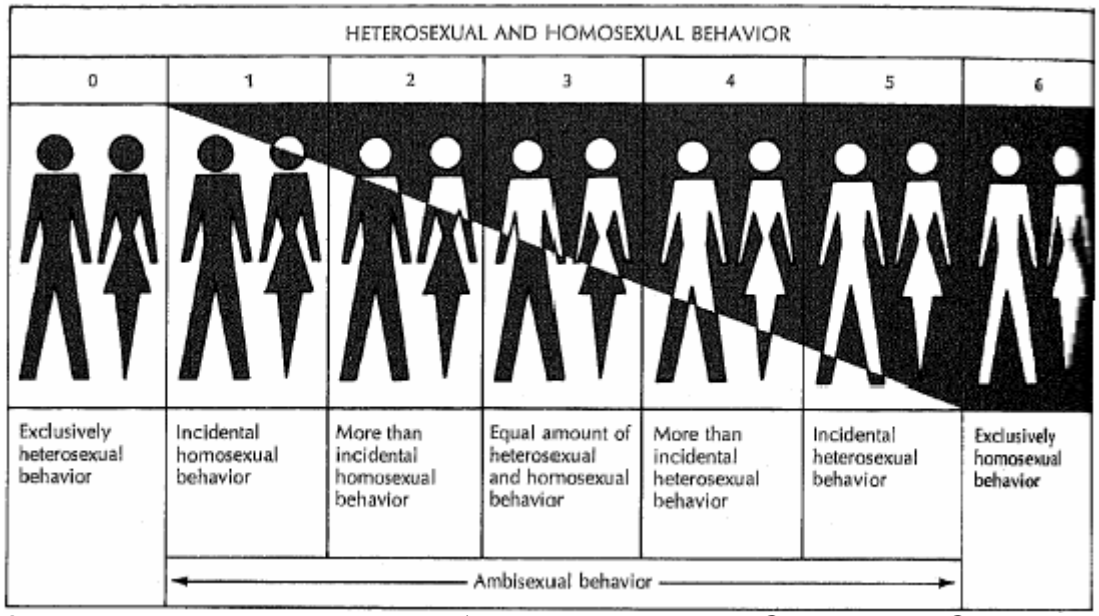

চিত্র : কিন্সে স্কেল থেকে বোঝা যায়, যৌনপ্রবৃত্তিকে কেবল সমকামী আর বিষমকামী – এ দুই ভাগে ভাগ করা ভুল হবে ।

'৬' নং কক্ষের বাসিন্দারা পরিপূর্ণ সমাকামী। ছকটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, ০ এবং ৬ বিপরীত মেরুতে। তেমনিভাবে ১ এবং ৫ পরস্পরের বিপরীত। ঠিক একইভাবে ২ এর বিপরীতে ৪ এর অবস্থান। অর্থাৎ, ০ এবং ৬ –এই চরমসীমা বাদ দিলে বাকী পাঁচটি কক্ষের অধিবাসীরা কমবেশি উভকামী।

যৌনপ্রবৃত্তি নিয়ে কিন্সের যুগান্তকারী গবেষণা বই আকারে প্রকাশের পর পরই ড. কিন্সে তৎক্ষনাৎ সেলিব্রিটিতে পরিণত হয়ে গেলেন। ১৯৫৩ সালের অগাস্টের ২৪ তারিখে ড. কিন্সেকে নিয়ে টাইম ম্যাগাজিনে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন বের হল, এবং তাতে লেখা হল – 'কিন্সে সেক্সের ক্ষেত্রে সেই কাজটিই করলেন যে কাজটি অনেকদিন আগে কোপার্নিকাস করেছিলেন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে'। এমনকি তাকে নিয়ে একটি কমিক বই পর্যন্ত বাজারে

[17] পূর্বোক্ত।

বের হয়ে গেল – "ওহ! ড. কিন্সে'। মার্থা রে'র লেখা এই কমিক বই- এর বিক্রি সে সময়ই আধা মিলিয়নে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চিত্রঃ টাইম ম্যাগাজিনের (আগাস্ট ২৪, ১৯৫৩) প্রচ্ছদে ড. কিন্সে

কিন্সে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণার মাধ্যমে নতুন ধারা তৈরি করার পর আরো বহু গবেষক এ ধরনের কাজে এগিয়ে এলেন। এর মধ্যে সান্ড্রা বেম, জ্যানেট স্পেন্সর, রবার্ট হেলম্রিখ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে যৌণ মনোবিজ্ঞানীদের নানা পদের গবেষণায় নতুন নতুন তত্ত্বের আগমন ঘটতে লাগল। এর সাথে যোগ দিলেন জীববিজ্ঞানীরাও। মনঃস্তাত্বিক, আচরণগত, সমাজ- সাংস্কৃতিক, এবং যৌন অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জেনেটিক, কগনিটিভ, হরমোনাল, শরীরবৃত্তিয়, মস্তিস্ককেন্দ্রিক এবং বিবর্তনীয় নানা রকমের গবেষনা যৌনপ্রবৃত্তির নানা আকর্ষণীয় দিক উন্মোচন করে চলল। প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে আমরা ঝালাই করে নিতে থাকলাম আমাদের পরিপার্শ্বিকতাকে।

১৯৮০ সালে ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল স্টর্মস এর একটি গবেষণা পত্রে মত প্রকাশ করলেন[18], যৌন প্রবৃত্তি নির্ধারিত হওয়া উচিৎ কোন ব্যক্তির ফ্যান্টাসি এবং কামপ্রবণতার (eroticism) উপর নির্ভর করে, কারো দৈনন্দিন যৌনকর্মের উপর

[18] Michael D. Storms, Theories of sexual orientation. Journal of Personality and Social Psychology 38: 783-792, 1980.

ভিত্তি করে নয়। তিনি দেখালেন, কোন কোন সময় উভকামীর ফ্যান্টাসির জগৎটা এমনভাবে আচ্ছন্ন থাকে যে, তা কেবলমাত্র পরিপূর্ণ বিষমকামের সাথেই তুলনীয়। আবার বিপরীত ছবিটাও কখনো সখনো প্রকট হয়ে উঠে। অর্থাৎ, উভকামীর মধ্যে দেখা দিতে পারে তীব্র সমকামিতার প্রকাশ।

এরপর ১৯৮৫ সালে ফ্রিৎস ক্লেইন তার সহযোগী সেপেকফ এবং উলফের সাথে মিলে যৌনতা পরিমাপের একটু ভিন্নধর্মী স্কেল উদ্ভাবন করেন; একে 'Klein Sexual Orientation Grid' নামে অভিহিত করা হয়। কিন্সের স্কেলটি ছিল সরল রৈখিক এবং একমাত্রার। ক্লেইন একে দ্বিমাত্রার ছক (মেইট্রিক্স) আকারে প্রকাশ করেন। তিনি যৌনতাকে স্থবির নয়, বরং 'গতিশীল' এবং 'বহু চলক সমৃদ্ধ' জটিল ব্যাপার বলে মনে করেন। তিনি তার ক্লেইন- স্কেল নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যোগ করেন এবং মত প্রকাশ করেন - যৌনতার ব্যাপারটি পুরোপুরি বুঝতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন; এগুলো হল, যৌনপ্রবৃত্তি, যৌন আচরণ, যৌন আকর্ষণ, যৌনতা সম্বন্ধে ফ্যান্টাসি, আবেগ, যৌন সঙ্গী, জীবন ধারা, আত্মপরিচয় ইত্যাদি। এইভাবে নতুন- নতুন গবেষণায় প্রতিনিয়ত উন্মোচিত হতে থাকে যৌনতা বিষয়ক নানান দিক। তবে তারপরও কিন্সের গুরুত্ব কখনোই ম্লান হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, যৌনতা বিষয়ে সমস্ত গবেষণার ভিত্তি হিসেবে কিন্সের গবেষণাকে চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য কিন্সের গবেষণার প্রায় ষাট বছর পরে আজও গবেষক রবার্ট এপস্টেইন সায়েন্টিফিক আমেরিকান মাইন্ডের একটি বইয়ে (২০০৬) লেখেন :

> "Ever since the late 1940s, when biologist Alfred Kinsey published his extensive reports on sexual practices in the U.S., it has been clear, as Kinsey put it, that people "do not represent two discrete populations, heterosexual and homosexual....The living world is a continuum in each and every one of its aspects." A recent position statement by the APA, the American Academy of Pediatrics and eight other national organizations agrees that "sexual orientation falls along a continuum." In other words, sexual attraction is simply not a black-and-white matter, and the labels "straight" and "gay" do not capture the complexities."

যৌনপ্রবৃত্তি যে কেবল সাদা- কালো এই দুই চরমসীমায় বিভক্ত নয় – মানব সমাজে এই চিন্তা- চেতনার ক্রমোত্তরণ ঘটানোর জন্য যে ব্যক্তিটির গবেষণা সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তিনি হলেন জীববিজ্ঞানী আলফ্রেড কিন্সে। মুলতঃ কিন্সের গবেষণাই ষাটের

দশকে সূচিত করে যৌনতার বিপ্লবের (sexual revolution) এবং পরবর্তীতে উন্মোচন করে দেয় লেসবিয়ন, গে, বাইসেক্সুয়াল এবং ট্রান্সজেন্ডারদের মত সংখ্যালঘু মানুষের 'এলজিবিটি[19] আন্দোলনের' দুয়ার। তবে সেসমস্ত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে ঢুকবার আগে আমাদের আধুনিক জীব বিজ্ঞান আর জেনেটিক্সের বইয়ের পাতায় একটু ভালমত চোখ রাখা দরকার। কারণ হরমোন, শরীরবৃত্তীয় এবং জিন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষনা ধীরে ধীরে কাটাতে সাহায্য করেছে ধোঁয়াশার অস্বচ্ছ মেঘ। আগামী অধ্যায়গুলোতে আমি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। এ সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণার ফলাফলে চোখ রাখলেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব সমকামিতার কতটুকু জেনেটিক, আর কতটুকুই বা পরিবেশগত।

[19] LGBT (or GLBT) is an acronym referring collectively to lesbian, gay, bisexual, and transgender people.

ষষ্ঠ অধ্যায়

গে মস্তিস্ক এবং গে জিনের খোঁজে

সমকামীদের যৌনপ্রবৃত্তি আমাদের পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ বিষমকামী লোকজনের থেকে আলাদা, এটা আমরা জানি। কারণ তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে আকর্ষণ অনুভব করে সমলিঙ্গের প্রতি। যেহেতু বিজ্ঞানের কাজই হচ্ছে প্রতিটি ঘটনার পেছনে যুক্তিনিষ্ঠ কারণ অনুসন্ধান, তাই বৈজ্ঞানিক পেশায় নিয়োজত অনেক গবেষকই অনুমান করলেন সমকামিতার পেছনেও নিশ্চয় কোন বৈজ্ঞানিক কারণ থাকতে হবে। কিন্তু কারণের উৎসটা কোথায়? তাদের মস্তিস্কের আকার, আকৃতি বা গঠন কি সাধারণদের থেকে একটু আলাদা? এ ব্যাপারটি বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে পুরোমাত্রায়। ভাবনার কারণ আছে। কারণ যৌন- প্রবৃত্তির কেন্দ্রীয় উৎস হল মস্তিস্ক। মস্তিস্কই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের নানা পছন্দ, অপছন্দ, ঘৃণা, অভিরুচি আর ফ্যান্টাসি। মস্তিস্কই জীবনের বিভিন্ন চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে সিদ্ধান্তে আসে আমাদের ঐশ্বরিয়াকে ভাল লাগতে হবে, নাকি শাহরুখকে। মস্তিস্কই সিদ্ধান্ত নেয় এই মুহূর্তে আমাদের ভুতের গল্প ভাল লাগবে, নাকি আবেগময় রোমান্টিক উপন্যাস। কাজেই যৌনপ্রবৃত্তি তৈরীতে মস্তিস্কের ভূমিকাটা কি সেটা বিজ্ঞানীদের জন্য খুব ভাল করে বোঝা চাই। কিন্তু সমকামী মস্তিস্ক বিশ্লেষণের আগে বিজ্ঞানীরা আরেকটি জিনিস খুব গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। সেটা হচ্ছে নারী পুরুষের মস্তিস্ক আর অর্জিত ব্যবহারে পার্থক্য।

মস্তিস্কের যৌনতা : নারী বনাম পুরুষ

বিজ্ঞানীরা প্রথম এধরণের গবেষণা শুরু করেছিলেন ল্যাবরেটরিতে ইঁদুরদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে। ১৯৭৮ সালে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেন ছেলে ইঁদুরের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাস (hypothalamus) নামের প্রত্যঙ্গটি মেয়ে ইঁদুরের থেকে তিনগুন বড়। ঠিক একই ধরণের পার্থক্য বিজ্ঞানীরা পরবর্তীতে পেলেন মানুষের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করেও। পুরুষ মস্তিস্কের সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াসের (suprachiasmatic nucleus) আকার মেয়েদের চেয়ে প্রায় ২.৫ গুন বড় হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে কর্পাস কালোসাম (corpus callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের (anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের

প্রত্যঙ্গগুলোর তুলনায় বিবর্ধিত পাওয়া গেছে। কিন্তু এগুলোর কোন প্রভাব কি প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় আছে? এক কথায় জবাব দেয়া মুশকিল। জীববিজ্ঞানীরা যেমন পুরুষ-নারীর মস্তিস্কের আকার আয়তন আর গঠন নিয়ে গবেষণা করেছেন, তেমনি তাদের অর্জিত ব্যবহার নিয়ে নানা ধরণের কৌতুহলোদ্দীপক কাজ করে চলেছেন বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা[1]। তারা বলেন, ডারউইনের 'যৌনতার নির্বাচন' (Sexual selection) বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা রেখে থাকে তবে এর একটি প্রভাব আমাদের দীর্ঘদিনের মানসপট তৈরিতেও পড়বে। যৌনতার উদ্ভবের কারণে সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে নারী-পুরুষ একই মানব প্রকৃতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়ছে এক ধরণের মনোদৈহিক পার্থক্য – জৈববৈজ্ঞানিক পথেই। মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে, ছেলে মেয়েদের পারস্পরিক চাহিদা পছন্দ, অপছন্দে যেমন মিল আছে, তেমনি আবার কিছু ক্ষেত্রে আছে চোখে পড়ার মতই পার্থক্য। এটা হবার কথাই। নারী পুরুষ উভয়কেই সভ্যতার সূচনার প্রথম থেকেই ডারউইন বর্নিত 'সেক্সুয়াল সিলেকশন' নামক বন্ধুর পথে নিজেদের বিবর্তিত করে নিতে হয়েছে, শুধু দৈহিকভাবে নয় মন মানসিকতাতেও। দেখা গেছে, ছেলেরা আচরণগত দিক দিয়ে মেয়েদের চেয়ে অনেক প্রতিযোগিতামূলক (competitive) হয়ে থাকে। ছেলেদের স্বভাবে প্রতিযোগিতামূলক হতে হয়েছে কারণ তাদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে প্রতিযোগিতা করে, যুদ্ধ বিগ্রহ করে বাঁচতে হয়েছে আদি কাল থেকেই। যারা এ ধরনের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকতে পেরেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীর বুকে রেখে যেতে পেরেছে।

আধুনিক জীবনযাত্রাতেও পুরুষদের এই প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতাকে একটু চেষ্টা করলেই ধরা যাবে। একটা মজার উদাহরণ দেয়া যাক। আমেরিকার একটি জরিপ থেকে দেখা গেছে গাড়ি চালানোর সময় কখনো পথ হারিয়ে ফেললে পুরুষেরা খুব কমই পথের অন্য মানুষের কাছ থেকে চায়। তারা বরং নিজেদের বিবেচনা থেকে নিজেরাই পথ খুঁজে নিতে তৎপর হয়, না পারলে বড়জোর পথ- চিহ্ন বা মানচিত্রের দ্বারস্থ হয়, কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না । আর অন্যদিকে মেয়েরা প্রথমেই গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেয়। আসলে পুরুষেরা গাড়ি থামিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পছন্দ করে না, কারণ তাদের 'আত্মভরি' মানসিতার কারণে ব্যাপারটাকে তারা 'যুদ্ধে পরাজয়' হিসেবে বিবেচনা করে ফেলে নিজেদের অজান্তেই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের মানসপটে এত প্রবলভাবে রাজত্ব করে না বলে তারা সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করে

[1] বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান মুলতঃ বিজ্ঞানের দুটো চিরায়ত শাখাকে একীভুত করেছে; একটি হচ্ছে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞান (evolutionary biology) এবং অন্যটি বৌদ্ধিক মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology)। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বিষয়ে আমার একটি ই-বুক মুক্তমনা ওয়েব সাইট থেকে ডাউন লোড করা যাবে। ঠিকানা - http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/Manob_prokriti_Avijit.pdf । এ অধ্যায়টির বেশ কিছু অংশ আমার বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের উপর করা ইবুক থেকে নেওয়া হয়েছে।

সমাধানে পৌঁছুতে উদগ্রীব থাকে। শুধু গাড়ি চালানোই একমাত্র উদাহরণ নয়; পুরুষেরা নারীদের চেয়ে অর্থ, বিত্ত আর সামাজিক প্রতিপত্তি এবং প্রতিষ্ঠার প্রতি যে বেশি আকৃষ্ট তা যে কোন সমাজেই প্রযোজ্য। এটাও এসেছে দীর্ঘদিনের প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা থেকে।

মানব ইতিহাসের পাতায় এবারে একটু চোখ রাখি। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, পুরুষেরা এক সময় ছিলো হান্টার বা শিকারী, আর মেয়েরা ফলমূল সংগ্রাহক। প্রয়োজনের তাগিদেই একটা সময় পুরুষদের একে অন্যের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে; অন্য গোত্রের সাথে মারামারি হানাহানি করতে হয়েছে; নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে হয়েছে; অস্ত্র চালাতে হয়েছে। তাদেরকে কারিগরী বিষয়ে বেশি জড়িত হতে হয়েছে। আদিম সমাজে অস্ত্র চালনা, করা শিকারে পারদর্শী হওয়াকে বেঁচে থাকার অন্যতম নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা হত। যারা এগুলোতে পারদর্শী হয়ে উঠেছে তারাই অধিক হারে সন্তান সন্ততি এ পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে, যারা এগুলো পারেনি তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস ঘাটলে পাওয়া যাবে পুরুষেরা শুধু আত্মরক্ষা করতেই যুদ্ধ করেনি, যুদ্ধ করেছে সাম্রাজ্য বাড়াতে, আর সম্পত্তি এবং নারীর দখল নিতে। এখনো এই মানসিকতার প্রভাব বিরল নয়। এর বাস্তব প্রমাণ বিজ্ঞানীরা পেয়ছেন ভেনিজুয়ালার আদিম গোষ্ঠী ইয়ানোমামো (Yąnomamö)দের নিয়ে গবেষণা করে। নৃতত্ত্ববিদ নেপোলিয়ন চ্যাংনন এই আদিম গোষ্ঠী নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে খুব অবাক হয়েই লক্ষ্য করেন,

> ‘এরা শুধু সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধ করেনা, এরা যুদ্ধ করে নারীদের উপর অধিকার নিতেও’।

দেখা গেল গোষ্ঠীতে যতবেশি শক্তিশালী এবং সমর-দক্ষ পুরুষ পাওয়া যাচ্ছে, তত বেশি তারা নারীদের উপর অধিকার নিতে পেরেছে।

চিত্রঃ ইয়ানোমামো গোত্রের পুরুষেরা পার্শ্ববর্তী গ্রাম আক্রমনের আগে এভাবেই সমরশিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের মধ্যে প্রদর্শন করে থাকে। (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

আসলে যতই অস্বীকার করা হোক না কেন, কিংবা শুনতে আমাদের জন্য যতই অস্বস্তি লাগুক না কেন, প্রাককৃষিপূর্ব সমাজে যে সহিংসতা এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে জোর করে একাধিক নারীদের উপর দখল নিয়ে পুরুষেরা নিজেদের জিন ভবিষ্যত প্রজন্মে ছড়িয়ে দিয়েছিল, এটা নিঠুর বাস্তবতা। পুরুষদের এই সনাতন আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় আজকের সমাজে ঘটা যুদ্ধের পরিসংখ্যানেও। এখনো চলমান ঘটনায় চোখ রাখলে দেখা যাবে - প্রতিটি যুদ্ধেই অসহায় নারীরা হচ্ছে যৌননির্যাতনের প্রথম এবং প্রধান শিকার। বাংলাদেশে, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, আলবেনিয়া, কঙ্গো, বুরুন্ডিয়া, প্যালেস্টাইন, ইরাক, ইরান সহ প্রতিটি যুদ্ধের ঘটনাতেই সেই নগ্ন সত্যই বেরিয়ে আসে যে, এমনকি আধুনিক যুগেও নারীরাই থাকে যুদ্ধের অন্যতম প্রধাণ শিকার।

এদিকে পুরুষেরা যখন হানাহানি মারামারি করে তাদের ‘পুরুষতান্ত্রিক’ জিঘাংসা চরিতার্থ করতে সচেষ্ট হয়েছে, অন্য দিকে, মেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছে সংসার গোছানোর। গৃহস্থালীর পরিচর্যা মেয়েরা বেশি অংশগ্রগণ করায় তাদের বাচনিক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ক্ষমতা ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি বিবর্ধিত হয়েছে। একটি ছেলের আর একটি মেয়ের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত যে বিভিন্ন পার্থক্য পাওয়া গেছে, তাতে বিবর্তনীয় অনুকল্পই সঠিক প্রমাণিত হয় । ছেলেদের ব্রেনের আকার গড়পরতা মেয়েদের মস্তিস্কের

চেয়ে অন্ততঃ ১০০ গ্রাম বড় হয়[2], কিন্তু ওদিকে মেয়েদের মস্তিস্ক ছেলেদের চেয়ে অনেক ঘন থাকে। মেয়েদের মস্তিস্কে কর্পাস ক্যালোসাম এবং এন্টেরিয়র কমিসুর নামক প্রত্যঙ্গ সহ টেম্পোরাল কর্টেক্সের যে এলাকাগুলো ভাষা এবং বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা করে বলে মনে করা হয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে সেগুলো ছেলেদের চেয়ে অন্ততঃ ২৯ ভাগ বিবর্ধিত থাকে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের মস্তিস্কে রক্তসঞ্চালনের হার ছেলেদের ব্রেনের চেয়ে শতকরা ১৫ ভাগ বেশি বলে জানা গেছে।

আরো কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা যাক। ছেলেদের মস্তিস্কের প্যারিয়েটাল কর্টেক্সের আকার মেয়েদের মস্তিস্কের চেয়ে অনেক বড় হয়। বড় হয় অ্যামাগদালা (amygdala) নামের বাদাম আকৃতির প্রত্যঙ্গের আকারও । এর ফলে দেখা গেছে ছেলেরা জ্যামিতিক আকার নিয়ে নিজেদের মনে নাড়াচাড়ায় মেয়েদের চেয়ে অনেক দক্ষ হয়[3]। তারা একটি ত্রিমাত্রিক বস্তুকে সামনে থেকে দেখেই নিজেদের মনের আয়নায় নড়িয়ে চড়িয়ে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে বুঝে নিতে পারে বস্তুটি, পেছন থেকে, নীচ থেকে বা উপর থেকে কিরকম দেখাতে পারে। জরিপ থেকে দেখা গেছে, ছেলেরা গড়পরতা বিমূর্ত এবং ‘স্পেশাল’ কাজের ব্যাপারে বেশী সাবলীল, আর মেয়েরা অনেক বেশী বাচনিক এবং সামাজিক কাজের ব্যাপারে।

মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের প্রভাব পড়ে তাদের অর্জিত ব্যবহারে, আর সেই ব্যবহারের প্রভাব আবার পড়ে সমাজে। অভিভাবকেরা সবাই লক্ষ্য করেছেন, মেয়ে শিশুরা ছেলে শিশুদের চেয়ে অনেক আগে কথা বলা শিখে যায় - একই রকম পরিবেশ দেয়া সত্ত্বেও। ছেলেদের বাচনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রগুলো গড়পড়তা মেয়েদের মত উন্নত না হওয়ায় ডাক্তাররা লক্ষ্য করেন পরিণত বয়সে ছেলেরা সেরিব্রাল পালসি, ডাইলেক্সিয়া, অটিজম এবং মনোযোগ- স্বল্পতা সহ বিভিন্ন মানসিক রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। এ ধরনের আরো পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় ছেলেরা যখন কাজ করে অধিকাংশ সময়ে শুধু একটি কাজে নিবদ্ধ থাকতে চেষ্টা করে, এক সাথে দু- তিনটা কাজ করতে পারে না, প্রায়শই গুবলেট করে ফেলে। আর অন্যদিকে মেয়েরা অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে ছয় সাতটা কাজ একই সাথে করে ফেলে। এটাও হয়েছে সেই শিকারী –সংগ্রাহক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন মানসপটে রাজত্ব করার কারণেই। শিকারী হবার ফলে পুরুষদের স্বভাবতই শিকারের

[2] একটি ব্যাপার এখানে পরিস্কার করা প্রয়োজন। বইয়ের এই অংশে জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে নারী- পুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এটি কোন লিঙ্গভিত্তিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা নয়। ছেলেদের মস্তিস্কের আকার বড় হবার অর্থ এই নয় যে, ছেলেদের বুদ্ধি মেয়েদের থেকে বেশি কিংবা ছেলেরা যে কোন কাজে মেয়েদের থেকে অধিকতর দক্ষ। অতীতে পুরুষতান্ত্রিক প্রথা টিকিয়ে রাখতে এ ধরনের ভুল স্টেরিওটাইপিং এর চেষ্টা করা হয়েছিলো। ছেলে আর মেয়েদের মস্তিস্কের গঠনে জৈববৈজ্ঞানিক কিছু পার্থক্য রয়েছে, যার কারণ বিবিধ। এইটি বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরাই মূল উপজীব্য।

[3] Linn, M. C., & Peterson, A. C. (1985). Emergence and characterization of sex differences in spatial ability: A meta-analysis. Child Development, 56(6), 1479-1498.;

প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হত, ফলে তাদের মানসজগত একটিমাত্র বিষয়ে নিবদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল, আর মেয়েদের যেহেতু ঘরদোর সামলাতে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে হাজারটা কাজ করে ফেলতে হত, তারা দক্ষ হয়ে উঠেছিল একাধিক কাজ একসাথে করাতে। 'মাল্টি টাস্কিং' এই মজ্জাগত দক্ষতার কারণেই বোধ হয় আজকের এই প্রতিযোগিতামূলক 'কর্পোরেট জগতে'ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে মেয়েরা ভাল করছে, এবং তাদের অধিক হারে সে সব জায়গায় নিয়োগ দেয়া হয়। একটা জিনিস এখানে পরিস্কার করে বলা দরকার। বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞান বলে যে, ছেলেরা গড়পরতা বিশেষ এবং নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে (সাধারণতঃ) বেশি দক্ষ হয়, আর মেয়েরা সামগ্রিকভাবে বহুমাত্রিক কাজে (multitasking)। আমাদের আধুনিক সমাজ বহু কিছুর সংমিশ্রন। এখানে সফল হতে 'স্পেসিফিক' দক্ষতা যেমন লাগে, তেমনি লাগে 'মাল্টিটাসকিং'ও। কাজেই, কেউ যদি নারীদের গৃহবন্দী করার অভিপ্রায়ে সেই পুরাতণ 'ব্যাক টু দ্য কিচেন' আর্গুমেন্ট নিয়ে আসতে চান সেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা অফিসের চেয়ার টেবিলে বসে কাজ করার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আধুনিক ঘটনা। এটা ঠিক পুরুষেরা একসময় শিকারী ছিলো, আর মেয়েরা সংগ্রাহক, কিন্তু তা বলে কি এটা বলা যাবে, মেয়েরা যেহেতু একসময় সংগ্রাহক ছিলো, সেহেতু এখন তারা অফিসে কাজ করতে পারবে না, বা কম্পিউটারের চাবি টিপতে পারবে না এমন দিব্যি তো কেউ দিয়ে দেয়নি। সেজন্যই আধুনিক বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যাবে মেয়েরা অফিস আদালতে তো বটেই, ছেলেদের সাথে পাল্লা দিয়েই কাজ করে চলেছে মাইনিং ফিল্ড থেকে শুরু করে একেবারে নাসার বহির্জাগতিক গবেষণাগার সহ মোটামুটি সব জায়গাতেই।

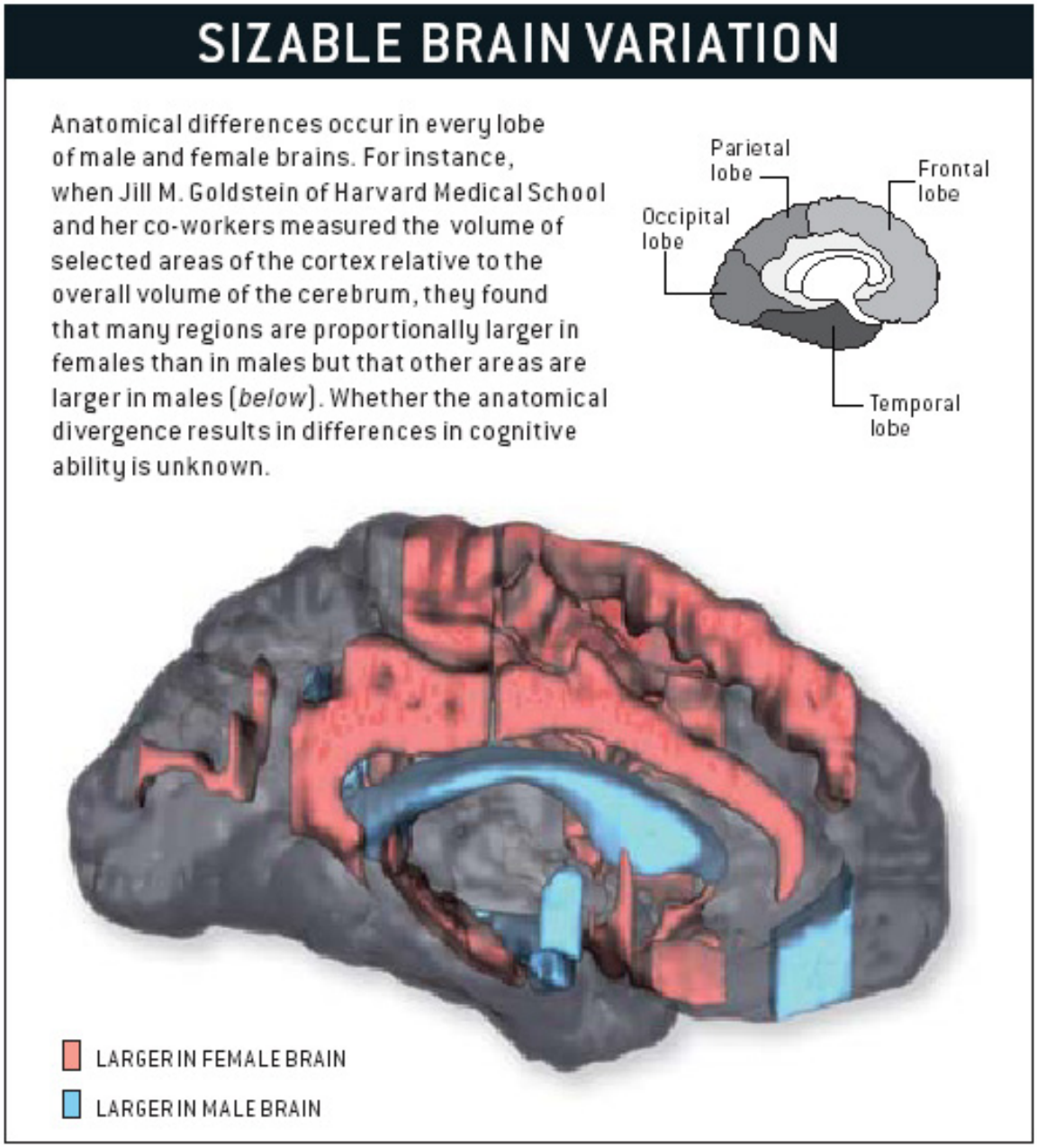

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা ছেলে এবং মেয়েদের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে গঠনগত বিভিন্ন পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

কিন্তু তারপরেও ছেলে- মেয়েদের পেশাগত কাজের ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দে বেশ কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। ছেলেরা গড়পরতা সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ কাজের ব্যাপারে দক্ষ বলেই সম্ভবতঃ অধিক হারে স্থাপত্যবিদ্যা, গণিত কিংবা প্রকৌশলবিদ্যা পড়তে উৎসুক হয়, আর মেয়েরা যায় শিক্ষকতা, নার্সিং, ডাক্তারী কিংবা সমাজবিদ্যায়। এই ঝোঁক সংস্কৃতি এবং সমাজ নির্বিশেষে একই রকম দেখা গেছে। এই রকম সুযোগ দেয়ার পরও

বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়েরা বড় হয়ে বুয়েটের চেয়ে মেডিকেলে পড়তেই উদগ্রীব থাকে। কোন সংস্কৃতিতেই ছেলেরা খুব একটা যেতে চায় না নার্সিং-এ, মেয়েরা যেমনিভাবে কখনোই 'গ্যারেজ মেকানিক' হতে চায় না অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ।

শুধু তাই নয়, মস্তিস্ক কিভাবে সমন্বিত হবে সেই প্রক্রিয়াতেও আছে নারী- পুরুষে পার্থক্য। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (fMRI) বিশ্লেষণ করে। একটি পরীক্ষায় এক দল মেয়ে এবং ছেলেদের আলাদা করে বসিয়ে তাদের 'লেট্', 'জেট্' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে দেয়া হয়েছিলো। শব্দগুলো উচ্চারণের সময় fMRI ব্যবহার করে তাদের মস্তিস্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াগুলোর ছবি তুলে নেয়া হল। ফলাফল যা পাওয়া গেল তা সত্যই বিস্ময়কর। দেখা গেল একই কাজ করতে গিয়ে ছেলেদের মাথা আর মেয়েদের মাথা কাজ করছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে। ছেলেরা শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে মস্তিষ্কের কেবল একটি অংশের (বাম ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) উপর নির্ভরশীল থাকে, কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে মস্তিস্কের দুই অংশই (বাম এবং ডান ইনফেরিওর ফ্রন্টাল গাইরাস) সমান ভাবে আন্দোলিত হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, মেয়েদের মস্তিস্ক ছেলেদের তুলনায় অনেক সুষমভাবে বিন্যস্ত হয়ে কাজ করে। fMRI র মাধ্যমে তোলা ছবিগুলো সত্যই নাটকীয় – বিজ্ঞানীরা দেখেছেন শব্দোচ্চারণের সাথে সাথে মস্তিস্কের বিভিন্ন অংশ আলোকিত হয়ে উঠে, এবং নারী পুরুষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়[4]।

নারীপুরুষের মস্তিস্কের গঠনগত পার্থক্যের ছাপ আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদায়। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড বাস ছয়টি মহাদেশ এবং পাঁচটি দ্বীপপুঞ্জের ৩৭ টি ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা ১০০৪৭ জন লোকের উপর সমীক্ষা চালিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সঙ্গী নির্বাচনের সময় ছেলেরা গড়পরতা দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে, কিন্তু পাশাপাশি প্রত্যাশা করে তারুন্য এবং সৌন্দর্য। অন্যদিকে মেয়েরাও গড়পরতা ছেলেদের কাছ থেকে দয়া, বুদ্ধিমত্তা আশা করে ঠিকই, পাশাপাশি সঙ্গীর কাছ থেকে আশা করে ধন সম্পদ আর স্ট্যাটাস[5]। এ ধরণের চাহিদার পার্থক্য আরো প্রকট হয়েছে নারী- পুরুষদের মধ্যকার যৌনতা নিয়ে 'ফ্যান্টাসি' কেন্দ্রিক গবেষনাগুলোতেও। ব্রুস এলিস এবং ডন সিমন্সের করা ইউনিভারসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে যে, পুরুষ এবং নারীদের মধ্যকার যৌনতার ব্যাপারে ফ্যান্টাসিগুলো যদি

[4] Shaywitz BA, Shaywitz SE, Pugh KR, Constable RT, Skudlarski P, Fulbright RK, Bronen RA, Fletcher JM, Shankweiler DP, Katz L, et al., Sex differences in the functional organization of the brain for language, Nature. 1995 Feb 16;373(6515):561-2.

[5] Buss, D.M., 1989. Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences 12, pp. 1–49.

সততার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে দেখা যাবে তিনজনের মধ্যে একজন পুরুষ একাধিক নারীর সাথে যৌনতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে, এমনকি সারা জীবনে তাদের পার্টনারের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কল্পনা করে তারা আমোদিত হয়ে উঠে- আর মেয়েদের মধ্যে সে সংখ্যাটা মাত্র ৮ ভাগ। এলিস এবং সিমন্সের সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা অর্ধেক সংখ্যক নারীরা অভিমত দিয়েছে, যৌনতা নিয়ে কল্পনার উন্মাতাল সময়গুলোতেও তারা কখনো সঙ্গী বদল করে না, অন্য দিকে পুরুষদের মধ্যে এই সংখ্যাটা মাত্র ১২ ভাগ। মেয়েদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো তার নিজের পরিচিত যৌনসঙ্গীকে কেন্দ্র করেই সবসময় আবর্তিত হয়, আর অন্যদিকে পুরুষদের যৌনতার ফ্যান্টাসিগুলো সময় সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েকে নিয়েও উথলে ওঠে । একারণেই গবেষক এলিস এবং সিমন্স তাদের গবেষণাপত্রে এই বলে উপসংহার টেনেছেন [6] –

> ‘পুরুষদের যৌনতার বাঁধন-হারা কল্পনাগুলো হয়ে থাকে সর্বব্যাপী, স্বতঃস্ফুর্ত, দৃষ্টিনির্ভর, বিশেষভাবে যৌনতাকেন্দ্রিক, নির্বিচারী, বহুগামী এবং সক্রিয়। অন্যদিকে মেয়েদের যৌন অভিলাস অনেক বেশী প্রাসঙ্গিক, আবেগময়, অন্তরংগ এবং অক্রিয়।’

ছেলে মেয়েদের যৌন-অভিলাসের পার্থক্যসূচক এই প্রবণতার প্রভাব পড়েছে আজকের দিনের বানিজ্যে এবং পন্য-দ্রব্যে। এমনি একটি দ্রব্য হচ্ছে ‘পর্নগ্রাফি’ অন্যটি হল ‘রোমান্স নভেল’। পর্নগ্রাফির মুল ক্রেতা নিঃসন্দেহে পুরুষ। পুরুষদের উদগ্র এবং নির্বিচারী সেক্স ক্রেজের চাহিদা পূর্ণ করতে বাজার আর ইন্টার্নেট সয়লাব হয়ে আছে সফট পর্ন, হার্ড পর্ন, থ্রি সাম, গ্রুপ সেক্স সহ হাজার ধরণের বারোয়ারি জিনিসপত্রে। এগুলো পুরুষেরাই কিনে, পুরুষেরাই দেখে। মেয়েরা সে তুলনায় কম। কারণ, মেশিনের মত হার্ডকোর পর্ন পুরুষদের তৃপ্তি দিলেও মেয়েদের মানসিক চাহিদাকে তেমন পূর্ণ করতে পারে না। সমীক্ষায় দেখা গেছে নারীর নগ্ন দেহ দেখে পুরুষেরা যেমন সহজেই আমোদিত হয়, মেয়েরা তেমনি হয় না। কারণ - মেয়েদের অবারিত সেক্স জাগ্রত করতে দরকার অবারিত ইমোশন!

আর মেয়েদের এই অবারিত আবেগ জাগ্রত করতে বাজারে আছে ‘রোমান্স নভেল’। এই সমস্ত প্রেমোপন্যাসের মূল ক্রেতাই নারী। দেদারসে প্রেম-পীরিতি-বিচ্ছেদের পসরা

---

[6] B.J. Ellis, D. Symons (1990), "Sex Differences in Sexual Fantasy: an Evolutionary Psychological Approach", *Journal of Sex Research*, Vol. 27 pp.527 - 555.

সাজিয়ে শ'য়ে শ'ইয়ে বই সাড়া দুনিয়া জুড়ে বের করা হয় – আর সেগুলো দেদারসে বিক্রি হতে থাকে সাড়া বছর জুড়ে, মূলতঃ মেয়েদের হাত দিয়ে। বাংলাদেশে যেমন আছে ইমদাদুল হক মিলন, তেমনি আমেরিকায় সুসান এলিজাবেদ ফিলিপ্স, ভারতে তেমনি সুবোধ ঘোষ কিংবা নীহারঞ্জন গুপ্ত । প্রেম কত প্রকার ও কি কি তা বুঝতে হলে এদের উপন্যাস ছাড়া গতি নেই। আমি শুনেছি, রোমান্স নভেলের জন্য প্রকাশকেরা ইদানিংকালে বিশেষতঃ উঠতি লেখকদের নাকি বলেই দেয় – কিভাবে তার উপন্যাস 'সাজাতে' হবে, আর কি কি থাকতে হবে। একটু প্রেম, অনুরাগ, কমিটমেন্ট, মান – অভিমান, বিচ্ছেদ, ক্লাইম্যাক্স তারপর মিলন। আবেগের পশরা বেশি থাকতে হবে, সে তুলনায় সেক্সের বাসনা কম। বইয়ের নায়িকার সেক্সের সাথে আবার আবেগ মিলিয়ে দিতে হবে, ইত্যাদি। এভাবে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে রোমান্স নভেলের ম্যানুফ্যাকচারিং। মেয়েরা দেদারসে কিনছে, আবেগে ভাসছে, হাসছে, কখনো বা চোখের পানি ফেলছে। আর বই উঠে যাচ্ছে বেস্ট সেলার তালিকায়।

আরো কিছু আনুষঙ্গিক মজার বিষয় আলোচনায় আনা যাক। পশ্চিমা বিশ্বে এক সময় 'প্লে বয়'- এর পাশাপাশি একসময় প্লে গার্ল' চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো। চলেনি। মেয়েরা এ ধরণের পত্রিকা কেনেনি, বরং কিনেছে সমকামী পুরুষেরা ঢের বেশি। ছেলেরা শুধু কেন বল খেলবে আর মেয়েরা পুতুল - এই শিকল ভাঙ্গার অভিপ্রায়ে ভিন্ন ধরণের খেলনা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিলো - চলেনি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, আমরা যত আড়াল করার চেষ্টাই করি না কেন, ছেলে মেয়েদের মানসিকতায় পার্থক্য আছে - আর সেটা দীর্ঘদিনের বিবর্তনীয় ছাপ থাকার কারণেই। এই ব্যাপারটিই প্রকাশিত হয়েছে ব্রিটিশ পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্টে এক মায়ের আর্তিতে। সেই মা পত্রিকায় (নভেম্বর ২, ১৯৯২) তার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন –

> 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনার পত্রিকার বিজ্ঞ পাঠকেরা কি বলতে পারবেন কেন একই রকমভাবে বড় করা সত্ত্বেও যতই সময় গড়াচ্ছে আমার দুই জমজ বাচ্চাদের মধ্যকার নারী- পুরুষজনিত পার্থক্যগুলো প্রকট হয়ে উঠছে? কার্পেটের উপর যখন তাদের খেলনাগুলো একসাথে মিলিয়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে রাখা হয়, তখন দেখা যায় ছেলেটা ঠিকি ট্রাক বা বাস হাতে তুলে নিচ্ছে, আর মেয়েটা পুতুল বা টেডি বিয়ার'।

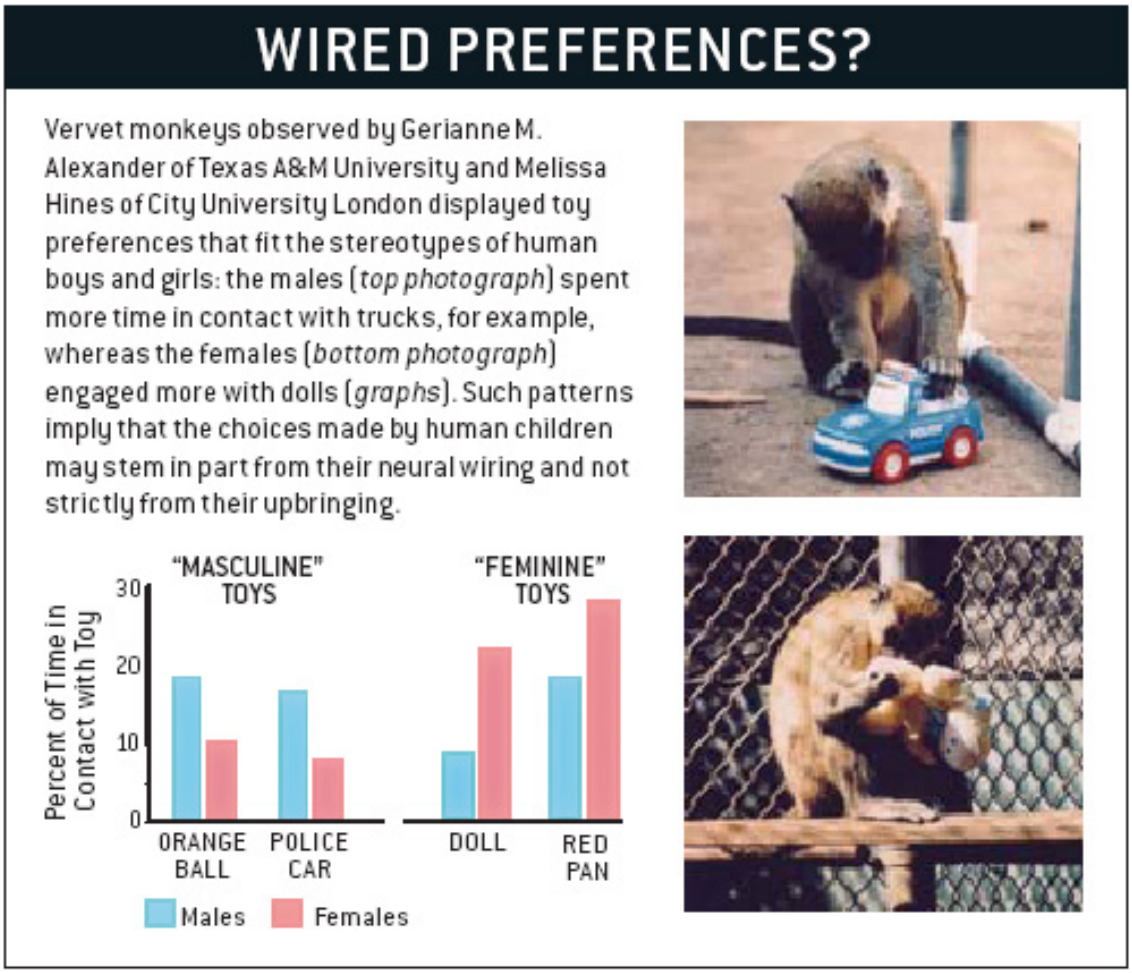

চিত্রঃ – বিজ্ঞানীরা ভার্ভেট বানর নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে খেলনার প্রতি পছন্দের প্রকৃতি ভিন্ন হয়, যা আমাদের মানব সমাজের ছেলে- মেয়েদের খেলনা নিয়ে 'স্টেরিওটাইপিং'-এর সাথে মিলে যায় (*ছবি* – সায়েন্টিফিক আমেরিকানের সৌজন্যে)

শুধু মানব শিশু নয়, মানুষের কাছাকাছি প্রজাতি ভার্ভেট বানর (vervet monkeys) নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন তাদের হাতে যদি খেলনা তুলে দেয়া হয়, ছেলে বানরেরা ট্রাক বাস গাড়ি ঘোড়া নিয়ে বেশি সময় কাটায় আর মেয়ে বানরেরা পুতুল কোলে নিয়ে। মানব সমাজে দেখা গেছে খুব অল্প বয়সেই ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে খেলনা নিয়ে এক ধরণের পছন্দ তৈরি হয়ে যায়, বাবা মারা সেটা চাপিয়ে দিক বা না দিক। দোকানে নিয়ে গেলে ছেলেরা খেলনা- গাড়ি কিংবা বলের দিকে হাত বাড়াতে শুরু করে, আর মেয়েরা পুতুলের প্রতি। এই মানসিকতার পার্থক্যজনিত প্রভাব পড়েছে খেলনার প্রযুক্তি, বাজার এবং বিপননে। যে কেউ আমেরিকার টয়েস আর আসের(toys r us) মত দোকানে গেলেই ছেলে- মেয়েদের জন্য খেলনার হরেক রকম সম্ভার দেখতে পাবেন।

কিন্তু খেলনা গুলো দেখলেই বোঝা যাবে – এগুলো যেন দুই ভুবনের দুই বাসিন্দাদের চাহিদাকে মূল্য দিতে গিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে বানানো।

গে মস্তিষ্কের খোঁজে

বিজ্ঞানীরা ইঁদুর আর বানর নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখেছেন, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে হাইপোথ্যালমাসের মধ্যে 'মেডিয়াল প্রিঅপ্টিক' বলে যে এলাকাটা (medial preoptic area) আছে, সেটা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যৌনতার পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে ছেলে ইঁদুরেরা মেয়ে ইঁদুরের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। বানর নিয়ে গবেষণা করেও বিজ্ঞানীরা একই ধরণের ফল পেয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হাইপোথ্যালমাস- বিশিষ্ট বানরদের আচরণ হয়ে থাকে অনেকটা 'যৌন- প্রতিবন্ধী'র মত। মেয়ে বানরদের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই থাকে না। এ থেকে যৌনপ্রবৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালমাসের গুরুত্ব বোঝা যাচ্ছে। মানুষের ক্ষেত্রেও হাইপোথ্যালমাস নামের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যঙ্গটির সাথে যৌনপ্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তারা হাইপোথ্যালমাসের এলাকাকে অভিহিত করেন *ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস* (INAH) নামের এক বিদঘুটে নাম দিয়ে। প্রতিটি নিউক্লিয়াসকে আবার তারা বিভিন্ন নম্বর দিয়ে – $INAH_1$, $INAH_2$, $INAH_3$, $INAH_4$,। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার গোর্কি এবং তার এক ছাত্রী লরা এলেন আশির দশকে মানুষের মস্তিস্ক বিশ্লেষণ করে দেখলেন ছেলেদের মস্তিষ্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$)এর আকার মেয়েদের থেকে অন্ততঃ তিনগুন বড় পাওয়া যাচ্ছে।

১৯৯০ সালে সিমন লেভি নামের এক আমেরিকান প্রখ্যাত স্নায়ুবিজ্ঞানী চিন্তা করলেন নারী পুরুষের হাইপোথ্যালমাস নিয়ে যখন এত কথা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে সমকামী ব্যক্তিদের হাইপোথ্যালমাসের কি অবস্থা সেটা একটু মেপে জোখে দেখা দরকার। তিনি ১৬ জন সমকামী পুরুষের এবং ছয় জন সমকামী মহিলার হাইপোথ্যালমাসের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালালেন। তিনি দেখলেন, গোর্কির মতই তিনিও ছেলেদের $INAH_3$- এর আকার মেয়েদের চেয়ে আকারে দু'গুন বড় পাচ্ছেন। কিন্তু সেই সাথে আরো একটা জিনিস পেলেন। সেটা হল - $INAH_3$- এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুন ছোট। অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস এর আকার মেয়েদের $INAH_3$- এর সমান! লেভি পরবর্তীতে একটি হাসপাতালের ৪১ জন রোগীর উপর একই পরীক্ষা করেন। সেখানেও তিনি একই ফলাফল পেয়েছিলেন। লেভির এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি পরবর্তীতে উইলিয়াম

বাইন নামের আরেকজন বিজ্ঞানী করেছিলেন[7]। তিনিও একই ফলাফল পেয়েছেন, অর্থাৎ, সমকামী পুরুষদের নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাসটি আকারে বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে ছোট, এবং অনেকটা মেয়েদের সমান।

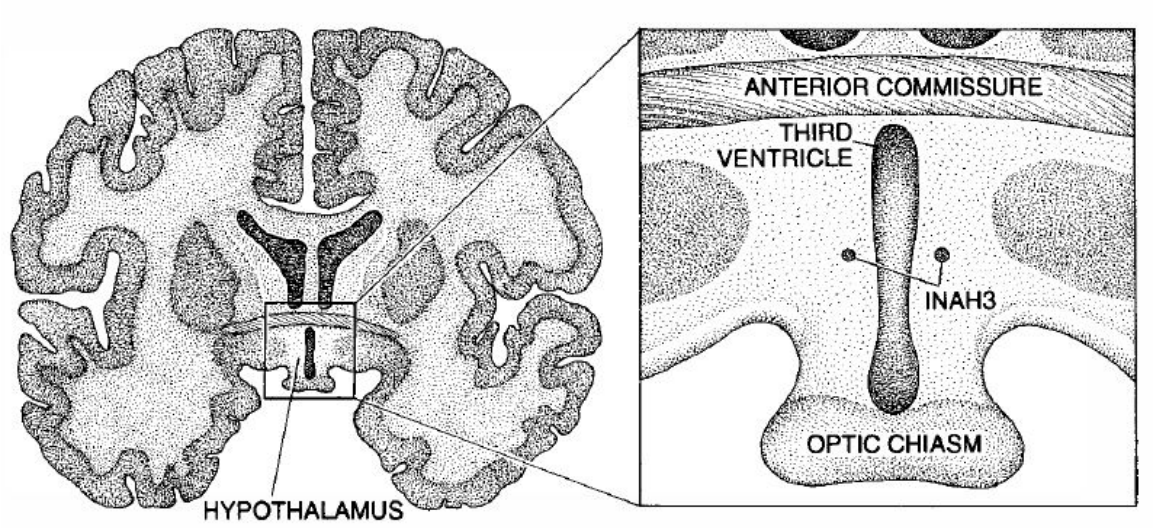

চিত্রঃ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন মস্তিস্কের তৃতীয় ইন্টারস্টিয়াল নিউক্লি অব দ্য এন্টেরিয়র হাইপোথ্যালমাস ($INAH_3$) এর আকার বিষমকামীদের পুরুষদের চেয়ে সমকামী পুরুষদের ক্ষেত্রে দু থেকে তিনগুন ছোট হয়।

তার মানে কি? এর মানে কি এই যে সমকামী পুরুষদের মস্তিস্ক অনেকটা নারীসুলভ? বলা মুশকিল। বিজ্ঞানীরা এই অনুকল্পটিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলেন। তারা জানেন, শুধু $INAH_3$- এর আকারেই নয়, মস্তিস্কের আরো অন্যান্য প্রত্যঙ্গের আকারেও পার্থক্য পাওয়া গেছে। যেমন, মেয়েদের ভাষগত দক্ষতা যেহেতু ছেলেদের চেয়ে বেশি এবং একটু ভিন্নভাবে কাজ করে, তাদের কর্পাস কালোসাম (corpus callosum) এবং এন্টিরিয়র কমিসুর (anterior commissure) নামে দুইটি প্রত্যঙ্গের আকার পুরুষদের তুলনায় বড়। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে কি অবস্থা? হ্যা, আপনি যা সন্দেহ করেছেন তাই – সমকামী ব্যক্তিদের কর্পাস কালোসাম এবং এন্টিরিয়র কমিসুরের আকার বিষমকামী পুরুষদের চেয়ে আকারে বড় হয়, এবং মেয়েদের আকারের সাথে মিলে যায়। ১৯৯২ সালে লরা এলেন এবং রজার গোর্কি এন্টিরিয়র কমিসুর নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সমকামীদের ক্ষেত্রে প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের চেয়ে

[7] Byne W, Tobet S, Mattiace LA, et al. (September 2001). "The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status". Horm Behav 40 (2): 86–92.

বড়[8]। আবার কর্পাস কালোসাম নিয়ে পরীক্ষা করে আরেকদল বিজ্ঞানী দেখেছেন, সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার বিষমকামীদের থেকে প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ বেশী[9]।

তাহলে কি দাঁড়ালো? একসময় উলরিচস (পঞ্চম অধ্যায় দ্রঃ) যেমনটি ভেবেছিলেন – 'সমকামী পুরুষেরা আসলে পুরুষ দেহে বন্দি নারী আত্মার অতৃপ্ত প্রকাশ' – সেটাই কি তবে ঠিক?। অনেক বিজ্ঞানী পূর্বেকার সীমিত পরীক্ষা থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তে তাই ভেবে নিয়েছিলেন। ঢালাও ভাবে ভেবে নেয়া হয়েছিল- সমকামিতার প্রকাশ মানে 'A female spirit in a male body'। সামাজিক ভাবেও আমরা দেখি সমকামী ছেলেদের 'মেয়েলী' বলে খোঁটা দেয়া হয়। তা হলে সত্যিই কি এই 'স্টেরিওটাইপিং' গুলোর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে? কিন্তু এখানে এসেই দাবার ছক আবারো উলটে গেলো। মানুষের মস্তিস্কের হাইপোথ্যালমাসে সুপ্রাকিয়াস্মিক নিউক্লিয়াস (VIP SCN nucleus) নামের যে এলাকাটি আছে, যেটার আকার ছেলেদের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে বড় থাকে। তাহলে সমকামীদের ক্ষেত্রে এই প্রত্যঙ্গটির আকার কিরকম হবার কথা? নিশ্চয় ছোট এবং মেয়েদেরটার সমান তাই না? না, মোটেই তা নয় – সমকামীদের ক্ষেত্রে VIP SCN nucleus এর আকার পাওয়া গেল অনেক বড়, ছেলে মেয়ে দু দলের চেয়েই[10]। সে জন্যই জোয়ান রাফগার্ডেন তার 'ইভল্যুশন রেইনবো' বইয়ে শ্লেষের সাথে লিখেছেন –' So much for the belief that gay man have female brains!' তবে এ ব্যাপারে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি, হয়তো ভবিষ্যৎ গবেষণা এ ব্যাপারে আরো ভালভাবে পথ দেখাবে। আরো একটি ব্যাপারও এই সাথে লক্ষ্যনীয়। নারী সমকামীদের মস্তিস্কে এ ধরণের কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি।

সমকামী পারিবারিক ধারার খোঁজে

আমার বাবা ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করতেন। আমিও ছোটবেলায় তাই খেলতাম। এ ধরণের অনেক বৈশিষ্ট্যই আমরা ঐতিহ্য হিসেবে বয়ে নিয়ে যাই, পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিখে নিয়ে। মা ভাল রান্না করলে মেয়েকেও সেই গুণ পেতে সাহায্য করেন। আবার কিছু জিনিস না চাইলেও আমাদের বহন করতে হয় জেনেটিক তথ্য হিসেবে বংশ

[8] Allen LS, Gorski RA (1992). "Sexual orientation and the size of the anterior commissure in the human brain". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 89 (15): 7199–202. doi:10.1073/pnas.89.15.7199.
[9] Scamvougeras, A., Witelson, S.F., Bronskill, M., Stanchev, P., Black, S., Cheung, G., Steiner, M., Buck, B. Sexual orientation and anatomy of the corpus callosum. Society for Neuroscience Abstracts, 1994, p 1425.
[10] Swaab DF, Zhou JN, Ehlhart T, Hofman MA (1994). "Development of vasoactive intestinal polypeptide neurons in the human suprachiasmatic nucleus in relation to birth and sex". Brain Res. Dev. Brain Res. 79 (2): 249–59.

পরম্পরায়। চোখের এবং চুলের রঙ, নাকের গঠন, শরীর স্বাস্থ্য, হৃদরোগের ঝুঁকি সহ অনেক কিছুই। সমকামিতার ব্যাপারটিও আমরা পরিবারে বাহিত হতে দেখি। কিন্তু এটা কি জেনেটিক তথ্য হিসেবে পরিবারের ধারায় বয়ে চলে, নাকি পরিবেশ থেকে শেখা বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ?

বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজতে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। তারা ইতোমধ্যেই দেখেছেন একটি জনসমষ্টিতে কোন ভাই বিষমকামী হলেও অন্ততঃ শতকরা ৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে তার পরবর্তী ভাইয়ের সমকামী হয়ে জন্মাবার। কিন্তু পরিবারের একভাই সমকামী হলে অন্ততঃ ২২ ভাগ সম্ভাবনা তৈরী হয় অপর ভাইও সমকামী হবার। অর্থাৎ পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে পরিবারে সমকামী ধারা তৈরী হবার সম্ভাবনা অন্ততঃ চারগুন বেড়ে যায়। কিন্তু ভাই সমকামী হলে বোন লেসবিয়ান নাকি স্ট্রেট হবে কিনা – এ সংক্রান্ত কোন সম্ভাবনার ঝোঁক পাওয়া যায়নি[11]। কোন পরিবারে বোন সমকামী (লেসবিয়ান) হলে, অপর বোনেরও সমকামী হবার প্রবণতা দ্বিগুন বেড়ে যায়, কিন্তু ভাইয়ের উপর এর কোন সম্ভাব্যতার প্রভাব জানা যায়নি[12]।

যমজদের নিয়ে পরীক্ষা করেও কৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে রিচার্ড সি পিল্লার্ড এবং জেমস ডি ওয়েইনরিচ তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন সমকামিতার ধারাটি সম্ভবতঃ জেনেটিক তথ্য হিসেবে প্রবাহিত হয়। তারা দেখালেন যে, সদৃশ যমজদের (identical twins) ক্ষেত্রে এক ভাই সমকামী হলে অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অপর ভাইও সমকামী হবার। আর অসদৃশ যমজদের (fraternal twins) ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা থাকে চব্বিশ ভাগের মত। এরপর থেকে অন্ততঃ পাঁচটি যমজদের নিয়ে যৌন-প্রবৃত্তি সংক্রান্ত গবেষণার খবর লিপিবদ্ধ হয়েছে[13]। ১৯৯১ সালে তাদের একটি গবেষণা থেকে জানা যায় সমকামী প্রবণতা সদৃশ যমজ দের মধ্যে ৫৭ ভাগ, অসদৃশ যমজ দের মধ্যে ২৪ ভাগ, এবং অযমজদের মধ্যে ১৩ ভাগ সমকামীভাবাপন্ন হয়ে থাকে[14]। একইভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নারী সমকামিতার প্রবণতা সদৃশ যমজে থাকে শতকরা ৫০ ভাগ, অসদৃশ যমজে থাকে ১৬ ভাগ, এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে থাকে ১৩ ভাগ। ১৯৯৩ সালে এ ধরণের আরেকটি গবেষণা থেকে পাওয়া যায়, ছেলেদের সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ৬৫ ভাগ সমকামী প্রবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে আর অসদৃশ

[11] Pillard RC, Weinrich JD., Evidence of familial nature of male homosexuality, Arch Gen Psychiatry. 1986 Aug;43(8):808-12.
[12] Bailey JM and Benishay DS, Familial aggregation of female sexual orientation, Am J Psychiatry 1993; 150:272-277
[13] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.
[14] Bailey JM, Pillard RC, A genetic study of male sexual orientation., Arch Gen Psychiatry. 1991 Dec; 48 (12) pp1089-96..

যমজদের ক্ষেত্রে সেটা ২৯ ভাগ[15]। একইভাবে নারীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, সদৃশ যমজের ক্ষেত্রে শতকরা ৪৮ ভাগ সমকামী হয়, আর অসদৃশ যমজের ক্ষেত্রে সেটা মাত্র ৬ ভাগ[16]।

উপরের জরিপ গুলো সবই ছিল আমেরিকার। ১৯৯২ সালে ইংল্যান্ডে এই ধরণের একটি জরিপ চালানো হয়। সেখানকার জরিপেও প্রায় একই ধরণের ফলাফল বেরিয়ে আসে, যদিও সংখ্যাটা অনেক কম। সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ২.৫ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে[17]। অস্ট্রেলিয়ায় একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে জরিপ চালানো হয়েছে। সেখানে অন্যান্য পদ্ধতির মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যমজ সহোদর বাছাই করা হয়নি, বরং বাছাই করা হয়েছে নির্বাচনের ভিত্তিতে। তাদের জরিপ থেকে যে ফলাফল এসেছে তা হল – সেখানে সদৃশ যমজদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে মাত্র ০ ভাগ সমকামী পাওয়া গেছে; সদৃশ মেয়ে যমজদের শতকরা ২৪ ভাগ লেসবিয়ান হয় এবং অসদৃশ যমজদের ক্ষেত্রে সেটা প্রায় ১১ ভাগ[18]।

উপরের পরীক্ষাগুলোর শানে নজুল কি দাঁড়ালো তা হলে? পরীক্ষাগুলো থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট ; সদৃশ যমজে দুই ভাইই সমকামী হবার সম্ভাবনা অসদৃশ যমজের দ্বিগুন পাওয়া যাচ্ছে। পরীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে সদৃশ যমজে দুই ভাইয়ের দুজনেই সমকামী হবার সম্ভাবনা শতকরা ২৫ থেকে ৫০, এই ফলাফল নির্ভর করে কিভাবে বা কোথায় পরীক্ষা করা হচ্ছে তার উপর। তার মানে জেনেটিক ফ্যাক্টর যদি আমরা ২৫ থেকে ৫০ বলে রায় দেই, তবে পরিবেশ এবং অন্যান্য ফ্যাক্টরের প্রভাব ৫০ থেকে ৭৫ ভাগ থেকেই যাচ্ছে।

এমনকি সদৃশ যমজদের দুই ভাইয়ের মধ্যেই সমকামিতা পাওয়ার যে ব্যাপারটিকে পুরোপুরি ‘জেনেটিক’ বলে ভাবা হচ্ছে, সেই দাবীও কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটাও খোলা মনে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। দুই সদৃশ যমজ ভাই সাধারণতঃ একই পরিবেশে একই ভাবে বড় হয়, এবং একজনের পছন্দ, অপছন্দ অভিরুচি অনেক সময় অপরজনকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করে। কাজেই, যে কেউ দাবী করতেই পারে যে, সদৃশ যমজে অসদৃশ যমজদের চেয়ে অধিক হারে সমকামী ভাতৃযুগল পাওয়া যাচ্ছে, এর কারণ ‘অভিন্ন জিন’ নয়, বরং তাদের বেড়ে উঠার ‘অভিন্ন পরিবেশ’। থিওডোর লিজ নামে এক

[15] Frederick L. Whitam, Milton Diamond and James Martin, Homosexual orientation in twins: A report on 61 pairs and three triplet sets, Archives of Sexual Behavior, 22(3), 1993, pp 187-206.
[16] Bailey J M; Pillard R C; Neale M C; Agyei Y Heritable factors influence sexual orientation in women. Archives of general psychiatry 1993;50(3):217-23
[17] M King and E McDonald, Homosexuals who are twins. A study of 46 probands, The British Journal of Psychiatry 1993, 160: 407-409.
[18] Bailey, J. M., & Martin, N. G. A twin registry study of sexual orientation. Paper presented at the twenty-first annual meeting of the International Academy of Sex Research, Provincetown, MA, 1995.

মনোবিজ্ঞানী এই ব্যাপারটি উল্লেখ করে তার প্রতিক্রিয়াও জানিয়েছিলেন একটি জার্নালে[19]। এ উদাহরণটি আমাদের সামনে এ ধরণের পরীক্ষার জটিলতা স্পষ্ট করে তুলে। ফ্রয়েড যে কথাটা অনেক আগেই বলেছিলেন একটু অন্য ভাবে, সে কথাটাই হয়ত সত্য হয়ে ফিরে আসছে –

> 'সমকামিতার ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরো গভীর। ... কারণ [সদৃশ] যমজেরা যেন আয়নার প্রতিবিম্ব হিসেবে বেড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যকার স্বকাম (narcissism) আরো বিবর্ধিত করে তুলে' ।

তবে এই সমস্যার সমাধানের জন্য আরেক ধরণের পরীক্ষা করা যেতে পারে। যদি কোন সদৃশ যমজ জন্মের সময়েই আলাদা হয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বড় হয়, এবং সেই উপাত্ত যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে হয়ত 'অভিন্ন' পরিবেশের ফ্যাক্টরটি বাদ দিয়ে শুধু জেনেটিক ফ্যাক্টর আলোচনায় আনতে পারব, এবং বলতে পারবো সমকামী প্রবৃত্তি সত্যই জেনেটিক কিনা।

১৯৮৬ সালে এ ধরণের একটি পরীক্ষার কথা জানা যায়[20]। ছয়টি সদৃশ যুগলের (চারটি ভগ্নি যুগল, এবং দুটি ভাতৃযুগল) সন্ধান পাওয়া যায় যারা আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলো, এবং যুগলদের মধ্যে একজন অন্ততঃ সমকামী। চারটি ভগ্নি যুগলের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন সদস্য ছিলেন বিষমকামী, এবং অন্যজন সমকামী। একটি ভাতৃযুগলের ক্ষেত্রে দুই ভাইই ছিলেন সমকামী। একটি 'গে বার' এ পরিচয় হবার আগ পর্যন্ত এমনকি তারা একে অপরকে চিনতেনও না। আরেকটি ভাতৃযুগলের ক্ষেত্রে, দুই ভাই জন্মের পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা পরিবেশে বড় হয়েছিলেন। এক ভাই ১৯ বছর পর্যন্ত উভকামী হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন, এবং তারপর পরিপূর্ণ সমকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আর অন্য ভাই পনের থেকে আঠারো বয়স পর্যন্ত সমকামী ছিলেন, তারপর বিয়ে করে নিজেকে বিষমকামী হিসেবে সমাজে পরিচিত করেন। এই ক্ষেত্রে, অন্ততঃ সীমিত সময়ের জন্য হলেও উভয় সদস্যই সমকামিতার প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেছিলো।

---

[19] Theodore Lidz, Md, Reply to 'A Genetic Study of Male Sexual Orientation', Arch Gen Psychiatry. 1993;50(3):240.

[20] ED Eckert, TJ Bouchard, J Bohlen and LL Heston , Homosexuality in monozygotic twins reared apart, The British Journal of Psychiatry, 1986, 148: 421-425

কাজেই উপরের পরীক্ষা থেকে একটি জিনিস বুঝা যাচ্ছে যে, জন্মের সময় বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং ভিন্ন পরিবেশে বড় হওয়া ভাতৃযুগলে সমকামিতার উন্মেষের পেছনে জেনেটিক উপাদান থাকতে পারে, কিন্তু এই জেনেটিক প্রভাব ভগ্নিযুগলে পাওয়া গেছে অনেক কম।

কিন্তু এই পরীক্ষাই শেষ কথা নয়। সমকামিতার উপর পরিবেশের প্রভাব আদৌ আছে কিনা, আর থাকলে কতটুকু – সেটা জানার জন্য আরেক ধরণের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বেইলি এবং পিল্লার্ডের ১৯৯১ সালের সেই পরীক্ষায় (আগে উল্লিখিত) দত্তক নেয়া সদৃশ যমজ সন্তানদের উপর জরিপ চালানো হয়। দেখা গেছে কোন সমকামী পরিবার বা ব্যক্তি দত্তক নিলে সেই ভাইয়ের সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠার সম্ভাবনা (১১%) অনেক বেশি থাকে বিষমকামী পরিবার দত্তক নেয়ের চেয়ে (৫%)। কাজেই এ সমস্ত পরীক্ষা থেকে বোঝা যাচ্ছে, জেনেটিক ফ্যাকটরের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাবটিও থেকে যাচ্ছে পুরোমাত্রায়। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে মুখ্য কারণ হিসেবে প্রতিপন্ন করাটা এই মুহূর্তে আসলে সরলীকরণই হবে ।

গে জিনের খোঁজে

১৯৯৩ সালে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের সমকামী বিজ্ঞানী ডিন হ্যামার এবং এঙ্গেলা প্যাতাউচির একটি যৌথ গবেষনাপত্র বিজ্ঞানের সম্ভ্রান্ত জার্নাল ‘সায়েন্স’- এ প্রকাশিত হয়[21]। ডিন হ্যামারের সেই গবেষণাপত্রে শুধু সমকামী ধারাই নয়, সেই সাথে সমকামিতার উৎস হিসেবে ক্রোমোজমের মধ্যকার জেনেটিক একটি মার্কারের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে প্রকাশিত হয়। এই ব্যাপারটিকে পরবর্তীতে কিছু পত্রপত্রিকা এবং মিডিয়া ‘গে জিন’ বলে প্রচার শুরু করে, এবং এর ফলশ্রুতিতে পক্ষে বিপক্ষে নানা ধরনের বিতর্ক শুরু হয়। এই গবেষণাপত্রটি তাই খুব সতর্কভাবে পর্যালোচনার দাবী রাখে।

ডিন হ্যামেরের আলোচিত গবেষণাতেও আগের অন্যান্য গবেষকদের মতই পরিবারের মধ্যে সমকামী ধারা খোঁজার একটি চেষ্টা করা হয়েছে; এবং এ গবেষণা থেকেও সেই একই উপসংহার বেরিয়ে আসে – পরিবারে সমকামী ভাই থাকলে সমকামী ধারা তৈরি হবার প্রবণতা বেড়ে যায় । হ্যামার তার গবেষণা থেকে যে ফলাফল পেলেন তা হল – যদি এক ভাই সমকামী হয়, তাহলে ১৪ ভাগ সম্ভাবনা থাকে অন্য ভাইয়েরও সমকামী

[21] Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM (July 1993). "A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation". Science, 261 (5119): 321–7

হবার, আর ভাই সমকামী না হলে সমকামী হবার সম্ভাবনা থাকে শতকরা মাত্র ২ ভাগ। কিন্তু হ্যামার এ পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেলেন না। তিনি সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারাও বিশ্লেষণে আনলেন। আর এটা করতে গিয়েই বেরিয়ে এলো অজানা এক নতুন একটি দিক। তিনি দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বাবার দিকে অর্থাৎ চাচা কিংবা চাচাতো ভাইদের মধ্যে সেরকম কোন প্যাটার্ণ পাওয়া গেল না।

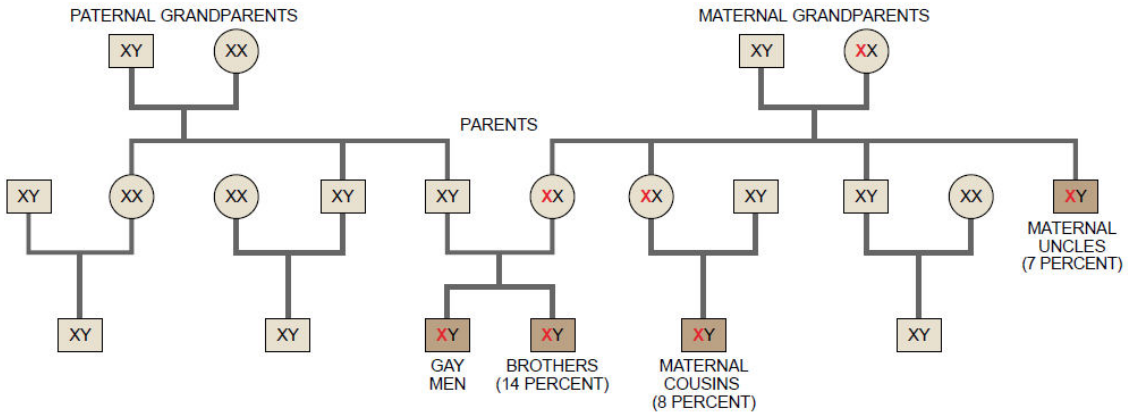

চিত্রঃ সমকামী পরিবারের দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনদের পারিবারিক ধারা বিশ্লেষণ করে ডিন হ্যামার দেখলেন, সমকামী ছেলের মামাদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ এবং ফুতাতো ভাইদের মধ্যে শতকরা ৮ ভাগ সমকামী প্রবণতা সম্পন্ন পাওয়া ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ধারণা করলেন সমকামী প্রবণতা মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়।

তাহলে এর ব্যাখ্যা কি? সমকামী প্রবণতা কি তাহলে মায়ের দিক থেকেই জেনেটিক ভাবে প্রবাহিত হয়? ডিন হ্যামারের গবেষণা সে দিকেই ইঙ্গিত করে। আমরা জানি একটি ছেলের দেহে দু ধরণের ক্রোমোজম থাকে। একটি হল Y যা সে বাবার কাছ থেকে সরাসরি পায়, আর অন্যটি X ক্রোমোজম - যা সে পায় মায়ের দিক থেকে। কাজেই জেনেটিক প্রবণতা মায়ের দিক থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হবার অর্থ হচ্ছে X ক্রোমোজমে তার ছাপ থাকা। হ্যামার এবং তার গবেষক- দল জানালেন X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, এটাই সমকামী প্রবণতা তৈরির জন্য দায়ী। হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে দেখলেন তাদের মধ্যে ৩৩ টি যুগলের মধ্যে এই Xq28 মার্কারের অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। ৭ টিতে পাওয়া যায় নি (বিষমকামীদের ক্ষেত্রে এই মার্কারটি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত থাকে)। বলা হল যদিও নমুনাক্ষেত্র খুব একটা বড় ছিলো না, তদুপরি ৪০ জনের মধ্যে

৩৩ জনে মার্কার খুঁজে পাওয়াটা আসলেই 'স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট'[22]। এইটাই হল ডিনহ্যামারের সমকামিতা নিয়ে মাইলফলক গবেষনার সারসংক্ষেপ। তার পরীক্ষায় পাওয়া এই Xq28 মার্কারটি 'গে জিন' হিসেবে 'প্রচারের আলোয় উঠে আসে। আর অনেকেই ডিন হ্যামারের কাজকে এভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, 'ক্রোমোজমের Xq28 এলাকায় একটি জিন পাওয়া গেছে যা সমকামিতাকে ত্বরান্বিত করে'।

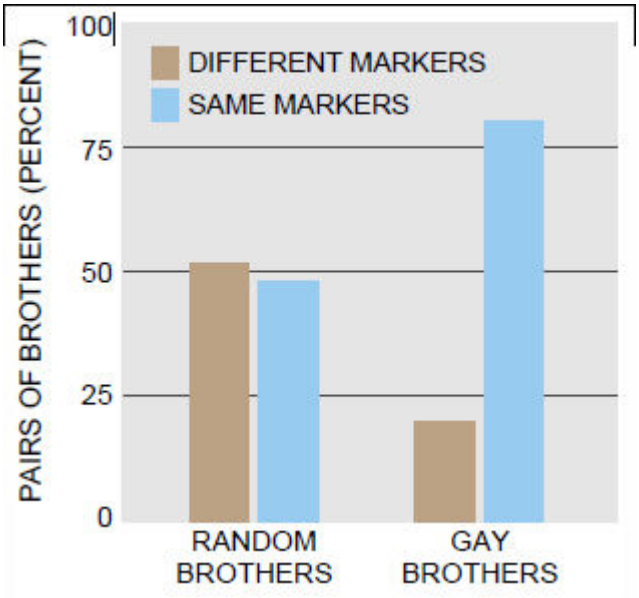

চিত্রঃ ডিন হ্যামারের হ্যামার ৪০ জন সমকামী ভাতৃযুগলের উপর পরীক্ষা করে X ক্রোমোজমের একদম প্রান্তসীমার একটি এলাকা – যাকে Xq28 হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, সমকামী প্রবণতার উৎস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

কিন্তু ব্যাপারটি মোটেই এত সহজ সরল নয়। এই ফলাফল খুব নিবিড়ভাবে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। প্রথম কথা হল ৪০ টি যুগলের মধ্যে ৭ টি যুগলে এই Xq28 মার্কারটি

[22] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

পাওয়া যায়নি। সমকামিতার প্রবৃত্তি তৈরিতে যদি Xq28 মার্কার থাকা 'অত্যাবশকীয় নিয়ামক' হতো, তাহলে ৪০ টি যুগলের স্যাম্পলের সবগুলোতেই এটি পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু সেটা হয়নি। যদি ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে মোটামুটি ২০টিতে পাওয়া যেত, আর বাকি ২০ টিতে না পাওয়া যেত, তবে আমরা বলতে পারতাম সমকামিতার প্রবৃত্তির সাথে এই মার্কারের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেটাও হয়নি। মার্কার পাওয়া গেছে চার- পঞ্চমাংশ ক্ষেত্রে। ৪০টি স্যাম্পলের মধ্যে ৩৩টিতে মার্কার পাওয়ার ক্ষেত্রটি নিঃসন্দেহে ফলাফলের পারিসাংখ্যিক গুরুত্বকে তুলে ধরে। ডিন হ্যামার হিসাব করে দেখিয়েছেন শুধুমাত্র সম্ভাবনার নিরিখে হিসেব করলে এমনি এমনি (নির্বিচারে) এটা ঘটার সম্ভাবনা ২০০ ভাগের মধ্যে ১ ভাগেরও কম। সে হিসেবে জেনেটিক প্রভাব থাকার প্রবণতাটাকে অস্বীকার করা হয়তো যাচ্ছে না, কিন্তু এটা কখনোই শেষ কথা বলার নিশ্চয়তাও দিয়ে দিচ্ছে না। মোটা দাগে বললে, যেহেতু যমজ ভাতৃযুগলের দুজনই সব সময় সমকামী ভাবাপন্ন হয় না, সেহেতু মার্কার থাকলেই সমকামী হবে – এটা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, কোন মার্কার না থাকা সত্ত্বেও ৭ টি ভাতৃযুগলে সমকামী প্রভাব পাওয়া গেছে। তার মানে, মার্কারের সাথে কিংবা জিনের সাথে সমকামী প্রবৃত্তির সরাসরি সম্পর্ক শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাচ্ছে না।

আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই মার্কারের সাথে জেনেটিক একটা প্রভাব আছেই, তবুও সেটি একটিমাত্র জিনের সাথে কখনোই নয়। ডিন হ্যামার নিজেই সে কথা বলেছেন এভাবে[23] –

> 'কোন একটি জিনকে (এ পরীক্ষায়) পৃথক করা যায়নি। পরীক্ষার মাধ্যমে যা করা হয়েছে তা হল - ক্রোমোজমের একটি অংশ সনাক্ত করা, যে অংশটি দৈর্ঘ্যে চার মিলিয়ন বেস যুগলের সমান। এই অংশটি সমগ্র মানব জিনোমের শতকরা ০.২ ভাগেরও ছোট, কিন্তু তারপরেও এই অংশটিতে অবলীলায় কয়েকশত জিন এঁটে যেতে পারে। এই এলাকায় নিয়ামক জিনটি খুঁজে বের করা অনেকটা খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতই। সূঁচ পেতে হলে হয় আমাদের হয় আরো অনেক বেশী পরিবার দরকার হবে, অথবা সম্ভ্যাব্য সকল এলাকার ডি.এন.এ-র অনুক্রমের সম্পূর্ণ তথ্য জানা চাই'।

[23] Simon Levay and Dean H. Hamer, Evidence for a Biological Influence in Male Homosexuality, Scientific American, May 1994.

হ্যামার নিজে ১৯৯৫ সালে পরীক্ষাটি পুনর্বার পরিচালনা করেন হু, পাত্তাউচি এবং অন্যান্যদের সাথে মিলে। এই পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয় ৩২ টি স্যাম্পল নিয়ে, এবং এর মধ্যে ২২ টি ক্ষেত্রে তিনি আগের পরীক্ষার মতই Xq28 মার্কার খুঁজে পেলেন[24]। অর্থাৎ, শতকরা প্রায় ৬৮ ভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারলেন যে, মার্কারের সাথে সমকামিতার একটা প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে। এ ছাড়া স্যান্ডার এবং প্রমুখের ১৯৯৮ সালের গবেষনায়ও ৫৪টি স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করা হয়, এবং এর মধ্যে শতকরা ৬৬ ভাগ ক্ষেত্রে সমকামিতার সাথে Xq28 মার্কারের সম্পর্ক পাওয়া যায়[25]।

১৯৯৯ সালে ক্যানাডায় জর্জ রাইসের নেতৃত্বে গবেষকের একটি দল ডিন হ্যামারের পরীক্ষাটিই করার চেষ্টা করলেন নমুনা ক্ষেত্র আরো বাড়িয়ে দিয়ে। এই পরীক্ষায় সমকামী ভাতৃযুগল সংগ্রহ করার জন্য কানাডার গে ম্যাগাজিন *Xtra*তে বিশাল বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, শেষ পর্যন্ত ৪৬ টি যুগল নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। এই যুগলগুলো নির্বাচিত হয় ‘সমকামী সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী’ (gay interviewer) দের মাধ্যমে।

এই পরীক্ষায় ৪৬ টি যুগলের মধ্যে মাত্র ২০টি যুগলে মার্কার পাওয়া গেল[26], পারিসাংখ্যিক হিসেবে যা অর্ধেকেরও কম। যদি সমকামিতার সাথে মার্কারের নিশ্চিত সম্পর্ক থাকতো তবে ৪৬টির মধ্যে ৪৬টিতেই মার্কার পাওয়া যেত। তা তো হয়ইনি, বরং যদি হ্যামারের মত ‘স্ট্যাটিস্টিকালি সিগনিফিকেন্ট’ ৬৮% ফলাফলেরও পুনরাবৃত্তির কথা বিবেচনা করি, তবে মার্কার পাওয়া যাওয়ার কথা ছিলো অন্তত ৩২ টি। যদি এলোপাথাড়ি ভাবে ঘটা সম্ভাবনার হার শতকরা পঞ্চাশভাগের কথাও চিন্তা করি, তাহলেও মার্কারের সংখ্যা আসা উচিৎ ছিলো ২৩টি। কিন্তু ২০টি মাত্র মার্কার পাওয়াকে কোনভাবেই কোন ধরণের সম্পর্কে ফেলা যায় না। কাজেই অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন এই পরীক্ষাটি Xq28 মার্কারের সাথে ‘গে জিন’ পাওয়ার আগের দাবীগুলোকে ভুল প্রমাণ করে দেয়[27]। ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা তার ফলাফল সম্বন্ধে উপসংহার টেনে বলেন,

> আমাদের ফলাফল হ্যামারের মূল পরীক্ষার ফলের সাথে এত পাথর্ক্য কেন তৈরি করলো তা পরিস্কার নয়। ... সে যাই হোক, আমাদের এই পরীক্ষার উপাত্ত যৌনপ্রবৃত্তির উপর Xq28 এলাকায় অবস্থিত একটি জিনের প্রভাব

[24] Hu S, Pattatucci AM, Patterson C, et al. (November 1995). "Linkage between sexual orientation and chromosome Xq28 in males but not in females". Nat. Genet. 11 (3): 248–56.
[25] Wilson, G.D., & Rahman, Q. (2005). Born Gay: The Biology of Sex Orientation. London: Peter Owen Publishers.
[26] Rice, Anderson, Risch and Ebers (1999) Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28. Science 23(5414): pp. 665-667.
[27] ‘The result demonstrates that there is no gay gene in Xq28’ (ref. Joan Roughgarden, Evolution's Rainbow: Diversity, Gender, and Sexuality in Nature and People, University of California Press, May 17, 2004)।

> থাকার দাবীকে সমর্থন করে না। ... (যদিও) এই ফলাফল জিনোমের অন্য কোন জায়গায় সমকামিতার উপর জিনের প্রভাবকে বাতিল করে দেয় না।

এই 'গে জিন' পাওয়ার সাম্প্রতিক এই পরীক্ষাগত ব্যর্থতা অবশ্যই একটি ময়নাতদন্ত দাবী করে। সারা মিডিয়া জুড়ে 'গে জিন' নিয়ে এত হৈ চৈ হল, অথচ দুইটি বড় পরীক্ষায় দুই রকম ফলাফল বেরিয়ে এলো কেন? তবে কি হ্যামার পরীক্ষায় কোন বড় ভুল করেছিলেন, কিংবা ভাল ফলাফল পেতে ডেটা পরিবর্তন করেছিলেন? নাকি ক্যানাডিয়ান গবেষকেরা সমকামী যুগল নির্বাচনের সময় সনাক্তকরণে ভুল করেছিলেন? এই শেষ বিচারের ফয়সলা এখনো হয়নি। হ্যামার অবশ্য ক্যানাডিয়ীয় গবেষকদের ফলাফল প্রত্যাখান করেছেন এই বলে[28] –

> 'তারা (ক্যানাডীয় গবেষকেরা) প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন গে জিন বলে কিছু নেই, এবং তাদের পরীক্ষা ছিলো পক্ষপাত দুষ্ট, কারণ পরীক্ষকের একজন প্রথম থেকেই 'গে জিন বলে কিছু নেই' - সেটা প্রমাণেই তৎপর ছিলেন। তাদের সেই (সমকামবিদ্বেষী) মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছে তাদের পরীক্ষায়'।

তবে হ্যামার যাই বলুক না কেন গে- জিন নিয়ে পরীক্ষার ফলাফল একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আছে সাধারণ মানুষ এবং নিরপেক্ষ গবেষকদের কাছে। তাদের কাছে বিষয়টি এখনো 'অমীমাংসিত মামলা'ই।

তবে 'অমীমাংসিত' বলে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। এ সংক্রান্ত গবেষণা কিন্তু থেমে নেই। জিনের পথ ধরে সমাধানের পথ খুঁজতে এবারে এগিয়ে এসেছে এপিজেনেটিক্স[29]। এই এপিজেনেটিক্স উপরের সমস্যার একটা আকর্ষণীয় সমাধান হাজির করছে, যা ক্রমশঃ বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তারা দেখেছেন, জিন কেবল একা একা কাজ করতে পারে না, কাজ করে পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের মিথস্ক্রিয়ায়। বৈদ্যুতিক বাতির সুইচের যেমন টার্ণ অন বা অফ করা যায়, ঠিক তেমনি পরিবেশ থেকে পাওয়া সংকেতের প্রভাবে জিনের সক্রিয়করণ (activation) বা নিষ্ক্রিয়করণ (deactivation) ঘটে । বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন মিথাইলেশন। দেখা গেছে আমাদের চারপাশের বহু কিছুই - পরিবেশ, খাদ্যাভাস, পানীয় বা ধূমপানে আসক্তি, মানসিক পীড়নসহ বহুকিছুতেই এই প্রক্রিয়াটি প্রভাবিত হয়। এই মিথাইলেশন হয় বলেই সদৃশ যমজ ভাতৃযুগলে

[28] Michael Abrams, The Real Story on Gay Genes, Discover Magazine, June, 2007

[29] এপিজেনেটিক্স নিয়ে বিস্তারিত জানতে এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত 'মানব প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিগুলো কি জন্মগত নাকি আচরণগত?' অংশটি দ্রষ্টব্য।

জেনেটিক কোডে শতভাগ মিল থাকলেও তাদের আচরণে, মন মানসিকতায় কিংবা কাজকর্মে বিস্তর পার্থক্য থাকে অনেক সময়ই। মিথাইলেশনের প্রভাবে জেনেটিক কোডের একাংশ বা একাধিক অংশ টার্ণ অফ হয়ে যেতে পারে। কাজেই একই জেনেটিক কোড থাকা সত্ত্বেও জেনেটিক সুইচের টার্ণ অন বা অফের কারণে একভাই বিষমকামী, আরেকভাই হয়ত সমকামী ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এ শুধু তত্ত্ব কথা নয়, এই ধারণার স্বপক্ষে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেছে সভেন বকল্যান্ডের গবেষণায়। তিনি যমজ ভাইয়ের ঠিক কোন জায়গায় জিন টার্ণ অন বা অফের কারণে প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটে তার হদিস এখনো না পেলেও সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, সমকামী ছেলের জন্ম দেয়া মায়ের এক্স ক্রোমোজমের সক্রিয়তা অন্য মায়েদের চেয়ে ভিন্ন হয়। [30]

কিন্তু কিভাবে একটি জিন পরিবেশের প্রভাবে সক্রিয় বা অক্রিয় হয়ে যায়? একটি ভাল উদাহরণ হতে পারে স্ট্রেস হরমোন করটিসোল। ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, কর্টিসোল স্থায়ীভাবে জিনের একাংশকে নিষ্ক্রিয় (turn off) করে দিতে পারে, এবং এর ফলে ইঁদুরের স্বভাবে পরিবর্তন ঘটে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা একই রকম ফলাফল লক্ষ্য করেছেন। তারা দেখেছেন, মানসিক চাপের মধ্যে থাকলে মানবদেহে এই হরমোনের আধিক্য বৃদ্ধি পায়। চাপময় পরিবেশে বেশি দিন কাটালে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায় – ফলে দেহ সহজেই সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হয় সে সময়। কিন্তু 'ধান ভানতে শীবের গীতের মত' এই কর্টিসোল নিয়ে পড়ে যাওয়া হল কেন? এই স্ট্রেস হরমোনের সাথে সমকামিতার কি কোন সরাসরি সম্পর্ক আছে? বিজ্ঞানীরা বলেন, থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জার্মান ডাক্তার গান্টার ডর্নারের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপময় পরিবেশে যে সমস্ত মা গর্ভবতী হয়েছিলেন, তাদের সন্তানদের একটা বড় অংশ নাকি সমকামী হিসেবে গড়ে উঠেছিলো ইতিহাসের অন্য সময়ের চেয়ে অনেক বেশি[31]। এমনকি ইঁদুর নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েও বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যে সমস্ত ইঁদুরেরা গর্ভের সময় চাপময় পরিবেশে দিন কাটায়, তাদের সন্তানের মধ্যে পরবর্তীতে সমকামিতার আধিক্য তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। অনেক সময় আবার বিভিন্ন এলার্জিক প্রতিক্রিয়ায় দেহে টেস্টোসটেরোন হরমোনের (পুরুষ হরমোন) প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যায়। যে সমস্ত মায়েরা সারা জীবনে অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের ক্ষেত্রে শেষের দিককার সন্তানদের জন্মের সময় এ ধরণের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে বলে জানা গেছে। রে ব্ল্যানচার্ডের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, কোন পরিবারে বড় ভাই থাকলে তার পরের ভাইদের সমকামী যৌনপ্রবৃত্তি তৈরী করার সম্ভাবনাকে শতকরা ২৮ থেকে ৪৮ ভাগ

[30] Bocklandt S, Horvath S, Vilain E, Hamer DH (February 2006). "Extreme skewing of X chromosome inactivation in mothers of homosexual men". Hum. Genet. 118 (6): 691–4.
[31] Matt Ridley, The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature, Harper Perennial, 2003.

বাড়িয়ে দেয়[32]। অর্থাৎ, একটি পরিবারে বড় ভাইদের সংখ্যা যত বেশী হবে, তত বেশি হবে পরবর্তী সন্তানের সমকামী হবার সম্ভাবনা (একে জনপ্রিয়ভাবে 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়)। কারণ দেখা গেছে, যত বেশি সন্তানের জন্ম হয়, তত বেশি মায়ের টেস্টোসটেরোন হরমোনের প্রতি এলার্জিক প্রতিক্রিয়াও বাড়তে থাকে। হরমোন নিয়ে এই সাম্প্রতিক পরীক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোন কিছুই আসলে নিশ্চিত নয়। বহু মহিলাই আসলে বিভিন্ন সময়ে চাপযুক্ত পরিবেশে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের সবার সন্তান বড় হয়ে সমকামী হয়। আমার নিজের জন্মও হয়েছিলো একাত্তরের দুর্বিষহ অবস্থার মধ্যে, আমার বাবা যখন দেশের সীমান্তে ছিলেন যুদ্ধরত। এমন পরিস্থিতিতে জন্ম নিয়েও কিন্তু আমি সমকামী হিসেবে বেড়ে উঠিনি। কিংবা আমার জন্মের কারণে কোন 'ওল্ডার ব্রাদার ইফেক্ট' আমার ছোট ভাইয়ের উপরও পড়েনি । এমন উদাহরণ চারপাশে অজস্রই আছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় সমকামী সন্তানের জন্মদেয়া মায়েদের নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছে। তাদের প্রশ্ন করা হয়েছে যে, বিষমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার তুলনায় সমকামী সন্তানের জন্ম দেয়ার সময়টিতে কি তারা অধিক চাপযুক্ত পরিস্থিতিতে ছিলেন কিনা। তাদের মতামত থেকে এমন কোন আলামত পাওয়া যায়নি যে, সমকামী সন্তানের জন্মের সময় কোন চাপময় পরিস্থিতি তারা অতিবাহিত করেছিলেন[33]। কাজেই মায়ের মানসিক চাপের সাথে সন্তানের সমকামিতার কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র আসলে প্রতিষ্ঠিতই হয়নি। এ ছাড়া, গান্টার ডর্নারের মূল পরীক্ষার ' উদ্দেশ্য' ও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন মহলে। গান্টার তার গবেষণাপত্রে সমকামিতাকে ' মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব' (psychic disability) হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, ' অদূরভবিষ্যতে সমকামিতার বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে' । তার এই মনোভাব নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলেই তুমুল প্রতিবাদ হয়েছে, তার সমকামিতার প্রতি বিদ্বেষমূলক মনমানসিকতাকে ইতিহাসের কলঙ্কজনক ইউজিনিক্সের (eugenics) সাথেও তুলনা করা হয়েছে।

গে জিন নিয়ে মিডিয়ায় এত ঔতসুক্যই বা কেন?

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাইরেও রাজনৈতিক একটা মতাদর্শগত লড়াই যে চলছে তার প্রভাব কিছুটা হলেও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রগুলোতেও পড়ছে। রক্ষণশীল সমাজের চাপে সাড়া দুনিয়া জুড়েই সমকামীদের অধিকার আদায়ের জন্য লড়তে হচ্ছে। এই সমকামী অধিকার

[32] Blanchard, R. (1997). Birth order and sibling sex ratio in homosexual versus heterosexual males and females. Annual Review of Sex Research, 8, 27-67.
[33] Francis Mark Mondimore, A Natural History of Homosexuality, The Johns Hopkins University Press, 1996

কর্মীদের অনেকেই ভাবেন, যদি কখনো প্রমাণ পাওয়া যায় যে সমকামী প্রবণতা জৈবিকভাবে অঙ্কুরিত হয় –সেটা সমকামীদের দাবী আদায়ের জন্য অনেক উপকারে আসবে। কারণ, তারা তখন আরো বলিষ্ঠভাবে মানুষজনকে বোঝাতে পারবেন যে, ‘সমকামীরা জন্মগতভাবেই সমকামীপ্রবণতা নিয়ে জন্মায়’, এতে তাদের কোন ‘দোষ’ নেই। ‘এডভোকেট’ নামে একটি মার্কিন গে এবং লেসবিয়নদের পত্রিকায় এ নিয়ে ১৯৯৬ সালে একটি জরিপ চালান হয়, সেখানকার শতকরা ৬১ ভাগ পাঠক মত দিয়েছিলো যে, ‘যদি সমকামিতার পেছনে কোন জেনেটিক কারণ আছে বলে জানা যায়, সেটা তাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করবে’[34]।

তবে এই দলের মধ্যে বিপরীত মতও আছে। যদি সমকামী প্রবণতা ‘জেনেটিক’ বলে প্রমাণিত হয়, তবে একে ‘জেনেটিক রোগ’ হিসেবে চিহ্নিত করে দেবার প্রবণতাও হয়তো বৃদ্ধি পাবে। এ ধরণের ভয় থেকে অনেকে আবার জিনের সাথে সম্পর্ক না পাওয়া গেলেই বরং ভাল বলে মনে করেন। তারা আশঙ্কা করেন আগে ডাক্তারেরা যেভাবে সমকামিতাকে ‘মানসিক ব্যাধি’ হিসেবে চিহ্নিত করে নানা উপায়ে রোগমুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছেন, সেরমকম প্রবণতা হয়তো জেনেটিস্টদের মধ্যেও ভবিষ্যতে দেখা যাবে; তারা হয়ত হান্টিংটন ডিজিজ, আলসাইমার্স, মাইগ্রেন, সিকেল সেল এনিমিয়ার মত সমকামিতাকেও জেনেটিক রোগ হিসেবে দেখিয়ে তার চিকিৎসার দাওয়াই তখন বাৎলে দিতে চাইবেন। Xq28 এলাকার ঠিক পাশেই ক্রোমোজমের ভিন্নতার কারণে *অকুলার এলবেনিজম* এবং *মেনকিস ডিজিস* নামে দুটি দুর্লভ জেনেটিক রোগ তৈরি হয় বলে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন। সমকামিতাও কি সে ধরণের কোন জেনেটিক রোগ? এর জবাব আমরা খুঁজতে চেষ্টা করবো পরবর্তী অধ্যায়ে।

[34] "it would mostly help gay and lesbian rights if homosexuality were found to be biologically determined"; The Advocate (1996, February 6). Advocate Poll Results. p. 8.